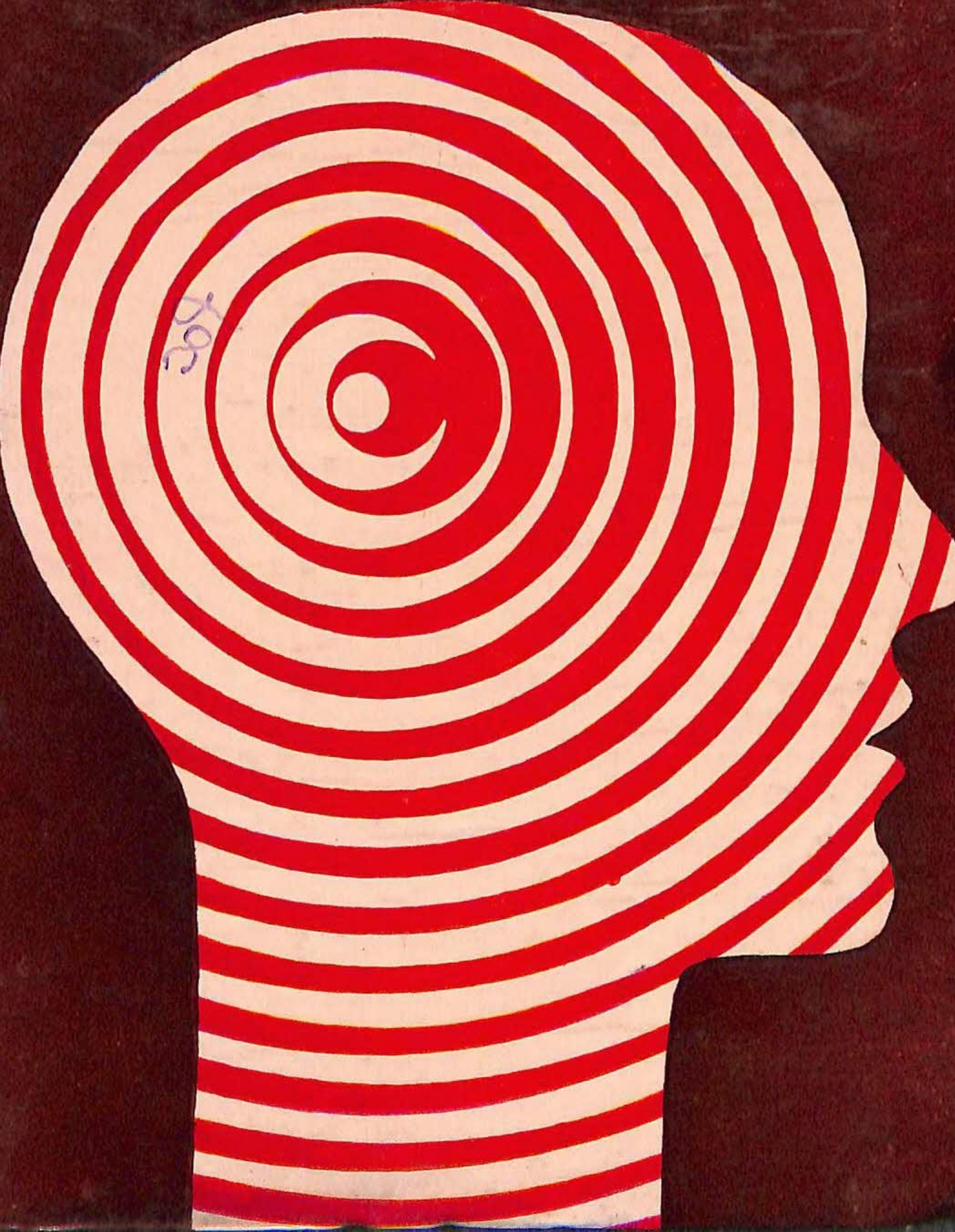
আবিষ্কারের পিছনে

ডাঃ মনীশ প্রধান

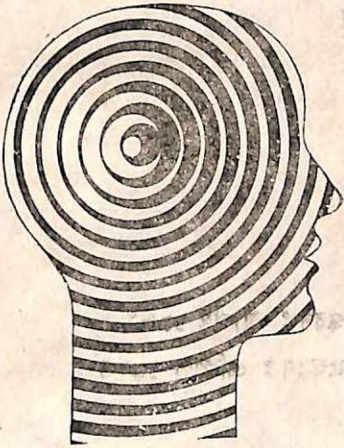


৩৩

২০৭

আবিষ্কারের পিছনে

ডাঃ মনীশ প্রধান



মডার্ন কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

ABISKARER PICHANE

By Dr. Manish Pradhan.

প্রথম স্বপ্নদীপ সংস্করণ ঃ আগষ্ট ১৯৮২

দ্বিতীয় স্বপ্নদীপ সংস্করণ ঃ এপ্রিল ১৯৮৪

□ তৃতীয় [প্রথম মডার্ন কলাম] সংস্করণ ঃ মাঘ ১৩৯৫ / জানুয়ারী ১৯৮৯

□ প্রকাশিকা ঃ লতিকা সাহা । মডার্ন কলাম । ১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯

□ মুদ্রাকর ঃ নিমাই চন্দ্র ঘোষ । দি রঘুনাথ প্রিণ্টার্স । ৪/১ই বিডন রো, কলকাতা-৬

□ প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ঃ সঞ্জয় দে

পঁচিশ টাকা

পিতামহ ৺ভুবনেশ্বর প্রধান

ও

মাতামহ ৺উমাকান্ত হাজারী, বিদ্যার্ণবকে

আপনাদের আশীর্বাদ ও অকৃত্রিম

স্নেহের কথা মনে রেখে—

প্রসঙ্গত

জ্ঞানের সমৃদ্ধি মানুষের কাছে চিরদিনই বাঞ্ছনীয়। আর সেই জ্ঞান যখন সর্বসাধারণের কল্যাণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করে তখন তা হয়ে দাঁড়ায় একান্ত কাম্য, মানুষের নিজস্ব বিষয়বস্তু। এ দিক দিয়ে দেখতে গেলে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কোন নজির নেই।

জৈবিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পর্যায়ক্রমে জীবজগতের উত্থান এবং অবলুপ্তি ঘটে আসছে সৃষ্টির আদিকাল থেকে। কিভাবে উত্থান ঘটেছে সে নিয়ে সৃষ্ট হয়েছে হাজারো তত্ত্ব। অবলুপ্তির ব্যাপারেও তত্ত্বের শেষ নেই। সে সব তত্ত্বের কথা বাদ দিলেও একটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা কিন্তু স্থির নিশ্চয়। সেটা 'রোগ'। আর এই 'রোগ' সৃষ্টির মূলে কাজ করেছে প্রধানতঃ দুটি কারণ। রাসায়নিক এবং ভৌতিক স্থিতিস্থাপকতার অভাব—শরীরে। এবং জীবাণু। বলাবাহুল্য, এমন একটি সত্যে উপনীত হতে মানুষ সময় নিয়েছে হাজার হাজার বছর। যথেষ্ট 'কৃচ্ছ্রসাধন' এবং 'বাধা-বিঘ্নের' ভেতর দিয়ে। 'আবিষ্কারের পিছনে' সেই 'কৃচ্ছ্রসাধন' এবং 'বাধা বিঘ্নের'ই একটি সংক্ষেপিত ইতিহাস।

অনেক রোগের কথাই আমরা জানি। কিন্তু প্রাচীনকাল থেকে কিভাবে ধাপে ধাপে রোগ সম্পর্কিত ধারণা গড়ে উঠল, আমাদের অনেকেরই তা জানা নেই। এক সময় মানুষ মনে করত, দেবতার 'কোপ' রোগের কারণ। পরে অভিজ্ঞতা বাড়ল। মিশরে, গ্রীসে, ব্যাবিলনে, ভারতে—বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে মনীষীরা আবিষ্কার করলেন মানব-রোগের নানান রহস্য। শারীর-বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে রোগের কার্য কারণ সম্পর্কেও ক্রমে গড়ে উঠলো নানা রকম ধারণা। সেই ধারণা রোগ নিরাময় এবং প্রতিরোধের ব্যাপারে গড়ে তুলল অজস্র পদ্ধতি। এই গড়ে তোলার ইতিহাস রোমাঞ্চকর কাহিনীকেও হার মানায়। বর্তমান গ্রন্থে সেই ইতিহাসই অত্যন্ত সুচারুরূপে এবং সহজবোধ্যভাবে ডাঃ মনীশ প্রধান তুলে ধরেছেন।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে অসাধারণ উদ্ভাবনা এবং আবিষ্কারের নজির সৃষ্টি করে যে সব চিকিৎসা-বিজ্ঞানী অমর হয়েছেন তাঁদের কথাই লেখক তুলে ধরেছেন এই গ্রন্থে। শুধু তত্ত্ব এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যই নয়, গবেষণা করতে গিয়ে তাঁরা যে সব বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হয়েছেন সে সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন তিনি। যা এই গ্রন্থের পাঠক-পাঠিকাদের মর্মস্পর্শ করবে সন্দেহ নেই। শক্ত কাজ। কিন্তু লেখক সে কাজে যে যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তারও প্রমাণ পাবেন তাঁরা। এমন প্রাঞ্জল ভাষায় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উপর লিখিত গ্রন্থ বাংলা ভাষায় খুবই বিরল। সর্ব শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকা—বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে গ্রন্থটি যথেষ্ট সমাদর পাবে বলেই আমার বিশ্বাস।

সমরজিৎ কর

১৪. ৮. ৮২

বিষয়সূচী

চিকিৎসা বিজ্ঞানের আদিপর্ব ৯
চিকিৎসা বিজ্ঞানের মধ্যপর্ব ২৩
এনতনি ভ্যান লিউয়েন হুক ও মাইক্রোস্কোপ ৩৫
এডওয়ার্ড জেনার ও বসন্তের টীকা ৪৭
লুই পাস্তর ও জলাতঙ্ক রোগের টীকা ৫২
রবার্ট কক্ ও যক্ষারোগ ৬২
পল এর্লিক ঃ জেরাল্ড ডোমেক ও কেমোথেরাপী ৭৩
রস ঃ লেভার্ন ঃ গ্রাজী ও ম্যালেরিয়া ৮৪
ব্যানটিং-বেস্ট ঃ ডায়েবিটিস ও ইনস্থলিন ১০২
উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী ও কালাজ্বর ১১৬
ফ্লেমিং ঃ চেইন ঃ ফ্লোরে ও পেনিসিলিন ১২৯
সেলম্যান ওয়াকস্ম্যান ও স্ট্রেপটোমাইসিন ১৪১
লর্ড লিস্টার ও এন্টিসেপটিক সার্জারী ১৫২
ডেভি ঃ ওয়ালেস ঃ মর্টন ঃ সিম্প্সন ও অজ্ঞান করার পদ্ধতি ১৬১
লেনেক ঃ রনজেন-স্টেথোসকোপ ও এক্স্ রে ১৬৯
শেষের কথা ১৭৯

চিকিৎসা বিজ্ঞানের আদিপর্ব

"গবেষণার কাজে যাদের মানসিক প্রস্তুতি আছে, ভাগ্য কেবল তাদেরই সাহায্য করে"—এই কথা বলেছিলেন পৃথিবীর সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী লুই পাস্তর। সত্যিই তো আমাদের প্রতিদিনের কাজের মধ্যে কত ঘটনা আমাদের চোখে পড়ে, কত কথা আমরা শুনি, কিন্তু তার উপরে আমরা কি কোন গুরুত্ব আরোপ করি? বোধ হয় না। কিন্তু বিশ্বে যাঁরা বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, প্রভৃতি ক্ষেত্রে নিজের অস্তিত্বের ছাপ রেখেছেন, কৃতিত্ব অর্জন করেছেন, তাঁরা কিন্তু কোন ঘটনা বা তথ্যকে ক্ষুদ্র মনে করে উপেক্ষা করেন নি। বরং কোন ছোট্ট ঘটনা বা কোন সাধারণ মানুষের ছোট্ট কথাটিও তাঁদের মনে গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছে, চিন্তান্বিত করেছে, গবেষণা করতে প্রেরণা জুগিয়েছে। তাঁদের চিন্তাধারা আমাদের ধ্যানধারণাকে উন্নত করেছে এবং বিশ্বের শিক্ষিত লোকের কাছে এই মহাপুরুষদের নাম আজ অমরত্ব লাভ করেছে। কিন্তু সাধারণের কাছে তাঁদের নামটুকুই শুধু পরিচিত। তাঁদের পরিশ্রম, সাধনা, আত্মত্যাগ সম্বন্ধে আমরা কতটুকু জানি? বোধহয় খুব বেশী না। তাঁদের কাজের ফল গ্রহণ করে আমরা উপকৃত হয়েছি; কিন্তু তাঁদের ত্যাগ ও সাধনার ইতিহাস আজ আমাদের কাছে যথাযথ স্বীকৃতি পায় না। তার পরিচয় বোধহয় উপেক্ষিত হয়ে ইতিহাসের পাতায় লুকিয়ে আছে। তাঁদের আবিষ্কারের পিছনের কাহিনীকে ইতিহাসের অন্ধকার থেকে আলোয় তুলে ধরার বাসনা নিয়ে এই কাহিনীর অবতারণা। চিকিৎসা বিজ্ঞানে যাঁরা নতুন কিছু আবিষ্কার করে পরবর্তীকালের বিজ্ঞানীদের পথ প্রদর্শন করেছিলেন, মানবসমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করেছেন—সেই অমর বিজ্ঞানীদের কয়েকজন সম্বন্ধে কিছু ঘটনা, তাঁদের জীবনকথা, তাঁদের সাধনা ও কঠোর পরিশ্রমের কথা এ যুগের মানুষের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এই আখ্যায়িকার মাধ্যমে।

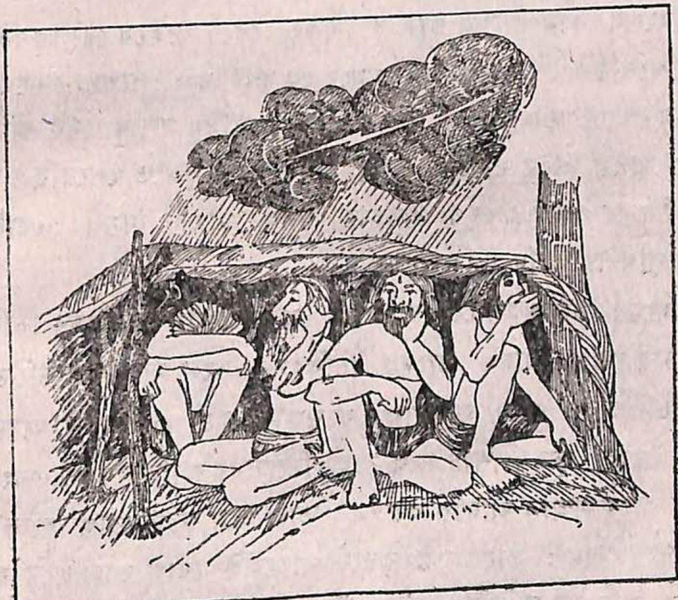
ইতিহাসের পিছনে থাকে আর এক ইতিহাস। যেমন আজকের ইতিহাসের পিছনে আছে গতদিনের ইতিহাস। আবিষ্কারের পিছনেও আছে ইতিহাস, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছরের ইতিহাস। সে ইতিহাস অনেক অনেক বছর ধরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। সেই পুরনো দিনের কথা সামান্যই আমরা জানি ; অনেক কিছুই ধ্বংস হয়েছে বা কালের প্রভাবে লোপ পেয়েছে। সে ইতিহাস জানবার জন্যে আমরা সাহায্য নিয়ে থাকি অল্প-সল্প কিছু প্রামাণিক তথ্যের, কিন্তু মধ্যে অনেক ফাঁক থেকে যায় এবং তা পূরণ করার জন্য কল্পনার সাহায্য নিতে হয়।

মানুষের বিকাশের একেবারে প্রথম দিকের কথা। পৃথিবীর জল ক্রমশঃ কমে আসছে ; কিন্তু মাটি তখনও স্যাঁতসেতে আর এখানে ওখানে ছোট-বড় জলা। মানুষ গাছ থেকে নেমে এসেছে মাটিতে, দু'পায়ে হাঁটতে শিখেছে। কিন্তু মাটিতে নেমে দেখল যে পদে পদে বিপদ, হিংস্র জন্তু-জানোয়ার তো আছেই, তার ওপর আবার নানা রকম রোগ। অসুস্থ হয়ে, রোগে ভুগে বহু মানুষ অকালে মরে যেত সেই সময়ে। রোগ জীবাণুরাও পৃথিবীর প্রাচীন বাসিন্দা, তারাও বোধহয় মানুষের সঙ্গেই এসেছে এবং প্রথম থেকেই মানুষকে আক্রমণ করেছে। রোগজীবাণুর সঙ্গে লড়াই করে মানুষ মরেছে, আবার কখনও তাদের হারিয়ে দিয়ে মানুষ বেঁচে উঠেছে। এছাড়া ছিল প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা রৌদ্র-বৃষ্টি, শীত-গ্রীষ্ম, খারাপ আবহাওয়া থেকে মানুষ তখন নিজেকে বাঁচাতে জানত না। তারা হয়ত মনে করত কোন শত্রু এই ঝড়-বৃষ্টি বিদ্যুৎ হেনে তাদের মেরে ফেলতে চেষ্টা করছে।

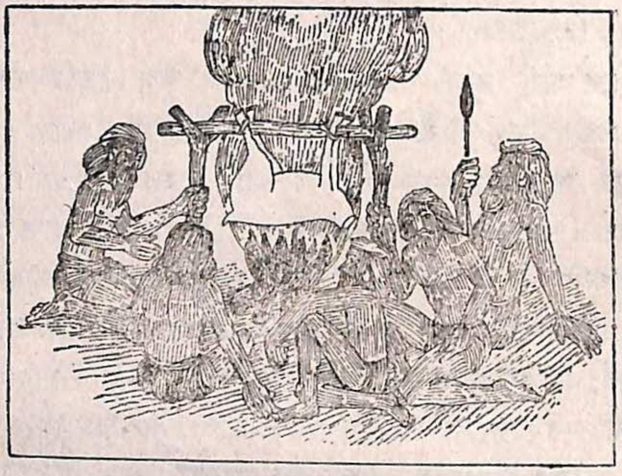
ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতা অর্জন করে মানুষ নিজেকে রক্ষা করার উপায় খুঁজে পেল। তারা বুঝতে শিখল যে একা থাকার চেয়ে একটা দল গঠন করলে হিংস্র জানোয়ারদের আক্রমণ প্রতিরোধ করা সহজ হয়। জন্তু মেরে তার চামড়া ছাড়িয়ে, রৌদ্রে শুকিয়ে নিয়ে কাপড়ের মত পরা যায় এবং এর ফলে শীত থেকে কিছুটা রক্ষা পাওয়া যায়। ঝড়, বৃষ্টি ও রৌদ্র থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মাথার উপর আচ্ছাদন তৈরি করতে শিখল তারা ; যেখানে পাহাড়-পর্বত আছে সেখানকার মানুষ পাহাড়ের আড়ালে বা

গুহার মধ্যে বাস করতে শিখল। এসব কাহিনী মানব ইতিহাসের একেবারে প্রথম দিকের কথা।

এর পরে আদি মানব পাথর ঘষে ধারাল অস্ত্র তৈরী করে শিকার করতে শিখল। দল বেঁধে, কখনও বা একাই শিকার করতে যেত। এর পরে মানুষ আবিষ্কার করল কি করে আগুন জ্বালাতে হয়। এটা খুব বড় আবিষ্কার। আগুন জ্বালিয়ে তারা হিংস্র প্রাণীর হাত থেকে রক্ষা পেতে শিখেছিল; বুঝতে পেরেছিল মাংস কাঁচা না খেয়ে আগুনে ঝলসে নিলে খেতে সুস্বাদু হয় এবং সহজে হজম হয়ে যায়। আগে কাঁচা বা পচা মাংস খেয়ে, খারাপ দূষিত জল খেয়ে মানুষ রোগে পড়ত; তার মধ্যে কেউ হয়ত বমি করে সেরে উঠত, কিন্তু বেশির ভাগ লোকই মারা যেত। কোন কারণে পেট ব্যথা হলে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিই তাকে পেটে হাত বুলিয়ে দিতে শিক্ষা দিয়েছিল। এর ফলে স্বাভাবিকভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে যন্ত্রণা কমেও যেত। কখনও মাটির প্রলেপ বা জল একটু গরম করে সেঁক দিতে শিখল মানুষ। কোন গোষ্ঠীর নেতা অথবা নেতার নির্বাচিত কোন



মানুষ প্রথম আস্তানা গড়তে শিখল



আগুনে মাংস ঝলসে নিলে সুস্বাদু হয়

বুদ্ধিমান লোক তার দলের মানুষের অসুখে সেবা করে, কোন প্রকার প্রলেপে দিয়ে, কখনও বা বিশেষ গাছের পাতা সিদ্ধ করে, সেই জল খাইয়ে অথবা বিশেষ কোন গাছের ছাল বা শিকড় বেটে খাইয়ে রোগীর চিকিৎসা করতে শিখেছিল। তাতে সব সময়ে যে ভাল ফল পাওয়া যেত তা নয়, তবে যে ক্ষেত্রে ভাল ফল পাওয়া যেত, আদিম মানুষ সেই অভিজ্ঞতা পরবর্তী রোগীর ওপর ব্যবহার করেছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল বিশেষ রোগে বিশেষ পদ্ধতির ওষুধ ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়। এরাই ছিল পুরাতন পৃথিবীর আদি চিকিৎসক।

সেদিনের মানব সমাজে আর এক শ্রেণীর লোক নিজেদের চিকিৎসক বলে প্রচার করত, যদিও তাদের চিকিৎসক বলে মনে করা উচিত নয়। তারা চিকিৎসার চেয়ে তুকতাক, ঝাড়ফুঁক করে রোগ নিরাময়ের চেষ্টা করত। তারা ভূত-পিশাচ সিদ্ধ বলে নিজেদের জাহির করত এবং সরল মানুষের কাছে সম্মান আদায় করত। তারা মনে করত রোগ হচ্ছে কোন অপদেবতার রোষ; তাকে তুষ্ট করতে পারলেই রোগ ভাল হয়ে যাবে। এইভাবে সেদিনের পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর 'চিকিৎসক' গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল, সেই দু'দলে ভাব তো ছিলই না, ছিল রেষারেষি।

এইভাবে বহু বছর ধরে মানুষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে চিকিৎসার উন্নতি করতে শিখেছিল। তারা বুঝেছিল, শরীরের কোন ক্ষত সহজেই বিষাক্ত হতে পারে এবং তার ফলে মানুষ মরে যায়। তারা পরীক্ষা করে দেখেছিল আগুনে পাথর গরম করে ক্ষতস্থান পুড়িয়ে দিলে কোন কোন ক্ষেত্রে ভাল ফল পাওয়া যেত। যারা এই ধরনের 'চিকিৎসা' সহ্য করতে পারত তারা কিন্তু সেরে উঠত। সেদিনের 'চিকিৎসকরা' লক্ষ্য করেছিল যে কোন ফোড়া পেকে উঠলে খুব টনটন করে, কিন্তু ফেটে পুঁজ বেরিয়ে গেলে যন্ত্রণার উপশম হয়। বুদ্ধিমান মানুষ পাথর ঘষে ধারাল ছুরির মত অস্ত্র তৈরী করল এবং সেই অস্ত্র দিয়ে ফোড়া কেটে পুঁজ বার করে যন্ত্রণা কমাতে পেরেছিল। যে চিকিৎসক বুদ্ধি খরচ করে প্রথম এই কাজ করেছিলেন তিনিই বোধ হয় বিশ্বের প্রথম শল্যচিকিৎসক। কারো হয়ত পা মচকে গিয়েছে, সে যুগের



গাছের পাতা ও শিকড় সিদ্ধ করে ওষুধ তৈরী

চিকিৎসক বা অন্য কোন বুদ্ধিমান লোক কোন গাছের বিশেষ অংশ বেটে লাগিয়ে অথবা কোন বিশেষ জায়গায় মাটির প্রলেপ দিয়ে যন্ত্রণার উপশম করলেন। হয়ত যন্ত্রণা উপশম হওয়া কাকতালীয় ; কিছু না করলেও ভাল হোত। কিন্তু পরবর্তী কালের চিকিৎসকরা এই ফল লক্ষ্য করে সেই অভিজ্ঞতা অন্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতেন। এইভাবে গড়ে উঠেছিল আদি যুগের চিকিৎসা পদ্ধতি। হয়ত এই চিকিৎসা পদ্ধতি শক্ত বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে গড়ে ওঠেনি ; কিন্তু পদ্ধতিকে অবৈজ্ঞানিক বলে অবহেলা করাও ঠিক হবে না। বিশেষ করে যখন সেই চিকিৎসা পদ্ধতির বেশীর ভাগই আমাদের অজানা। সেদিনের পাথর, পাহাড়ের গায়ে বা গুহায় খোদাই করা সেই যুগের কোন অজানা শিল্পীর আঁকা ছবি, বহু বছর আগে মরে যাওয়া মানুষ বা জন্তুর হাড়, যা আজ পাথরে পরিণত হয়েছে, সেই সব তথ্য সংকলন করে আজকের বিজ্ঞানীরা পুরনো দিনের কিছু কিছু ঘটনা আমাদের জানাতে পেরেছেন।

বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রথম বিবরণ আমরা পাই প্রাচীন মিশর থেকে। সে প্রায় ৫০০০ বছর আগেকার কথা। পুরাতন পৃথিবীতে প্রথম সভ্যতার আলো যে সব দেশে দেখা গিয়েছিল, মিশর তাদের অন্যতম। এই মিশর দেশের প্রাচীন ইতিহাস খুঁজে দেখলে জানা যায় সেদিন তারা বিজ্ঞানে কত উন্নত ছিল। মিশরীয়রা মৃত মানুষের দেহ বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা রক্ষা করতে জানত। আমাদের কলকাতা যাদুঘরে কয়েক হাজার বছরের পুরনো একটি মমি আছে, যা সাক্ষ্য দিচ্ছে প্রাচীন মিশরীয়রা রসায়ন বিজ্ঞানে অন্যের চেয়ে কত উন্নত ছিল। মমি তৈরী করতে হলে মৃত মানুষের পেট ও বুকের মধ্য থেকে অন্ত্র, লিভার, প্লীহা, হৃদ্‌পিণ্ড, ফুসফুস ইত্যাদি সব বার করে নিতে হত। যারা এই কাজ করত, তারা ঐ যন্ত্রগুলির অবস্থিতি কেমন, তা বেশ ভালভাবেই বুঝে নিয়েছিল। প্রাচীন মিশরের পাথরে খোদাই দেওয়াল-চিত্রেও সে যুগের চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমরা কিছু জানতে পারি। একটি দেওয়াল-চিত্রে দেখা যায় কোন লোক বগলে লাঠি দিয়ে হাঁটছে, তার একটি পা সরু এবং তা হয়ত কোন রোগের জন্য হয়েছে। ভাঙ্গা হাড় জোড়া দেওয়ার জন্য

হু'পাশে কাঠ দিয়ে বেঁধে রাখার পদ্ধতি প্রাচীন মিশরীয় চিকিৎসকদের জানা ছিল। এই পদ্ধতিতে আজও ভাঙ্গা হাড়ের চিকিৎসা করা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রাচীন মিশরের চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই অল্প, বেশীর ভাগই কালের অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। সে সময়ের পুরোহিতরা চিকিৎসা বিষয়ে সব কিছুই গোপন করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা চিকিৎসা বিষয়ের জ্ঞানকে রহস্যের আবরণে ঢেকে এটাকে যাদুবিদ্যার রূপ দিতে চেয়েছিলেন। তাঁদের গোপন করার চেষ্টা সত্ত্বেও যেটুকু জানা গেছে তা এবার্স-এর প্যাপিরাস পাতায় চিকিৎসা বিষয়ের লেখা থেকে অথবা গুহায় বা পাথরের দেওয়ালে আঁকা ছবি থেকে।



বগলে লাঠি দিয়ে হাঁটার দেওয়াল-চিত্র

এ যুগের চিকিৎসকরা রোগী দেখার পর যখন ব্যবস্থাপত্র লেখেন, তখন প্রথমেই তাঁরা 'R' অক্ষরটি ব্যবহার করেন। কেন? এর কি কোন তাৎপর্য আছে? হ্যাঁ, প্রাচীন মিশরে চিকিৎসার দেবতা ছিলেন হোরাস। মিশরীয়রা বিশ্বাস করত যে দেবতার চোখ পড়লে রোগ নিরাময় হবে। হোরাসের চোখের প্রতীক হিসাবে 'R' অক্ষরটি হাজার হাজার বছর ধরে চিকিৎসকরা ব্যবহার করে আসছেন। এটা কি যাদু, না বিজ্ঞান? এই প্রতীককে প্রাচীন মিশরের কাছে আধুনিক চিকিৎসকদের জ্ঞানলাভের স্বীকৃতি হিসাবে মনে করা যেতে পারে।

মিশরের পরে প্রাচীন ব্যাবিলনের রাজা হামুরাবির ৪০০০ বছরের পুরনো খোদাই করা এক প্রস্তরলিপির সন্ধান পাওয়া গেছে প্যারী'র ল্যুভর মিউজিয়ামে। এই প্রস্তরলিপিতে আমরা সে সময়ের চিকিৎসা বিষয়ে কিছু জানতে পারি না; কিন্তু চিকিৎসকরা ভুল চিকিৎসা বা রোগীকে অবহেলা করলে তাঁদের প্রতি বিভিন্ন ধরনের শাস্তির বিধান ছিল, তা আমরা জানতে পেরেছি।

সেই যুগে শুধু মিশর বা ব্যাবিলন নয়, আরবদেশ, চীন ও ভারতের চিকিৎসা ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নত ছিল। প্রাচীন ভারতে আয়ুর্বেদের উন্নত মান আজ আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। প্রশ্ন আসে, তবে কেন আয়ুর্বেদ আজ এত পিছিয়ে পড়েছে? কারণ একটি নয়, অনেক। সে যুগের আয়ুর্বেদ শিক্ষকেরা সকলেই যে আদর্শ শিক্ষক, উদার ও নিঃস্বার্থচিত্ত ছিলেন, তা নয়। অনেক সময় যোগ্য ও বুদ্ধিমান শিষ্যদের বঞ্চিত করে নিজের নিকট আত্মীয়দের তাঁরা বেশী শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করতেন। কিন্তু সকলের যে সেই শিক্ষা গ্রহণ করার যোগ্যতা থাকবে, তা তো হতে পারে না। এইভাবে অযোগ্য শিষ্যকে শিক্ষাদান আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানের যথেষ্ট ক্ষতি করেছিল। এ ছাড়া কালের প্রভাবে পুঁথিপত্র নষ্ট হতে থাকে। সে যুগে পুঁথি রক্ষার ব্যবস্থা ভাল ছিল না। তা ছাড়া বৌদ্ধ যুগে শব-ব্যবচ্ছেদ প্রথা আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়। এর ফলেও চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিশেষ অবনতি হতে থাকে। যেটুকু বা ছিল মুসলমান আক্রমণের পর সেটুকুও ধ্বংস হল। কেউ হয়ত দু' একটা পুঁথি গোপন স্থানে রক্ষা করে

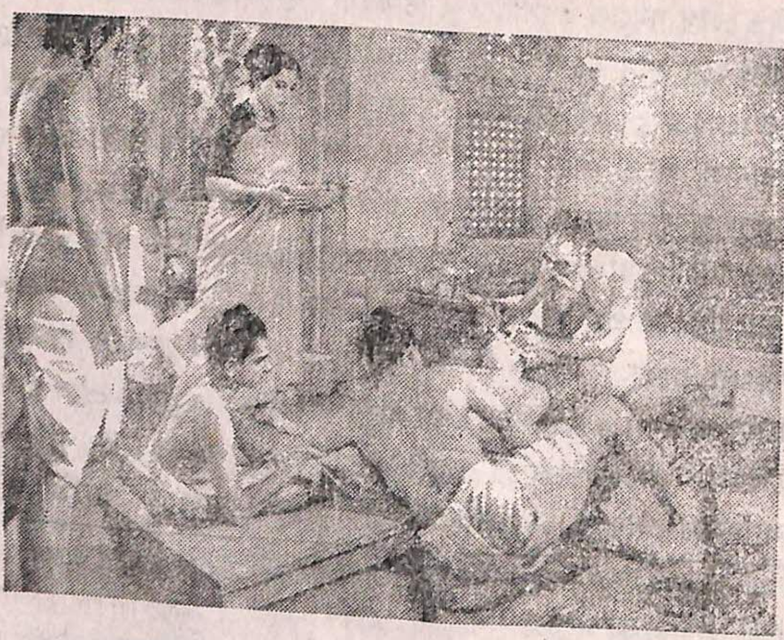
ধ্বংস থেকে সাময়িকভাবে বাঁচাতে পেরেছিলেন। কিন্তু পরে তার বেশীর ভাগ আর উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। কোনটির বা কিছু অংশ চিরতরে হারিয়ে গিয়েছিল। এইসব পুঁথিপত্রের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি যে ভারতীয় উপমহাদেশে ঋষি আত্রেয়'র (খ্রীঃ পূঃ ৬০০) * ছয়জন কৃতি-শিষ্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে পুঁথি রচনা করেছিলেন। তার প্রায় সবগুলিই হারিয়ে গিয়েছে। কেবলমাত্র অগ্নিভেষ'এর লেখা একটি পুঁথি পাওয়া গিয়েছিল। সেই পুঁথি ভিত্তি করে পরবর্তী যুগের বিখ্যাত চিকিৎসক চরক (১০০ খৃঃ পূঃ) পুঁথি রচনা করেছিলেন। এই সংকলনে তিনি নিজ অভিজ্ঞতা যোগ করেছিলেন চরকের সম্পাদিত এই পুঁথি 'চরক সংহিতা' নামে বিখ্যাত ছিল। এই প্রাচীন রচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছিলাম কিভাবে রোগ হয়, তার বিস্তার কেন হয়, বিভিন্ন রোগের বিশেষ উপসর্গ, দূষিত জলবাহিত রোগ, মশা-মাছি, কীট-পতঙ্গ দ্বারা সংক্রামিত রোগ, অতি ভোজন ও অলসতা জনিত রোগ, দূষিত বাতাস জনিত রোগ সমূহের উপসর্গ, এবং চিকিৎসা পদ্ধতি কি হওয়া উচিত। মনে রাখতে হবে তখন অনুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার হয়নি এবং জীবাণুর আক্রমণ যে বহুরোগের কারণ এই তথ্যও পাশ্চাত্য জগতের কাছে অজানা। সে দেশের বিজ্ঞানীরা আজ থেকে মাত্র পাঁচশত বছর আগে রোগ সৃষ্টি করতে যে জীবাণুর অবদান আছে, এই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন।

শল্যচিকিৎসাতেও প্রাচীন ভারত বিশেষ উন্নত ছিল। আজ ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রচলিত শল্যচিকিৎসা পুস্তকে সেদিনের ভারত যে শল্য-চিকিৎসা দ্বারা বিনষ্ট বা বিকৃত অঙ্গের পুনর্গঠনে (প্লাসটিক সার্জারী) বিশেষ পারদর্শী ও এই বিদ্যার পথ প্রদর্শক ছিল তা দ্বিধাহীন ভাবে স্বীকার করেছে। প্রাচীন ভারতের শল্যচিকিৎসা বিশারদ শুশ্রুত (খ্রীঃ পূঃ ৫০০) শল্যবিদ্যায় তাঁর বিশেষ পারদর্শিতার জন্য বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন

* প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানীর নামের পাশে যে সময়ের উল্লেখ আছে সে সম্বন্ধে বিভিন্ন গবেষকরা একমত নন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ভারতীয় চিকিৎসা বিদ্যার ইতিহাস (ডাঃ গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) অনুসারে সময় উল্লেখ করা হয়েছে।

করেছিলেন। নাক ও কানের খারাপ গঠন ও আঘাতের ফলে বিকৃতি হলে শুশ্রুত শল্যচিকিৎসা দ্বারা সুন্দর করে দিতে পারতেন। শুশ্রুত ছিলেন ধন্বন্তরী মহাশয়ের শিষ্য। শল্যচিকিৎসা বিষয়ে সব পুঁথিই হারিয়ে গেছে। শুধুমাত্র একখণ্ড শুশ্রুত-সংহিতা পাওয়া গিয়েছে যা থেকে আমরা সে যুগের শল্যচিকিৎসা সম্বন্ধে কিছুটা জানতে পেরেছি। এই গ্রন্থে হাত পায়ের অস্ত্রোপচার ছাড়া পেটে, কখনও বা মাথায় অস্ত্রোপচারের বিবরণ পাওয়া যায়। কাটা জায়গা জোড়া হত সুতো দিয়ে। কখনও কালো পিঁপড়েকে কাটা জায়গা কামড়ে ধরতে দেওয়া হত। পরে ঐ পিঁপড়ের মাথা রেখে দেহ কেটে ফেলা হত।

সে যুগের শল্যবিদদের কৃতিত্ব আজ অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। কিছুটা হয়ত অতিরঞ্জিত মনে হতে পারে। তবে শল্যচিকিৎসায় সে দিনের ভারত যে বিশেষ উন্নত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। জেনে রাখা ভাল, যখন ইউরোপ অন্ধকারে, যখন সেখানে শব-ব্যবচ্ছেদ শাস্তি-



প্রাচীন ভারতের শল্যবিদ শুশ্রুত অস্ত্রোপচার করছেন
[পার্ক ডেভিস (ইণ্ডিয়া) লিমিটেডের সৌজন্যে]

যোগ্য অপরাধ বলে গণ্য, সেই সময়ে ভারতবর্ষে শুশ্রুত তাঁর শিষ্যদের উপদেশ দিচ্ছেন, 'তোমরা যদি ভাল শল্যবিদ হতে চাও, তবে শবদেহ ঠিক-ভাবে প্রস্তুত করতে শেখ। তাকে ব্যবচ্ছেদ কর, প্রতিটি শিরা, ধমনী, পেশী, স্নায়ু এমনভাবে চিনে নাও যেন তোমার মনের মধ্যে কোন দ্বিধা না থাকে।' কিন্তু বৌদ্ধযুগে শব-ব্যবচ্ছেদ রদ করা হল অহিংসার নামে। তার ফলে শরীর গঠনবিদ্যা ও শল্যবিদ্যার শিক্ষার মানের অবনতি হয়। পরে বিদেশী আক্রমণে তা প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়।

বৌদ্ধযুগে নাগার্জ্জুন (খ্রীঃ পূঃ ১০০) নামে এক খ্যাতিসম্পন্ন রসায়নবিদ চিকিৎসকের কথা আমরা জানতে পেরেছি। তিনি রোগ নিরাময়ের জন্য রাসায়নিক ঔষধ প্রয়োগ পদ্ধতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এই শতকের প্রথম দশকে (১৯১০ খ্রীঃ) পল এর্লিক যে পদ্ধতি পাশ্চাত্য দেশে প্রচলন করেন, তার বহু আগেই নাগার্জ্জুন ঐ পদ্ধতিতে চিকিৎসার পথ দেখিয়েছিলেন। চিকিৎসা ছাড়া নাগার্জ্জুন চিকিৎসা বিষয়ে প্রাচীন পুঁথি-গুলিকে রক্ষা করার বহু চেষ্টা করেছিলেন, ফলে তাদের অবলুপ্তি অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য বিলম্বিত হয়েছিল। কিন্তু মুসলিম আক্রমণের মুখে সেগুলিকে রক্ষা করা আর সম্ভব হয়নি।

বৌদ্ধযুগে আর একজন বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসকের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর নাম জীবক। তাঁর পরিচয় পাওয়া যায় সে যুগের শিশু চিকিৎসক হিসাবে। কিন্তু তিনি সব বয়সের রোগীর চিকিৎসা করতেন এবং প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বিভিন্ন রোগ চিকিৎসায় তাঁর ব্যবস্থাপত্রের কিছু নমুনা গবেষণা করে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

যে আয়ুর্বেদ একদিন বিশ্বের সকলের শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের উদ্রেক করেছিল, তা আজ অবলুপ্ত। আমাদের কোন চেষ্টা নেই তাকে উদ্ধার করে, তার উন্নতি করে আয়ুর্বেদকে আবার পূর্ব গরিমায় প্রতিষ্ঠা করতে। এদিকে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যা দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে, আর আমরা তাদের পিছনে হামাগুড়ি দিয়ে তাদের ধরবার আশা করছি। যা একেবারেই অসম্ভব। আমাদের দেশের গাছের ছাল, মূল বা পাতা থেকে ওষুধ তৈরী করে পাশ্চাত্যের ওষুধ তৈরী করার প্রতিষ্ঠান এদেশে পাঠাচ্ছে, আর আমরা

শতগুণ বেশী দাম দিয়ে সেই ওষুধ কিনছি। কখনও পুরনো পুঁথি ঘেঁটে দেখার চেষ্টাও করি না, জানতে চেষ্টা করিনা যে আমাদের ভাণ্ডারে কি অমূল্য রতন আছে, যার উজ্জ্বলতা চর্চার অভাবে নষ্ট হয়ে কালিমালিপ্ত হয়ে আছে।

চীন, ভারত, ব্যাবিলন ও মিশর যখন চিকিৎসা বিজ্ঞানে ছিল উন্নতির শিখরে, ইউরোপ তখন ডুবে ছিল অজ্ঞানতার অন্ধকারে। পরে এইসব দেশ থেকে চিকিৎসা বিষয়ের জ্ঞান ছড়িয়ে পড়েছিল এশিয়া মাইনর ও তুরস্কে। পরে সেখান থেকে এজিয়ান সাগর তীরে গ্রীসদেশে এসে পৌঁছলো চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞানেরআলো।

এই গ্রীস দেশেই পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রথম বিকাশ ঘটে-ছিল। ইউরোপে কলা বিজ্ঞান, সাহিত্য, কৃষ্টি সব কিছুই আরম্ভ হয়েছিল এই গ্রীস দেশে। ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে এশিয়া যেখানে ইউরোপের সঙ্গে মিশেছে, গ্রীস দেশটা হল সেখানে। এই দেশের দক্ষিণ দিকে আছে অনেক ছোট ছোট দ্বীপ ; তার মধ্যে একটা খুব ছোট দ্বীপ আছে, যার নাম 'কস'। দ্বীপটি আকারে ছোট হলেও অন্য কারণে এই দ্বীপ আজ বিশ্ববিখ্যাত। কেন? কারণ এখানে খ্রীঃ পূঃ ৪৬০ সালে জন্মেছিলেন হিপোক্রেটিস নামে এক মস্ত পণ্ডিত। এখানেই ছিল গ্রীসের স্বাস্থ্য দেবতা এসকেলেপিয়সের মন্দির। সে সময়ে গ্রীস দেশে পৌত্তলিকবাদ প্রচলিত ছিল। অনুমান যে হিপোক্রেটিসের বাবা ছিলেন এই মন্দিরের পুরোহিত।

হিপোক্রেটিসকে আজও পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক বলা হয়। তিনি কি বিভিন্ন রোগ নিরাময় করার পথ দেখিয়েছিলেন? না। তবে তিনি ভিন্ন ভিন্ন রোগে কি কি লক্ষণ ও উপসর্গ দেখা যায় সেগুলি তাঁর রোগীদের পাশে বসে দিনের পর দিন লক্ষ্য করতেন এবং লিখে রাখতেন। পরবর্তী-কালে তিনি এখানে একটি চিকিৎসা শিক্ষার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁর ছাত্রদের নিয়ে যেতেন রোগীর পাশে, সেখানে বসে তাদের উপদেশ দিতেন কিভাবে রোগীর কাছ থেকে রোগের বিবরণ নিতে হয়, কিভাবে জানতে হয় তার কি কষ্ট। হয়ত কোন রোগীর জ্বর হয়েছে ; তিনি ছাত্রদের উপদেশ দিতেন, লক্ষ্য করো কিভাবে জ্বর আসে, কতক্ষণ



পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক হিপোক্রেটিস

থাকে, কিভাবে জ্বর ছেড়ে যায় অথবা ছাড়ে না। সে যুগে তো আর রোগ নির্ণয়ের জন্য কোন যন্ত্রের সাহায্য পাওয়া সম্ভবপর ছিল না। সেদিনের চিকিৎসকদের সম্বল ছিল তার হাতের অনুভূতি, চোখে দেখা ও কানে শুনে লক্ষণ বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া। হিপোক্রেটিসের কৃতিত্ব এই যে তিনি কোন্ রোগে কি লক্ষণ, কি উপসর্গ দেখা যায়, তা দিনের পর দিন লিপিবদ্ধ করে, বিশেষ রোগের সঙ্গে বিশেষ লক্ষণের সমন্বয়-সাধন করে চিকিৎসা বিজ্ঞানকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করেন। এইভাবে তিনি নিউমোনিয়া, যক্ষা, টাইফয়েড, হাম, মাম্‌পস্, মৃগী প্রভৃতি বহু রোগের লক্ষণ ও উপসর্গ লিখে গিয়েছেন। আজকের

চিকিৎসকরা অবাক হয়ে ভাবেন তাঁর দৃষ্টিশক্তি কত স্বচ্ছ ও চিন্তাশক্তি কত প্রখর ছিল। নিউমোনিয়া রোগে নাকের দুপাশের নরম পাতি যে নিঃশ্বাসের সঙ্গে ওঠানামা করে, এই ধরনের ছোট্ট লক্ষণটুকু তাঁর নজর এড়াতে পারে নি।

চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার শেষে হিপোক্রেটিস তাঁর ছাত্রদের এক শপথ-বাক্য পাঠ করাতেন। ২৫০০ বছর পরেও হিপোক্রেটিসের শপথ চিকিৎসক-দের স্নাতক হবার পরে আজও পাঠ করানো হয় সারা বিশ্বে। এই শপথ পাঠে চিকিৎসকদের ওপর কিছু বিধিনিষেধ ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন, 'আমি শপথ করছি, যে বাড়ীতে চিকিৎসার জন্য যাব, সেখানে রোগীকে সাহায্য করতে যাব। ইচ্ছাকৃত ভাবে খারাপ কিছু করা থেকে বিরত থাকব। ...আমার চিকিৎসা ব্যাপারে যা কিছু দেখব, শুনব আমি তা অন্যের কাছে প্রকাশ করব না, সেটি নিষ্ঠার সঙ্গে গোপন রাখব', ইত্যাদি। এইরূপ আরও বহু ধারা আছে এই শপথ পাঠে।

হিপোক্রেটিসের পরে তাঁর পুত্র থ্যাসালাস তাঁর পিতার লিখিত রোগ বিবরণ-পঞ্জী কস চিকিৎসা বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রকাশ করেছিলেন। বহু বছর পরে ১৮৯৯ খ্রীঃ ফরাসী দেশে এলেন লিত্রেঁ, হিপোক্রেটিসের কার্য্যবিবরণী প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন এবং দীর্ঘ বাইশ বছর ধরে দশটি খণ্ডে হিপোক্রেটিসের চিকিৎসা বিবরণী 'কর্পাস হিপোক্রেটিকাম্' প্রকাশ করা হয়েছে। এই বই থেকে আমরা জেনেছি তাঁর দৃষ্টি কত তীক্ষ্ণ ও চিন্তা কত গভীর ছিল। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি যে পদ্ধতি নিয়েছিলেন আজও মোটামুটি সেই ধারা অনুসরণ করা হচ্ছে। এই কারণেই বোধ হয় তাঁকে আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার জনক আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের মধ্যপর্ব

ষোড়শ শতকের প্যারী! মেডিকেল কলেজে শরীরবিদ্যার অধ্যাপক সিলভিয়াস্ ছাত্রদের পড়াচ্ছেন, আর তাঁর সহকারী মডেলের সাহায্যে ব্যবহারিক জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। অধ্যাপক যে নোট দেখে বক্তৃতা দিচ্ছেন, তার বিষয়বস্তু তৈরি হয়েছিল খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে। সে যুগের দিকপাল চিকিৎসক গ্যালেন দেড় হাজার বছর আগে যা ছাত্রদের শিক্ষা দিয়েছিলেন, সেই বক্তৃতার বিষয়বস্তু নিয়েই এই নোট তৈরী হয়েছিল। নোটের সঙ্গে মডেলের গরমিল দেখা যাচ্ছে, ছাত্ররা উস্‌খুস্‌ করছে, কেউ বা হয়ত বুঝতে পারছে না। কিন্তু সাহস করে কেউ প্রতিবাদ করতে উঠছে না। না, একজন কিন্তু উঠে দাঁড়াল "মহাশয়, আপনার বক্তৃতার সঙ্গে মডেলের মিল দেখছি না।"

অধ্যাপক বললেন, "ঠিক বলেছ, এই গরমিল আমার নজরেও এসেছে। তবে কি জান, আমি যে নোট থেকে তোমাদের পড়াচ্ছি সেটা গ্যালেনের বক্তৃতা থেকে তৈরি করা, আর গ্যালেন কখনও ভুল করতে পারেন না। বোধ হয় এই দেড় হাজার বছরে মানুষের শরীরের গঠন বদল হয়েছে।"

যে গ্যালেনের ওপর এতখানি বিশ্বাস ছিল সে যুগের মানুষের, কে ছিলেন এই গ্যালেন? আর কে সেই ছাত্র যিনি প্রথম গ্যালেনের শেখান বিষয়ের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন? ছাত্রটির নাম অদ্রেঁ ভেসেলিয়ঁ; আর গ্যালেন ছিলেন দ্বিতীয় শতকের এক কৃতী চিকিৎসক, যাঁর খ্যাতি ও সুনাম সেই যুগে দক্ষিণ ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল।

গ্যালেনের জন্ম হয়েছিল এশিয়া মাইনরের পারগামাম শহরে ১২৯ খ্রীঃ। এশিয়া মাইনর এখন তুরস্ক দেশের অন্তর্গত। প্রাচীন যুগে এই দেশ ছিল রোমান সম্রাটের অধীন। গ্যালেনের বাবা ছিলেন সুশিক্ষিত এবং পুত্রের জীবনে স্বভাবতই বাবার প্রভাব ছিল। মায়ের কাছে তিনি ধৈর্যশিক্ষা পেয়েছিলেন। চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত বাড়িতে লেখাপড়া শেখার পরে

তাঁর স্কুল জীবন শুরু হয়েছিল। সতের বছর বয়সে স্বপ্নাদেশ পেয়ে তিনি চিকিৎসক হতে মনস্থ করেন। সে যুগে শিক্ষিত লোকেরা স্বপ্নে দেখা ঘটনাকে সত্য বলে বিশ্বাস করতেন।

গ্যালেন নিজের শহর পারগামামে ও অন্যান্য শহরের মহাবিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা শেষ করে আবার ফিরে এলেন পারগামাম শহরে। সে সময়ে শিক্ষা পাওয়া চিকিৎসকের অভাব ছিল খুব বেশী ; গ্যালেন এসে সেই অভাব কিছুটা লাঘব করেছিলেন। অল্পদিনেই তাঁর পসার জমে উঠল এবং দেশে বিদেশে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল। রোম সম্রাট মার্কাস এরেলিয়সের কাছ থেকে ডাক এলো গ্যালেনের। রোমের তখন দারুণ রমরমা, বিশাল সৈন্যবাহিনী তাদের ; বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখছেন রোম সম্রাট। কিন্তু চিকিৎসকের দারুণ অভাব। দেশে যাঁরা চিকিৎসক বলে পরিচিত, তাঁদের কথা না বলাই ভাল। বালকের পেট ব্যথা হলে তার পেটের ওপর নেচে অপদেবতাকে তাড়াতেন তাঁরা, চোখ খারাপ হলে বাংএর চোখ মালা করে গলায় পরবার বিধান দিতেন। এইসব "চিকিৎসক" দিয়ে বিশ্বজয়ের পরিকল্পনা যে বাতুলতা তা রোম সম্রাট নিশ্চয়ই বুঝতেন। সেইজন্য তাঁর চিন্তা ছিল কোথায় ভাল চিকিৎসক পাওয়া যেতে পারে। নিজের দেশে না হোক গ্রীসে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। তাছাড়া ছিল গ্লাডিয়েটরদের চিকিৎসার সমস্যা ; আহত বন্দীরা তো আর ভালভাবে লড়াই করতে পারে না। তাদের সুস্থ করে আবার লড়াই অঙ্গনে পাঠাবার জন্যও সুচিকিৎসক দরকার। এইসব কারণে গ্যালেনের ডাক এলো রোম সম্রাটের কাছ থেকে আর গ্যালন সেই ডাকে সাড়া দিতে দ্বিধা করলেন না। চলে এলেন রোমে।

রোমে এসে তিনি সে দেশের জনস্বাস্থ্য ও পৌরস্বাস্থ্য ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এনেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে খারাপ পানীয় জল ও দূষিত পয়ঃপ্রণালী থেকে বহু সংক্রামক রোগ হতে পারে। তিনি পাহাড়ের মাথায় বিরাট জলাধার তৈরী করে সেখানে বৃষ্টির জল সঞ্চয় করে, সেই পরিষ্কার জল সরু ঢাকা নালী দ্বারা রোম শহরে সরবরাহের ব্যবস্থা করে-ছিলেন। জঙ্গল পরিষ্কার করে, মশা তাড়িয়ে, ম্যালেরিয়া কমিয়ে ফেলতে

সক্ষম হয়েছিলেন। জলা ও নালার জল ঠিকমত নিকাশের ব্যবস্থা করে সাধারণ শহরবাসীর স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে সফল হয়েছিলেন।

শরীরবিদ্যার বিভিন্ন দিকে গবেষণা করে তিনি নতুন শাস্ত্র শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। তাঁর গবেষণা, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষায় অনেকটাই অবশ্য ঠিক ছিল, তবে কিছু মারাত্মক ভুলও ছিল। কিন্তু কেউ সাহস করে সেই ভুলগুলি দেখাতে এগিয়ে আসেন নি। এই সময়ে ইউরোপে শব ব্যবচ্ছেদ ছিল আইনবিরুদ্ধ কাজ; কারণ এই কাজ নাকি পাশবিক। কিন্তু এক বন্দী গ্লাডিয়েটর আর এক বন্দীকে লড়াই-এর নামে হত্যা করছে, তাকে পাশবিক মনে করা হোত না, বরং সেটিকে নির্দোষ আনন্দের উপাদান বলে মনে করা হোত। কিন্তু শিক্ষা দিতে হলে শরীর কেটে, তার ভিতরে কি থাকে, না জানলে ঠিকমত শিক্ষা দেওয়া কি সম্ভব? না, একেবারেই সম্ভব নয়। গ্যালেনও এই অসুবিধায় পড়ে, ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য, বছরে একবার মরা শুয়োর এনে, ব্যবচ্ছেদ করে তাদের দেখাতেন। এই শিক্ষা পদ্ধতিতে ভুল থাকলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।



গ্যালেন

কখনও তিনি একজাতের আফ্রিকান বানর ব্যবচ্ছেদ করে ছাত্রদের শারীর-বিদ্যা (অ্যানাটমি) শিক্ষা দিতেন। এত অসুবিধা সত্বেও তিনি হৃদপিণ্ডের গঠন নাড়ীর গতি-প্রকৃতি অনুভব করে রোগীর অবস্থা নিরূপণ এবং আমাদের শরীরের যাবতীয় স্নায়বিক অনুভূতি কশেরুকা (স্পাইনাল কর্ড) ও বিশেষ বিশেষ স্নায়ু দ্বারা মস্তিষ্কে যায়, এই মূল্যবান তথ্য প্রমাণ করেছিলেন। তবে তিনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে অনেক ক্ষেত্রে ভুল করেছিলেন এবং সেই ভুল সংশোধন হয়েছিল বহু শত বছর পরে। হৃদপিণ্ড ও রক্ত চলাচল বিষয়ে তিনি ভুল শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল, রক্ত ডানদিক থেকে বাঁ দিকের প্রকোষ্ঠে যায়, মধ্যের দেওয়াল থেকে চুঁইয়ে অথবা খুব ছোট কোন ফুটোর মধ্য দিয়ে। তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন রক্ত হৃদপিণ্ড থেকে বেরিয়ে আবার সেই পথেই ফিরে আসে, নদীর জোয়ার-ভাটার মত। কিন্তু এই সিদ্ধান্তও তো ভুল। এ ছাড়া তিনি মনে করতেন হাওয়া ফুসফুসের থেকে হৃদপিণ্ডে গিয়ে রক্তের সঙ্গে মিশে যায়। এই রকম আরও ভুল তাঁর শিক্ষার মধ্যে ছিল, কিন্তু কারো সাহস ছিল না এই ভুল দেখিয়ে দেওয়ার। ফলে প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্ররা ভুল শিখতে থাকল। গ্যালেন ছিলেন ভীষণ দাম্ভিক ; তাঁর শিক্ষা দেওয়া মতবাদের কেউ বিরোধিতা করলে তিনি একেবারেই সহ্য করতেন না। তিনি মনে করতেন চিকিৎসাবিদ্যায় তাঁর কথাই শেষ কথা। হিপোক্রেটিসের মতবাদে দীক্ষিত হয়েও কেন তাঁর এত আত্মম্ভরিতা ছিল, সেটাই ভাবলে অবাক হতে হয়।

গ্যালেনের মৃত্যুর প্রায় সাড়ে বারশো বছর পরে লিওনার্দো নামে এক শিল্পী মানব শরীরের গঠন সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য যোগ করে চিকিৎসকদের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেন। লিওনার্দো একজন বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তি। যত-দিন পৃথিবীতে সভ্যতা বেঁচে থাকবে, তিনি অমর হয়ে থাকবেন। লিওনার্দো নামটা চেনা হয়েও যেন অচেনা লাগছে, কিন্তু তাঁর নামের পাশে তাঁর গ্রামের নামটি যোগ হলে এই অচেনা ভাব আর থাকবে না। তাঁর জন্ম ১৪৫২ খ্রীঃ ইতালীতে ফ্লোরেন্সের কাছে ভিঞ্চি গ্রামে। বাবা ছিলেন গ্রামের এক সরকারী কর্মচারী, আর মা গ্রামের সরাইখানার

পরিচারিকা। লিওনার্দোর বহুমুখী প্রতিভার বিবরণ এই ক্ষুদ্র কথিকার মাধ্যমে বলা সম্ভব নয়। তিনি নিজে চিকিৎসক না হয়েও মানুষের শরীর সম্বন্ধে অনেক অজানা কথা আমাদের জানিয়েছেন। সে যুগে তিনি ধর্মীয় সংস্কার অগ্রাহ্য করে নিজে ত্রিশটি শব ব্যবচ্ছেদ করেছিলেন। মানুষের শরীরের চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়ার পরে মাংসপেশী দেখতে কেমন হয়, সে সম্বন্ধে যা এঁকে গিয়েছেন, আজ ৫০০ বছর পরেও তাঁর চেয়ে উন্নততর ছবি কেউ আঁকতে পারেন নি। তিনি এঁকে দেখিয়েছেন, পেশী সংকোচন করলে দেখতে কেমন হয় এবং কিভাবে শরীরের হাড় নড়ে। তিনি লিখেছিলেন ও এঁকে দেখিয়েছিলেন, মস্তিষ্কের ভেতরে দুপাশে ফাঁপা জায়গা আছে এবং তার মধ্যে জলীয় পদার্থ থাকে। মানুষের চোখের ওপরে কপালে এবং নাকের দু'পাশে ফাঁপা জায়গা আছে, এ তথ্যও তিনি প্রথম বলেছিলেন। তবে তাঁর যে দুটি কাজ তাঁকে অমরত্ব দিয়েছে, তা এত বড় যে ঐ সব ক্ষুদ্র কাজকে কেউ কখনও গুরুত্ব দেয় নি, এমন কি তিনিও দেন নি। কারণ, এ সম্বন্ধে তাঁর লেখা কখনও ছাপা হয় নি,



লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি

পাণ্ডুলিপি আকারেই রয়েছে এখনও। তাঁর সেই বড় কাজ ছুটি কি? ছু'খানি তৈলচিত্র "শেষ ভোজ", আর একটি "মোনালিসা"। যার রহস্যময় হাসির রহস্যভেদ করতে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কলা রসিকরা ব্যর্থ হয়েছিলেন।

লিওনার্দো মারা যান ১৫১৯ খ্রীঃ। যেহেতু তিনি চিকিৎসক ছিলেন না, মানুষের শরীরের গঠন প্রকৃতি নিয়ে তিনি কি বললেন তা নিয়ে সেদিন কেউ মাথা ঘামায় নি। চিকিৎসা বিজ্ঞান ভুল পথে চলেছিল, তার অগ্রগতি থেমে থেকেছিল আরও কয়েক বছর, যতদিন না সেই সাহসী ছাত্র অদ্রেঁ ভেসেলিয়ঁ শিক্ষকের পড়ান বিষয়বস্তুর যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। ছেলেটিকে সাহসী বললাম। কারণ, সে যুগে গ্যালেনের খ্যাতি-প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা এত উঁচুতে ছিল যে তাঁর মতের প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা, প্রশ্ন করার সাহস কারও ছিল না।

অদ্রেঁ ভেসেলিয়ঁর জন্ম হয়েছিল ১৫১৪ খ্রীঃ বেলজিয়ামের রাজধানী 'ব্রাসেল্‌স'-এ। তাঁর বাবা ছিলেন স্পেন দেশের সম্রাট পঞ্চম চার্লসের ঔষধ প্রস্তুতকারক। ছেলেবেলায় তিনি পরিবারের লোকদের কাছে ছিলেন, এক সমস্যার বিষয়। বাড়ির সকলে তাঁর ওপর খুব বিরক্ত ছিল। আর বিরক্ত হবে না কেন? তাঁর প্রিয় শখ ছিল কোথায় ইঁছুর আছে ধর, আর কেটে দেখ কি আছে তার মধ্যে। পাখি, আরশোলা যা পাওয়া যায় কিছুতেই অরুচি নেই, ঘৃণা নেই। যেখানে বাবা ওষুধ তৈরী করেন, সেখানে ছেলে যদি লেখাপড়া না করে পোকা-মাকড় কাটে, বাড়ির লোকেরা বিরক্ত হলে খুব দোষ দেওয়া যায় কি? কিন্তু ভাগ্যবিধাতা বোধহয় তাঁকে চিকিৎসক করবেন বলে তাঁর মনে এই অদ্ভুত শখ সৃষ্টি করেছিলেন।

ভেসেলিয়ঁ প্রথম শিক্ষা পেয়েছিলেন ল্যুভে বিশ্ববিদ্যালয়ে। চিকিৎসক হওয়ার বাসনা আগেই ছিল, নিজের দেশ ছেড়ে এলেন প্যারীতে বাসনা পূরণের জন্য। প্যারীতে তাঁর অধ্যাপক ছিলেন সিলভিয়াস্ যিনি ছিলেন অন্ধভাবে গ্যালেনের মতবাদে প্রভাবিত। অধ্যাপকের পড়ানো বিষয়ে ভেসেলিয়ঁ সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন এবং সে কথা কথিকার প্রথমেই বলা হয়েছে।

ভেসেলিয়ঁ কিন্তু শিক্ষকের উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি, তাঁর সংকল্প ছিল সত্যকে আবিষ্কার করতে হবে, তাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তিনি সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন, মানুষ কেটে দেখতে হবে কি রহস্য আছে মানুষের শরীরের মধ্যে। কাজটা কিন্তু মোটেই সহজ ছিল না ; সে যুগে শবব্যবচ্ছেদ করলে শাস্তি ছিল হয় ফাঁসি, না হয় পুড়িয়ে মারা। যারা এনাটমী পড়ে, তারা খুব বেশী হলে মরা মানুষের হাড় নিয়ে পড়তে পারে, কিন্তু মরা মানুষ কেটে দেখা অসম্ভব ব্যাপার, ধর্মের নিষেধ। একটা মানুষের সব হাড় সাজিয়ে কঙ্কাল তৈরী করাও খুব ভাল চোখে দেখা হোত না, তবে বিশেষ ক্ষেত্রে কখনও কখনও অনুমতি দেওয়া হোত। সেকালে প্রায় সব কবরখানায় মৃতের হাড় এখানে ওখানে পড়ে থাকতে দেখা যেত, আর বোধহয় সেই কারণেই ভেসেলিয়ঁ ও তাঁর এক বন্ধু প্যারীর উপকণ্ঠের কবরখানাকে তাঁদের ক্লাসঘর করে তুললেন।

দুই বন্ধু একদিন গিয়েছিলেন প্যারীর উপকণ্ঠে, ফেরার পথে রাস্তার পাশে একটি ফাঁসীর মঞ্চ দেখলেন। সেখানে দড়িতে ঝুলছে একটি কঙ্কাল ; বোধহয় ফাঁসীর পরে শকুন বা অন্য পাখিরা লোকটির শরীরের সমস্ত মাংস খাবলে খেয়ে নিয়েছে, আর লিগামেন্টের বাঁধনে বাঁধা হাড়গুলো শুধু পড়ে আছে। দুই বন্ধু চোখ আর সরাতে পারেন না, দাঁড়িয়ে দেখতে থাকেন। এমন সুযোগ আর কি পাওয়া যাবে ? কিন্তু ঐ কঙ্কাল দিনের আলোয় নামিয়ে আনা তো সম্ভব নয়।

বাড়ি ফিরে এলেন দুজনে। শেষে এক দুঃসাহসী সংকল্প নিলেন তাঁরা, যে ভাবে হোক ঐ কঙ্কালকে তাঁদের ঘরে আনতেই হবে। রাত একটু গভীর হতেই কম্বল মুড়ি দিয়ে চললেন তাঁরা সেই ফাঁসীর জায়গায়, দড়ি কেটে সেটি নামিয়ে কম্বল চাপা দিয়ে শান্তভাবে ফিরে এলেন নিজেদের ঘরে। জোরালো আলো জ্বালতে ভয় আছে, কেউ সন্দেহ করতে পারে। তাই মোমবাতির কাঁপা আলোয় দুই বন্ধু রাতের পর রাত সেই কঙ্কাল নিয়ে, বিভিন্ন হাড়ের একের সঙ্গে অপরের কি সম্বন্ধ, কি ভাবে জোড়া থাকে, বারবার দেখেন, হাত দিয়ে অনুভব করে মনের মধ্যে গেঁথে নিলেন। ভাবলে আশ্চর্য লাগে, ঐ দুই যুবকের বয়স তখন ২০ বছর পার হয় নি।

পরিশ্রম ও সাধনার দ্বারা তাঁরা শরীরের সমস্ত হাড়গুলি এমনভাবে চিনেছিলেন যে চোখ বেঁধে হাতে যে কোন একটা ছোট হাড় ধরিয়ে দিলে শুধু অনুভব করে বলে দিতে পারতেন যে সেই হাড় শরীরের কোন্ জায়গায় কেমন ভাবে থাকে।

গুণী লোকের সুনাম ছড়াতে দেরী হয় না। এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। ভেসেলিয়ঁর ডাক এলো ইতালীর পাতুয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এনাটমীর অধ্যাপক হবার জন্য। তাঁর বয়স তখন মাত্র ২২ বছর। তিনি কোনরূপ দ্বিধা না করে এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। তিনি সেখানে অধ্যাপনার সুযোগ পেয়েছিলেন মাত্র পাঁচ বছর। নিজে যা দেখেছেন, যা প্রমাণ করতে পারতেন শুধু সেই বিষয়ে ছাত্রদের শিক্ষা দিয়েছেন। এ ছাড়া দিবারাত্র পরিশ্রম করে তিনি লিখলেন পৃথিবীর প্রথম এনাটমী বই, 'অন দি স্ট্রাক্চার অফ হিউম্যান বডি' (মানব শরীরের গঠন বিষয়ে)। বইটিতে বহু সুন্দর ছবি ছিল জ্যান স্টিফেন ভ্যান ক্যালসারের আঁকা। তখনকার দিনে তো আর ফটো ছিল না, আঁকা ছবি দিয়েই ব্যবচ্ছেদ করা মানব শরীরের পেশী, শিরা, অস্থি ইত্যাদি দেখান হত।

বই তো লেখা হল, কিন্তু বন্ধুরা বললেন, "এ বই প্রকাশ করো না, কারণ এতে শব ব্যবচ্ছেদের কথা লেখা আছে, গ্যালেনের মতবাদের বিরোধিতা আছে। হয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তারা তোমায় শাস্তি দেবেন। তোমার সুনাম সম্মান সবই যাবে।"

ভয় পেলেন ভেসেলিয়ঁ। বইটির প্রথম সংস্করণে গ্যালেনের নাম উল্লেখ না করে লিখলেন, "হৃদপিণ্ডের ডান ও বাম অংশের মধ্যে যে দেওয়াল আছে, সেটা বেশ পুরু, তার মধ্যে কোন ফুটো আমার চোখে পড়ে নি। শরীরটাই যখন ঈশ্বরের সৃষ্টি, আর রক্তকে যদি ডান থেকে বাঁদিকে সোজা পথে যেতে হয়, তবে তিনি দুই অংশের মধ্যে দেওয়াল সৃষ্টি করবেন কেন ?"

মৃদু সমালোচনা হোল এখানে সেখানে, তা সত্বেও বইটি জনপ্রিয় হোল এবং অল্প দিনেই প্রথম সংস্করণ শেষ হোল ও বাজারে জাল বই চালু হোল। দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হোল, এবার কিন্তু তিনি খোলাখুলিভাবে

গ্যালেনের মতের বিরোধিতা করলেন। তিনি লিখলেন, "গ্যালেনের মতবাদের বিরোধিতা করা আমার উদ্দেশ্য নয় ; কিন্তু আমি তাঁর একথা মানতে রাজী নই যে রক্ত সোজাসুজি ডান থেকে বাঁ দিকে যায়। আমি দেখতে পেয়েছি, হৃদপিণ্ডের দুদিকের মধ্যের দেওয়াল তার অন্য অংশের মতই পুরু এবং তার মধ্যে এমন কোন ফুটো নেই যার মধ্যে দিয়ে চুল গলে যেতে পারে।

এর পরে যা হওয়া উচিত ছিল তাই হোল ; দিকে দিকে ভেসেলিয়ঁর নিন্দা শোনা যেতে লাগল। ভয় পেয়ে তিনি সাহায্য চাইলেন স্পেনের সম্রাটের কাছে ; লিখলেন, "আমি জানি, আমার তরুণ বয়সের জন্য আমার কাজের যথাযথ মূল্যায়ন হবে না। তবে যাঁরা এনাটমী নিয়ে কোন কাজ করে নি, তাদের আক্রমণ থেকে আপনি আমায় রক্ষা করবেন, সে আশা আমার আছে।"

ভেসেলিয়ঁ জানতেন এই বইটি তার বিরূপ সমালোচনা আনবে, কারণ তিনি চিকিৎসা ও তার শিক্ষাব্যবস্থা এবং গ্যালেনের শিক্ষার ভুলগুলি সকলের সামনে তুলে ধরেছিলেন। সুতরাং তাঁর পক্ষে ভয় পাওয়া খুবই



ভেসেলিয়ঁ ক্লাসে শিক্ষা দিচ্ছেন

স্বাভাবিক। শেষ পর্যন্ত তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদ থেকে বরখাস্ত করা হোল ; তবে সম্রাট চার্লস তাঁকে ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসাবে কাজ দিয়েছিলেন। পৃথিবীর প্রথম এনাটমীর অধ্যাপক সত্য বলার জন্য শাস্তি পেলেন। ১৫৬৪ খ্রীঃ মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে হতাশাগ্রস্থ ভেসেলিয়ঁ পরলোকগমন করেন, অধ্যাপনার সুযোগ তাঁর জীবনে আর আসে নি।

ভেসেলিয়ঁর মৃত্যুর চোদ্দ বছর পরে ১লা এপ্রিল ইংলণ্ডের ফোকস্টনে এক শিশুর জন্ম হয়েছিলো এবং সেই শিশু পরবর্তীকালে বিশ্বজোড়া নাম করেছিল। তার নাম উইলিয়ম হার্ভে। উইলিয়মের বাবা ছিলেন ধনী ব্যবসায়ী পরে তিনি ঐ শহরের মেয়র হয়েছিলেন। হার্ভেরা ছিলেন সাত ভাইও তিন বোন। দশ বছর বয়সেহার্ভে ক্যানটারবেরীর কিংস স্কুলে ভর্তি হলেন। পনের বছর বয়সে এলেন কেমব্রিজের কেনস্ কলেজে। সেই সময় ঐ কলেজে দু'জন আসামীর মৃতদেহ আনা হয়েছিল ব্যবচ্ছেদের জন্য। হার্ভে সেই শবব্যবচ্ছেদ অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন এবং বোধহয় এই থেকেই তিনি চিকিৎসক হবার প্রেরণা পেয়েছিলেন। কেমব্রিজের পড়া শেষ করে তিনিচললেন ইতালীর পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে, যেখানে ভেসেলিয়ঁ এনাটমী পড়াতেন। সেখানে আবার ১৫০০ বছরের পুরনো গ্যালেনের নোট পড়ান হচ্ছে। হার্ভের সংশয় ছিল ঐ পাঠ্য বিষয়ে, কিন্তু তিনি কোন প্রতিবাদ করেন নি। কারণ তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান, পাশ করার আগে শিক্ষকের বিরাগভাজন হয়ে নিজের ভবিষ্যত নষ্ট করতে চান নি।

পাস করে লণ্ডনে এসে প্র্যাকটিসের লাইসেন্স নিলেন আর সেই সঙ্গে কেমব্রিজে 'কলেজ অব ফিজিসিয়ানস্'-এ উচ্চতর শিক্ষার জন্য ভর্তি হলেন। তিন বছর পরে 'ফেলো' হয়ে সেন্ট বার্থালেমিউ হাসপাতালে মেডিসিনের শিক্ষক হিসেবে যোগ দিলেন। এই সঙ্গে ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লস-এর ব্যক্তিগত চিকিৎসকের দায়িত্ব তিনি নিয়েছিলেন। পরে যখন চার্লসের সঙ্গে ক্রমওয়েলের যুদ্ধ বাঁধে, ভাগ্যক্রমে হার্ভে তখন অনেক দূরে অক্সফোর্ডে গবেষণা করছেন, না হলে হয়ত রাজা চার্লস-এর সঙ্গে এক অজানা অচেনা হার্ভেরও শিরচ্ছেদ হয়ে যেত।

হার্ভে এমন কি আবিষ্কার করেছিলেন, যা তাঁকে বিশ্ববিখ্যাত করে-



রক্ত কিভাবে চলাচল করে, হার্ভে বুঝিয়ে দিচ্ছেন
[পার্ক ডেভিস (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের সৌজন্যে]

ছিল ? তিনি জন্তুর বুকের খাঁচা খুলে দেখলেন, হৃদপিণ্ড কিভাবে কাজ করে। দেখা গেল, হৃদপিণ্ড সব সময়েই কাজ করে চলেছে ; একটি সংকোচনের পর অল্পক্ষণ নিশ্চল, আবার সংকোচন। এইভাবেই চলে, একবার নয়, বারবার। আরও দেখা গেল সংকোচনের সময় আকারে ছোট হয়, শক্ত হয় আর রং হয়ে যায় ফিকে। নিশ্চল অবস্থায় আকারে বড় এবং রং হয়ে যায় লালচে। হার্ভে বুঝলেন, হৃদপিণ্ড ফাঁপা যন্ত্র, সংকোচনের সময়ে রক্ত বেরিয়ে আসে ; আর নিশ্চল অবস্থায় আকারে দেখতে বড় এবং এই সময় রক্ত ফিরে আসে হৃদপিণ্ডের ভিতরে। তিনি আরও লক্ষ্য করলেন, তখন হৃদপিণ্ড সংকুচিত হয় তখন ধমনীর ওপর হাত রাখলে আমরা তার কম্পন অনুভব করতে পারি। যদি কোন ধমনী ফুটো করা হয়, রক্ত সেই ফুটো দিয়ে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসে। ধমনীর ওপর চাপ দিলে রক্তক্ষরণ বন্ধ করা যায়।

এর পর হার্ভে হিসাব করলেন প্রতি সংকোচনে কতটা রক্ত হৃদপিণ্ড

থেকে বেরিয়ে আসে প্রধান ধমনীতে। তিনি দেখলেন, প্রতি সংকোচনে প্রায় তুই আউন্স পরিমাণ রক্ত আসে প্রধান ধমনীতে। হৃদপিণ্ডে প্রতি মিনিটে ৭২ বার সংকোচন ও প্রসারণ হয় ; এর ফলে প্রতি মিনিটে প্রায় ১ গ্যালন রক্ত বেরিয়ে আসে হৃদপিণ্ড থেকে। খুব আশ্চর্য লাগছে হার্ভের হিসেব করলেন ২৪ ঘণ্টায় প্রায় ১৫০০ গ্যালন রক্ত বেরিয়ে আসে! এত রক্ত আসে কোথা থেকে? খেয়ে তো নয় ; আর শরীরে তারা থাকেই বা কোথায়? শিরা ও ধমনীতে? না, সেখানে এত রক্ত থাকার জায়গা তো নেই। শরীরের কোষগুলিতে? না, তাহলে তারা ফেটে যাবে। সমস্যায় পড়লেন হার্ভে। অবশেষে সিদ্ধান্ত করলেন, হৃদপিণ্ড ফাঁপা, রক্ত ধমনী দিয়ে বার হয়ে, শিরা দিয়ে আবার হৃদপিণ্ডে ফিরে আসে। এই-ভাবে একই রক্ত শরীরের মধ্যে ঘুরতে থাকে।

হার্ভের এই মত কিন্তু গ্যালেনের সঙ্গে মেলে না। গ্যালেনের বিরোধিতা করতে ভেসেলিয়ঁ ভয় পেয়েছিলেন, কিন্তু হার্ভে ভয় পান নি। তিনি একজন বেঁটেখাটো লোক ছিলেন বটে, কিন্তু ভীষণ রাগী লোক ছিলেন। কোটের নীচে থাকত ছোট একটি ছোরা, কারো সঙ্গে বিরোধ হলে ছোরা নিয়ে এগিয়ে যেতেন। তিনি ছিলেন বাস্তববুদ্ধি-সম্পন্ন এবং বোধহয় কিছুটা সুবিধাবাদী। ক্লাসে ভুল পড়ান নিয়ে কখনও প্রতিবাদ করেন নি। চার্লস-এর চিকিৎসক হয়েও যখন চার্লস-এর সঙ্গে ক্রমওয়েলের বিবাদ বাধল, হার্ভে হয়ে গেলেন নিরপেক্ষ। অবশ্য তখন ভাগ্য তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিল।

১৬২৮খ্রীঃ তিনি ৭২ পৃষ্ঠার ছোট্ট একটি বই প্রকাশ করেন জার্মানী থেকে, বইটির নাম 'মোশান অফ হার্ট এ্যাণ্ড ব্লাড ইন এনিম্যালস্।' বইটি ছিল যুগান্তকারী, যা সে যুগের বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণা বদলে দিতে পেরেছিল। হার্ভে সেদিন সাহস করে ভুল ধারণা ভেঙ্গে দিয়েছিলেন, তা না হলে হয়ত বিশ্বের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আরও কয়েক শত বছর ভুল ভিত্তির ওপর বিজ্ঞানচর্চা করতে হত।

ভেসেলিয়ঁ ও হার্ভে নিজেদের সময়ে দেশে ও বিদেশে সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন সত্য ; কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁরা তুজনে যথাক্রমে এনাটমী ও ফিজিওলজি বিজ্ঞানের পথিকৃৎ হিসাবে স্বীকৃতি ও পরিচিত লাভ করেছিলেন।

এনতনি ভ্যান লিউয়েন হুক

ক্রমওয়েলের সময়ের ইংলণ্ড। রাজা প্রথম চার্লসকে যুদ্ধে হারিয়ে শিরচ্ছেদ করে ক্রমওয়েল বসেছেন ইংলণ্ডের সিংহাসনে। দেশের লোক তাঁকে ভালবাসত না ; তাঁকে ভয় করত, প্রাণ খুলে দুটো কথা বলতেও ভয় পেত। সেই সময়ে দেশের শিক্ষিত পণ্ডিত শ্রেণীর কিছু লোক মিলে গোপনে প্রতিষ্ঠা করলেন একটি সংঘ, যার নাম দিয়েছিলেন "ইন্‌ভিসিবল কলেজ" অর্থাৎ অদৃশ্য কলেজ। সদস্যরা ছিলেন স্বাধীনচেতা, দার্শনিক ; যাঁরা সেদিনের ইংলণ্ডের বহু প্রচলিত বিশ্বাস-ধ্যান-ধারণা বিনা যুক্তিতে বিনা প্রমাণে মেনে নিতে রাজী ছিলেন না। কেউ হয়ত কোথাও শুনে এসেছে যে এক শিংওয়ালা জন্তুর শিং গুঁড়ো করে, মাটিতে গণ্ডী করে দিয়ে, তার মধ্যে মাকড়সা ছেড়ে দিলে, সে আর পালাতে পারবে না। এই ধারণা কি সত্য ? পরীক্ষা করে দেখা যাক। একজন সভ্য আনলেন শিং-এর গুঁড়ো অপর একজন মাকড়সা। বাতির আলোয় গোল হয়ে বসে শিং-এর গুঁড়ো গণ্ডী করে মেঝেতে ছড়িয়ে একটি মাকড়সা ছেড়ে দিলেন। মুহূর্তের মধ্যে সেই মাকড়সা গণ্ডীর ওপর দিয়ে হেঁটে চলে গেল। ক্রমওয়েলের ফাঁসির দড়ির ভয়ে এরা কিন্তু খোলাখুলি ভাবে তাঁদের বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা সেদিন কাউকে বলতে পারেন নি। মাকড়সা নিয়ে তাঁদের এই পরীক্ষা আজ আমাদের ছেলেমানুষী মনে হতে পারে ; কিন্তু সেদিনের ইংলণ্ডে এ ধরনের পরীক্ষা সাহসিকতা বলে মনে করা হোত। সেদিনের "অদৃশ্য কলেজের" প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের নাম কালের ক্ষয় উপেক্ষা করে আজও ভাস্বর। সদস্যদের একজন ছিলেন রসায়ন বিজ্ঞানের পথিকৃৎ রবার্ট বয়েল, অপর একজন ছিলেন স্যার আইজাক নিউটন, যাঁকে মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের জনক বলে জানি।

ক্রমওয়েলের পর ইংলণ্ডের সিংহাসনে এলেন প্রথম চার্লসের পুত্র,

দ্বিতীয় চার্লস। আর 'অদৃশ্য কলেজ' ১৬৬০ খ্রীঃ পণ্ডিত সমাজে নিজের প্রাপ্য মর্যাদা নিয়ে, অন্ধকার থেকে দিনের আলোয় মুখ দেখতে পেল। সেদিন থেকে তার নূতন নাম হয়েছিল 'রয়েল সোসাইটি অব ইংলণ্ড!' আজ বিশ্বের মুষ্টিমেয় পণ্ডিতেরা এই সোসাইটির সদস্য হওয়ার সম্মান লাভ করে থাকেন। আমাদের দেশের আচার্য জগদীশচন্দ্র, ডঃ সি, ভি, রমেন, আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা, অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ এবং বাংলার বাইরের আরও কয়েকজন বিজ্ঞানী এই সোসাইটির সদস্যপদ পেয়েছিলেন। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র এডিনবরা রায়ল সোসাইটির সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন।

এইরূপ ঐতিহ্যপূর্ণ সোসাইটির তরফ থেকে অনুরোধ এলো হল্যাণ্ডের এক শুকনো ফল ব্যবসায়ীর কাছে, 'আপনি আরও কাজ করুন, আপনার গবেষণার ফল আমাদের জানান এবং যদি সম্ভব হয় আমাদের তরফ থেকে সোসাইটির একজন সদস্যকে আপনার যন্ত্রটি দেখার অনুমতি দিলে বাধিত হবো।' কে এই ফলওয়ালা, আর কি এমন যন্ত্র তিনি তৈরি করেছিলেন যা দেখবার জন্য ইংলণ্ডের খ্যাতনামা পণ্ডিতেরা আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন?

সেই ফলওয়ালার নাম এনতনি ভ্যান লিউয়েনহুক, আর তাঁর আবিষ্কার করা যন্ত্রটি ছিল বিশ্বের প্রথম অনুবীক্ষণ যন্ত্র (মাইক্রোস্কোপ)। লিউয়েনহুকের জন্ম হয়েছিল হল্যাণ্ডের ডেলফ্ শহরে, ১৬৩২ খ্রীঃ ২৪শে অক্টোবরে। শহরে তাঁরা ছিলেন সম্মানীয় নাগরিক। তাঁদের ব্যবসা ছিল ঝুড়ি তৈরি আর মদ তৈরি করা। লিউয়েনহুকের বাবা যখন মারা যান তখন তাঁর বয়স খুব কম। মা ছেলেকে বিদ্যালয়ে পাঠালেন এই আশা নিয়ে যে লেখাপড়া শিখে ছেলে তাঁর বড় সরকারী চাকরী পাবে। কিন্তু ছেলে সে পথেই গেল না। মা হাল ছেড়ে দিলেন। লিউয়েনহুক ১৬ বছর বয়সে চলে গেলেন আমস্টারডামে শুকনো ফলের ব্যবসার ব্যাপারে হাতে-কলমে কাজ শেখবার জন্য। সেখানে ৬ বছর কাটিয়ে ২২ বছর বয়সে তিনি ডেলফ্ শহরে ফিরে এসে নিজেই ব্যবসা আরম্ভ করলেন। কিছুদিন পরে বিবাহ করলেন এবং নিজের ব্যবসা ছাড়া নগরসভা ভবনে

তত্ত্বাবধায়কের কাজ নিলেন। এই সময়প্রায় ২০ বছর তিনি কি করেছেন বা করেন নি, তার কোন হদিশ পাওয়া যায় নি। তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই তিনি এই সময়ের অনেকটা কাঁচ ঘষে, নানা রকম কাঁচ নিয়ে পরীক্ষা করে কাটিয়েছিলেন। কোথায় যেন শুনেছিলেন, ঠিকমত ঘষে নিতে পারলে সেই কাঁচের মধ্যে দেখলে ছোট জিনিসকে বড় দেখাবে। তার জন্যে কাঁচ কিনলেন লিউয়েনহুক নিজেই। ঘষে-মেজে পছন্দমত কাঁচের লেন্স তৈরী করলেন তিনি। অনেক লেন্স তিনি এইভাবে তৈরী করেছিলেন।

মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন বদমেজাজী ও সন্দেহপ্রবণ। বহু কাঁচের লেন্স তিনি করেছিলেন, কিন্তু কাঁচে কাউকে চোখ রাখতে দিতেন না। কিন্তু কেন জানা নেই, তিনি রেগনিয়ের দ্য গ্রাফ-কে তাঁর আবিষ্কৃত 'জাদু' যন্ত্রে চোখ রাখতে দিয়েছিলেন। যে যন্ত্রের তুলনা সেদিন সারা পৃথিবীতে আর ছিল না। গ্রাফ নিজে নারীদেহের ডিম্বাশয়ের ওপর মৌলিক গবেষণা করে খ্যাতিলাভ করেছিলেন এবং 'রয়েল সোসাইটি'র একজন সহযোগী সদস্যপদ লাভ করেছিলেন। তিনি সোসাইটিকে লিখলেন, আপনারা ভ্যান লিউয়েনহুককে লিখুন তাঁর আবিষ্কার সম্বন্ধে ব্রিটেনের রয়েল সোসাইটিকে সব কিছু জানাতে।"

লিউয়েনহুকের লেখাপড়া ছিল যৎসামান্য, ডাচ ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা তিনি মোটেই জানতেন না। তখন ইউরোপের শিক্ষিত লোকেরা লাতিন ভাষায় সাহিত্য-বিজ্ঞান চর্চা করতেন। আমাদের দেশে এক সময় যেমন ছিল সংস্কৃত। কিন্তু সেজন্য তাঁর কোন হীনমন্যতা ছিল না। তিনি চলিত ডাচ ভাষায় লম্বা চিঠিতে উত্তর দিলেন। চিঠির বিষয়বস্তু ছিল 'মিঃ লিউয়েনহুকের আবিষ্কৃত মাইক্রোস্কোপে দেখা কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে : যেমন চামড়ায় ছত্রাক, মাংসের পেশীর কোষতন্তুজাল, মৌমাছির হুলের গঠন ইত্যাদি ইত্যাদি।" চিঠির বিষয় পড়ে সোসাইটির পণ্ডিত সদস্যেরা তো হেসেই খুন। কিন্তু কিছু সদস্য চিঠির বক্তব্য বিষয় হালকাভাবে নিলেন না। সোসাইটির সম্পাদক মহাশয় চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করে, ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁকে লিখলেন, "আমরা আশা রাখি আপনি আরো



এনতনি ভ্যান লিউয়েন হুক

গবেষণা করবেন এবং তার ফল আমাদের জানাবেন। লিউয়েনহুক সেই অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন এবং পরের ৫৩ বছরে ৩৫৮টি পত্র লিখেছিলেন রয়েল সোসাইটির কাছে। আজকের দিনের কেউ যখন তাঁর পত্রগুচ্ছ পড়বে সে হয়ত মনে করবে লিউয়েনহুক কি বা এমন আবিষ্কার করেছিলেন যা নিয়ে মাতামাতি হয়েছিল সেদিন। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে সে সময় বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি একটি 'ম্যাগনিফাইং গ্লাসের' মধ্যে যেটুকু দেখা যায়, তার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, মাইক্রোস্কোপ তখনও আসে নি এবং আমাদের চোখের বাইরে বিরাট অদৃশ্য জগৎ আছে, তা ছিল আমাদের কাছে অজানা।

ডেলফের লোকেরা সেদিন লিউয়েনহুকের আবিষ্কারের গুরুত্ব বুঝতে পারে নি। সেদিনের ওই বিজ্ঞানীকে তারা ছিটগ্রস্ত, ক্ষ্যাপাটে মানুষ

বলে ধরে নিয়েছিল। তিনিও চোখের সামনে যখন যা পেতেন, সেটাকে মাইক্রোস্কোপের নীচে রেখে দেখতেন। এমন কি নিজের মাথার চুল বা গোঁফ ছিঁড়ে মাইক্রোস্কোপে দেখতেন। এমন লোককে ছিটগ্রস্ত মনে করা কিছু অন্যায় নয়। একদিন খুব বৃষ্টি হচ্ছে; তিনি কাঁচের টিউব আগুনে দিয়ে লাল করে ধীরে ধীরে টেনে লম্বা করলেন, তারপর ছুটে বাড়ির পাশের বাগানে গেলেন। একটি পাত্রে বৃষ্টির জল জমা ছিল; সেই জল সরু কাঁচের টিউবে করে নিয়ে এসে পরীক্ষা করতে বসলেন মাইক্রোস্কোপে। মেয়ে মারিয়া উৎকণ্ঠার সঙ্গে দেখছে তার বাবার কার্যকলাপ। বাবা কেন বৃষ্টির মধ্যে বাগানে গেল? মেয়ে বাবাকে খুব ভক্তি করতো। অন্যেরা তার বাবাকে যা খুশী বলুক, মারিয়া ভাবত তার বাবা সাধারণ লোকের উপরে। মাইক্রোস্কোপে চোখ রেখে আপন মনে অস্পষ্ট আওয়াজ করেন লিউয়েনহুক। তারপরে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ডাকেন, "মারিয়া, তাড়াতাড়ি এসো; দেখ বৃষ্টির জলে কত 'ক্ষুদে জন্তু'। এরা সাঁতার কাটছে, খেলছে। দেখ, দেখ আমি কি আবিষ্কার করেছি।"

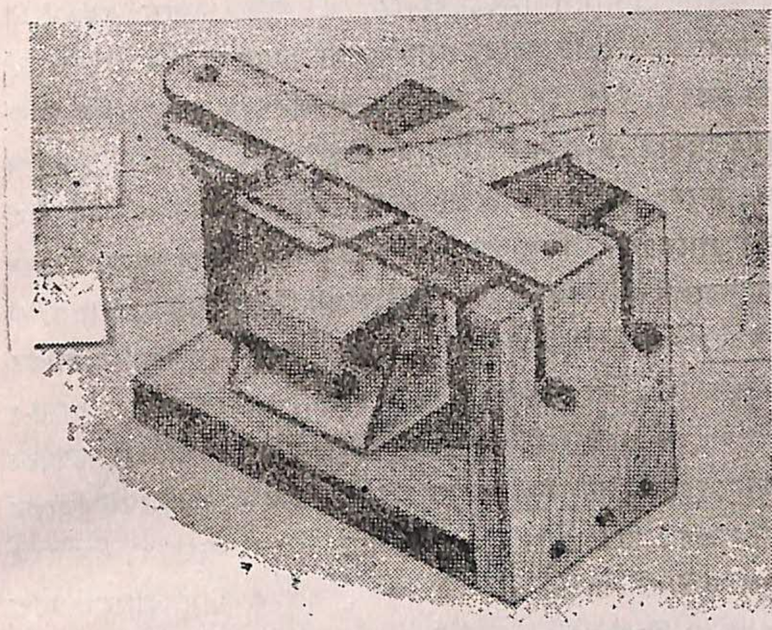
কিন্তু এরা এল কোথা থেকে? আকাশ থেকে, নাকি মাটি থেকে জল ছিটকে পাত্রে উঠছে? না ঈশ্বর তাদের সৃষ্টি করেছেন। সেদিনের বেশীর ভাগ মানুষের মত তিনিও ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মনে করতেন জীবন থেকেই জীবনের সৃষ্টি এবং ঈশ্বর হচ্ছেন প্রথম জীবন সৃষ্টি-কর্তা। কিন্তু এত চিন্তা ভাবনার কি দরকার, পরীক্ষা করাই মনস্থ করলেন লিউয়েনহুক।

ছোট একটি মদের গ্লাস পরিষ্কার করে তাতে বৃষ্টির জল ভরলেন। সেই জল ফেলে দিয়ে আবার জল ভরে, সরু কাঁচের টিউবে সেই জল ভরে মাইক্রোস্কোপে দেখলেন। এবার কিন্তু "ক্ষুদে জন্তু" সংখ্যা খুবই কম! আরও পরীক্ষা দরকার, চট করে কোন সিদ্ধান্তে আসা ঠিক হবে না। এবার তিনি করলেন কি একটা বড় পোর্সেলিনের বাটি খুব ভালভাবে পরিষ্কার করে, বৃষ্টির জলে ধুয়ে বেশ উঁচুতে একটা বাক্সের মধ্যে রাখলেন। ওপরের দিকটা খোলা, যাতে বৃষ্টির জল বাটির মধ্যে পড়ে। আর পাশের দিকে কাঠ, যাতে মাটি থেকে জল ছিটকে পাত্রের ভিতরে পড়তে না

পারে। আবার একই ভাবে বৃষ্টির জল নিয়ে মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষা করলেন লিউয়েনহুক। এবারে একটিও জন্তু তাঁর চোখে পড়ল না। তিনি মন্তব্য করলেন এই ক্ষুদে ক্ষুদে জন্তুরা বৃষ্টির জলে থাকে না, এরা আসে মাটি থেকে। বৃষ্টির জল যখন মাটিতে পড়ে ছিটকে কোন পাত্রের ভেতরে পড়ে, মাটি থেকে 'জন্তুরা' এই জলের সঙ্গে উঠে পড়ে সেই পাত্রে। জল নিয়ে রোজই দেখতে থাকেন লিউয়েনহুক বুঝলেন খোলা জায়গায় জল থাকলে ধুলো বা বাতাস থেকে 'জন্তুরা' জলের ভেতরে পড়ে এবং সেখানেই তারা বাড়তে থাকে।

এই পরীক্ষরে পরে লিউয়েনহুক নানা জায়গার জল নিয়ে পরীক্ষা করতে বসলেন; নদী, খাল, নিজের বাড়ির উঁচু ছাদের ওপরের জল, এমন কি নিজের বাগানের কূয়োর জল নিয়ে পরীক্ষা করলেন। সব জলেই কিন্তু 'ক্ষুদে জন্তু,' কোথাও কম, কোথাও বেশী। এই দেখায় তাঁর ক্লান্তি নেই, চোখ ব্যথা করছে, মাথা ধরেছে, হাত ঝিনঝিন করছে। তাতে কি? ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি দেখছেন, তারা কিভাবে জলে সাঁতার দিচ্ছে, খেলা করছে, সংখ্যায় বাড়ছে, এক থেকে তুই, তুই থেকে চার। সময় জ্ঞান থাকে না। মারিয়া যখন ডাকে, তখন তাঁর চমক ভাঙ্গে।

কিন্তু লিউয়েনহুক তো শিক্ষা পাওয়া বিজ্ঞানী নন; কি যে দেখতে চান তাই তো জানেন না। অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন; জানা অজানা চোখের সামনে যা পড়ে তাকেই মাইক্রোস্কোপের কাঁচের নীচে রেখে দেখতে থাকেন। হঠাৎ খেয়াল হল, "আচ্ছা, মরিচ কেন ঝাল লাগে, নিশ্চয় মরিচে ছোট কাঁটা আছে।" 'ছোট জন্তুদের' মন থেকে সরিয়ে রেখে মরিচ গুঁড়ো করতে আরম্ভ করলেন; চোখে জল আসছে, হাঁচি হচ্ছে, তা হোক। কিন্তু যত চেষ্টাই করুন, ঠিকমত গুঁড়ো হোল না মরিচদানা, মাইক্রোস্কোপে ঠিক দেখাও যায় না। আচ্ছা, জলে ভেজালে নিশ্চয় নরম হবে, তখন দেখা সহজ হবে ক'সপ্তাহ জলে মরিচ দানা ভিজিয়ে রাখলেন; নরম হোল, তারপরে ছুঁচে করে সামান্য অংশ জল মিশিয়ে দেখতে গিয়ে একেবারে অবাক্। সেই মরিচ ভেজান জল ক্ষুদে জন্তুতে ভাত। ভুলে গেলেন মরিচের ঝালের কথা, কাঁটার কথা; সব ভুলে



লিউয়েনহুকের তৈরী একটি মাইক্রোস্কোপ

আবার বসলেন তাঁর 'জন্তুদের' নিয়ে। লক্ষ্য করতে থাকেন তাদের প্রকৃতি ; নানা ধরনের, কত জাতের, অনেক বেশী সংখ্যায় তারা মরিচ জলে খেলা করছে।

এইভাবে নিজের খেয়াল খুশীমত কাজ করেন লিউয়েনহুক। মনে পড়ে গেল এই 'ক্ষুদে জন্তুদের' কথা তিনি রয়েল সোসাইটিকে এখনও লেখেন নি। মাইক্রোস্কোপ ছেড়ে কলম ধরলেন ; লিখে ফেললেন লম্বা এক চিঠি। হাতের লেখা ছিল সুন্দর, ছবিও আঁকতেন সুন্দর। মনের মত করে সাজিয়ে রয়েল সোসাইটির সভ্যদের জানালেন, কিভাবে তাদের প্রথম দেখলেন, কেন তারা বৃষ্টির জলের সঙ্গে আসে না, মরিচের জলে বেশী সংখ্যায় দেখতে পেয়েছেন সেই ক্ষুদে জন্তুদের। বড় কথায় নয়, কোন দাবি নয়, ঠিক কি দেখেছেন তারই এক বিবরণ মাত্র।

সোসাইটিতে চিঠি আসার পরে তার ইংরাজী তর্জমা হোল, শোনান হল সভ্যদের। বেশীর ভাগ সভ্য এই চিঠির বক্তব্যকে অবিশ্বাস করলেন,

বিদ্রূপ করলেন ঐ পাগল লিউয়েনহুককে, যে বলতে চেয়েছে এক ফোঁটা জলের মধ্যে একটা ছোট শহরের লোকসংখ্যার সমান সংখ্যায় ক্ষুদে 'জন্তুর' অবস্থান সম্ভব। যাঁরা সেদিন তাঁর কথাকে অবিশ্বাস করেছিলেন তাঁরা সে যুগের বিশ্বাস ও ধারণার হিসাবে কিছু অন্যায় করেন নি ; কারণ তাঁদের চোখের দৃষ্টি তখনও একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাসের পরিধির সীমা ছাড়াতে পারে নি। কিন্তু সোসাইটির কিছু সদস্য তাঁর পত্রের বিবরণ উপেক্ষা করলেন না। কারণ এই লিউয়েনহুক ভদ্রলোকটি লেখাপড়া না জানতে পারেন ; কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁর কোন বিবরণ তো মিথ্যা প্রমাণিত হয় নি, সুতরাং এ চিঠির বক্তব্য অবিশ্বাস করার কি কারণ থাকতে পারে ? তাঁরা শেষ পর্যন্ত একটা চিঠি পাঠালেন লিউয়েনহুককে ; আর বিশদভাবে সব জানতে চাইলেন তাঁর কাছে। লিউয়েনহুক এমনিতেই ছিলেন রগচটা মানুষ ; চিঠি পেয়ে তো একেবারে রেগে আগুন। ডেলফের লোকেরা যা ইচ্ছে ভাবুক, যা খুশী বলুক ; তাদের উনি গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন না। কিন্তু রয়েল সোসাইটির লোকদের তিনি পণ্ডিত, দার্শনিক বলে মনে করতেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা তাঁকে অবিশ্বাস করলো। ঠিক করলেন, ওদের পত্রের আর উত্তর দেবেন না। তারপরে কিছুদিন বাদে রাগ পড়ল, চিঠি লিখলেন আবার সোসাইটির কাছে ; বেশ লম্বা চিঠি বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করলেন তাঁর কাজের পদ্ধতি। পত্রের শেষে লিখলেন, তাঁর শহরে মাননীয় নাগরিক, গীর্জার পুরোহিত, আইনজ্ঞ, শিক্ষক তাঁরাও দেখেছেন এই "ক্ষুদে জন্তুদের" এবং তাঁরা শপথপত্র করে দিতে রাজী আছেন।

এবার রয়েল সোসাইটি তাঁদের দুজন সদস্য রবার্ট হুক আর নেমিয়া গ্রুকে অনুরোধ করলেন, "আপনারা লিউয়েনহুকের পদ্ধতিতে মাইক্রোস্কোপ করুন, আর দেখুন মরিচ ভেজান জলে সত্যি কোন 'ক্ষুদে জন্তু' জন্মায় কিনা ?" ১৫ই নভেম্বর ১৬৭৭ খ্রীঃ তাঁরা সোসাইটির সামনে পেশ করলেন তাঁদের পর্যবেক্ষণের ফল। লিউয়েনহুক মিথ্যে বলেন নি ; তাঁর দাবি নির্ভেজাল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সদস্যরা চেয়ার ছেড়ে উঠে ভিড় করলেন মাইক্রোস্কোপের সামনে তাঁদের সংশয় নিরসনের জন্য।

তিন বছর পরে রয়েল সোসাইটি এই অশিক্ষিত, শুকনো ফল-ব্যবসায়ী, নগরসভা ভবনের রক্ষী, এনতনি ভ্যান লিউয়েনহুককে সোসাইটির সদস্যপদ দিয়ে সম্মানিত করলেন। রৌপ্যাধারে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তাঁর গুণাবলীর স্বীকৃতি দিয়ে প্রশংসাপত্র পাঠালেন তাঁর কাছে। অভিনন্দনে অভিভূত লিউয়েনহুক কৃতজ্ঞতার সঙ্গে লিখে পাঠালেন, "...আমি বাকী জীবন বিশ্বস্ততার সঙ্গে আপনাদের সহিত সহযোগিতা করবো"। এবং সত্যই তিনি সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন। সোসাইটি একটি মাইক্রোস্কোপ পাঠাবার অনুরোধ করেছিল, তিনি সরাসরি সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন। এই অনুরোধ রক্ষা করার কথা ভাবা যায় না। শিশু যেমন তার প্রিয় খেলনা কিছুতেই হাতছাড়া করতে রাজী হয় না; লিউয়েনহুক তাঁর প্রিয় মাইক্রোস্কোপ জীবন থাকতে কারো হাতে দিতে পারেন নি। এসো, দেখো, ভালভাবে দেখার জন্য যেটুকু নাড়া দরকার, করতে পারো; এটা নিয়ে তিনি কাউকে বাড়ির চৌকাঠ পার হতে দেবেন না। অগত্যা রয়েল সোসাইটি ডাঃ মলিনেঁকে পাঠালেন লিউয়েনহুকের কাছে; তিনি তাঁর যন্ত্রগুলি দেখে খুব প্রশংসা করলেন। বললেন, "আপনার যন্ত্রগুলি অপূর্ব সুন্দর, আমরা ইংলণ্ডে যা দেখেছি তার চেয়ে অনেক পরিষ্কার ও স্বচ্ছ।"

লিউয়েনহুক হেসে বললেন, "এর চেয়েও ভাল যন্ত্র আমার আছে, কিন্তু সে কেবল আমার জন্য; আমার বাড়ির লোকদেরও তা আমি দেখতে দিই নি।"

অগত্যা চোখের দেখা দেখে খালিহাতে ফিরে গেলেন ডাঃ মলিনেঁ।

লিউয়েনহুকের অভ্যাস ছিল নুন খুব মিহি ভাবে গুঁড়ো করে, তা দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করা। একদিন লক্ষ্য করলেন, দাঁতের ফাঁকে সাদা মত কি যেন জমে রয়েছে। কাঠি দিয়ে দাঁতের ফাঁক থেকে সেটা তুলে নিয়ে বৃষ্টির জলে গুলে এক ফোঁটা জল মাইক্রোস্কোপের নীচে রেখে দেখলেন অসংখ্য পোকা। নানা ধরনের, কারও বা শুঁড় আছে, আবার কারো ছিপি খোলার স্ক্রু-র মত প্যাঁচাল চেহারা। এটা এক নূতন আবিষ্কার। তাঁর দাঁত খুব শক্ত ও ভাল, তা সত্ত্বেও এতো পোকা! তাহলে

যাদের দাঁত খারাপ তাদের না জানি কত রকম পোকা আছে দাঁতের মাড়ির ফাঁকে।

একদিন বহুক্ষণ কাজের পরে ক্লান্ত অবস্থায় পায়চারি করছেন নিজের বাড়ির কাছে, তখন একটি লোকের সঙ্গে আলাপ হোল। কথা বলতে বলতে দেখতে পেলেন সেই ভদ্রলোকের দাঁত ও মাড়ি খুব খারাপ। সেই ভদ্রলোককে বাড়িতে ডেকে এনে তাঁর দাঁতের গোড়া থেকে একটু ময়লা তুলে জলে গুলে নিয়ে দেখলেন কত বিচিত্র রকমের ক্ষুদে ক্ষুদে পোকা কিলবিল করছে।

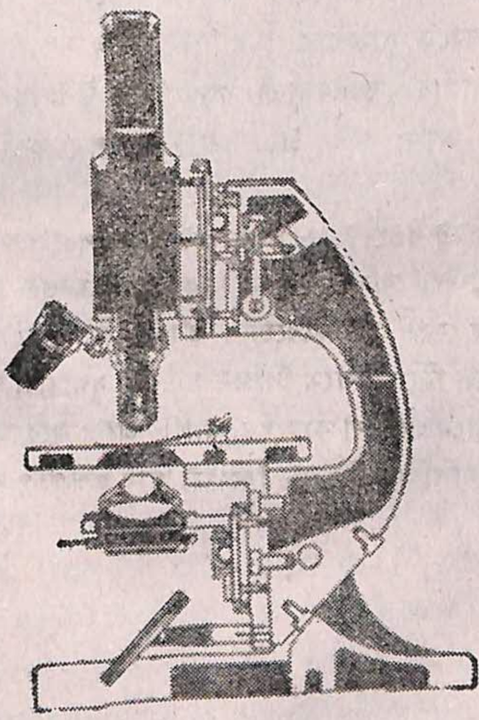
এর পরে তিনি ছোট্ট মাছের ওপর গবেষণা করবার সময় মাছের লেজের কাছে সূক্ষ্ম রক্তজালিকা 'ব্লাড ক্যাপিলারি' দেখতে পেলেন। এর ফলে ধমনী থেকে শিরার মধ্যে কিভাবে রক্ত যায়, সেই অজ্ঞাত রহস্যের সমাধান হোল। এর আগে তিনি নিজের হাতে ছুঁচ ফুটিয়ে, নিজের হাতের রক্ত পরীক্ষা করে, রক্তের লোহিত কণিকা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে দেখতে পেয়েছিলেন। এইভাবে তিনি একের পর এক জিনিস নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে যেতে থাকেন। একবার তাঁর পেট খারাপ হয়; তিনি তখন নিজের মলমূত্র নিয়ে পরীক্ষা করেন এবং তার মধ্যে বহু রকমের পোকা দেখতে পেয়েছিলেন। ব্যাং ও ঘোড়ার অন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা করে তিনি তার মধ্যেও বহু জাতের পোকা দেখতে পেয়েছিলেন।

লিউয়েনহুকের নাম ক্রমশঃ সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ল। রুশ সম্রাট পিটার দি গ্রেট তাঁকে সম্মান জানাবার জন্য ছোট শহর ডেলফ্‌-এ এলেন। ইংলণ্ডের রানী তাঁর মাইক্রোস্কোপ দেখার জন্য তাঁর কাছে এসেছিলেন। ফরাসী বিজ্ঞান একাডেমির সঙ্গে তাঁর চিঠি আদানপ্রদান হোত; পরে একাডেমি তাঁকে মাননীয় সদস্যপদ দিয়ে সম্মানিত করেছিল।

নিজে শিক্ষিত ছিলেন না, কিন্তু যেটুকু জানতেন তা কখনও কাউকে শেখাবার চেষ্টা করেন নি। কারণ তিনি বলতেন, "আমি কারও গোলামী করতে চাই না; মুক্ত স্বাধীন মানুষ হিসেবে কাজ করতে চাই।" একদিন তাঁর বন্ধু খ্যাতনামা দার্শনিক লিবনিজ বললেন, "কিন্তু তুমি তরুণদের না

শেখালে, তোমার এই কাঁচ ঘষা শিল্প, ক্ষুদে ক্ষুদে পোকা অনুসন্ধানের বিজ্ঞান যে লোপ পেয়ে যাবে।"

"কেন, তোমাদের লিডেন বিশ্ববিদ্যালয় আমার আবিষ্কার দেখে ছাত্রদের কাঁচ ঘষা শেখাবার জন্য তিনজন ঘষাইওয়ালা এনেছিল, তার কি হোল?" বললেন লিউয়েনহুক। "যদি আমার মত জানতে চাও তাহলে এই কথাই বলবো, তোমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যা শিক্ষা দাও, তার আসল উদ্দেশ্য হোল টাকা রোজগার করা, নিজের জ্ঞানের গভীরতা দেখিয়ে বিশ্বের কাছ থেকে শ্রদ্ধা আদায় করা। আমাদের দৃষ্টির অগোচরে কি আছে, তা নিয়ে হাজারে একজনও মাথা ঘামায় কিনা আমার সন্দেহ আছে। এইসব কাজ করতে যে সময়, পরিশ্রম আর অর্থ ব্যয় করতে হয়, কত জন লোক সেই ত্যাগ স্বীকার করতে পারবে, তা আমার জানা নেই।"



আধুনিক মাইক্রোস্কোপ

১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দ। লিউয়েনহুকের বয়স তখন ৯১ বছর, গুরুতর অসুখে শয্যাশায়ী। বোধহয় বুঝেছিলেন তাঁর শেষ সময় এসেছে। বন্ধু হুগলি-য়েটকে ডেকে পাঠালেন তিনি। তাঁর উজ্জ্বল চোখ যা আমাদের প্রথম পরিচয় করিয়েছিল দৃষ্টির অগোচরে জীবাণুজগতের সঙ্গে, সেই চোখ আজ ঝাপসা হয়ে গেছে। যে হাত তাঁর প্রিয় মাইক্রোস্কোপের স্ক্রু ঘুরিয়েছে অক্লান্ত ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, সেই হাত আজ অবশ, বিছানা থেকে তুলতেও পারছেন না। যিনি রেগে গেলে ভীষণ চিৎকার করে উঠতেন, সেই কণ্ঠস্বর আজ অতি ক্ষীণ। বন্ধুকে কাছে ডেকে ক্ষীণ স্বরে বললেন, "আমার টেবিলে দুটি পত্র আছে ; লাতিন ভাষায় অনুবাদ করে লণ্ডনে রয়েল সোসাইটিতে পাঠিয়ে দিয়ো।" এই ভাবে তিনি রয়েল সোসাইটিকে ৫০ বছর আগে দেওয়া তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করেছিলেন।

হুগলিয়েট বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন। চিঠি দু'খানা রয়েল সোসাইটির কাছে পাঠাবার সময় তিনি নিজে সম্পাদককে লিখেছিলেন, "মহাশয়, আমার মৃত্যুপথযাত্রী বন্ধুর শেষ উপহার আপনাদের কাছে পাঠালাম। আশা করি তাঁর এই শেষ পত্র দুটি আপনাদের ভাল লাগবে।"

অবশেষে ঐ বছরেই ২৬শে আগস্ট তিনি পরলোকগমন করেন। যখন বিশ্বের বিজ্ঞানীরা ঘুমিয়েছিলেন, একা লিউয়েনহুক তাঁদের দৃষ্টিকে দূরে, গভীরে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন। তাঁরই আবিষ্কার করা মাইক্রোস্কোপ পরবর্তী কালে নিয়ে আসে বিজ্ঞান সাধনায় যুগান্তর, তাঁর পরে অনেকেই জীবাণু বিজ্ঞানে গবেষণা করেছেন, খ্যাতি অর্জন করেছেন, কিন্তু লিউয়েন-হুকের মত অশিক্ষিত নির্লোভ বিজ্ঞানী আর জন্মগ্রহণ করেন নি।

এডওয়ার্ড জেনার



ডাঃ এডওয়ার্ড জেনার

ইংল্যাণ্ডে গ্লস্টারশায়ারের এক ছোট্ট গ্রামে বাস করতেন একজন চিকিৎসক। তিনিই প্রথম বসন্তরোগের কবল থেকে মানুষকে বাঁচাবার জন্য বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে টীকার প্রচলন করেন। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বসন্ত-রোগ খ্রীষ্টান ধর্মযোদ্ধাদের সঙ্গে প্রথম ইউরোপে প্রবেশ করে এবং ভয়াবহভাবে বিস্তার লাভ করে। ১৭০০-১৮০০ খৃষ্টাব্দে কেবলমাত্র ইউরোপে ৬ কোটি লোক এই রোগে মারা যান। এশিয়া মহাদেশে কিন্তু বসন্তরোগ আগেও ছিল। চীনদেশের চিকিৎসকরা বসন্তরোগের শুকনো মামড়ি গুঁড়ো করে নস্যির মত শুঁকতে দিতেন এই রোগ প্রতিরোধ করার জন্য। তুরস্কে বৃটিশ-রাজদূতের পত্নী তুরস্ক দেশে প্রচলিত এক পদ্ধতি ইংল্যাণ্ডে প্রবর্তন করেন। সেই পদ্ধতিতে বসন্তরোগীর গুটির মধ্যে একটা

স্তুতো প্রবেশ করিয়ে পুঁজ মাখিয়ে নেওয়া হতো। তারপর সুস্থ লোকের বাহুর কোন জায়গা ছুরি দিয়ে কেটে সেই কাটা জায়গার উপর ঐ পুঁজ মেশানো সুতো ছুঁইয়ে দেওয়া হতো। এই পদ্ধতি প্রয়োগের মূলে একটি বদ্ধমুল ধারণা প্রচলিত ছিল যে কোন লোকের একবার বসন্তরোগ হয়ে গেলে তার আর দ্বিতীয়বার ঐ রোগ হবে না। সুতরাং এইভাবে যদি কাউকে হালকাভাবে বসন্ত-রোগাক্রান্ত করা যায় তাহলে তার শরীরে ভবিষ্যতে আর ঐ রোগ হবে না। কিন্তু এই পদ্ধতিতে মারাত্মকভাবে বহু লোকের রোগাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা ছিল এবং বহুলোক মারাও যেতেন। অবশেষে ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে গ্লস্টারশায়ারের সেই অখ্যাতনামা চিকিৎসক এডওয়ার্ড জেনার মারাত্মক বসন্তরোগ প্রতিরোধ করার উপায় আবিষ্কার করে ইতিহাস সৃষ্টি করেন।

এডওয়ার্ড জেনারের জন্ম ১৭ই মে, ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দ। তাঁর বাবা ছিলেন ধর্মযাজক। স্থানীয় বিদ্যালয়ে প্রাথমিক পাঠ শেষ করে জেনার স্থানীয় চিকিৎসক ডানিয়েল লাডলোর কাছে শিক্ষানবিশ হিসাবে কাজ শুরু করেন। তখনকার দিনে চিকিৎসা-বিদ্যা শেখার জন্য আগে কোন চিকিৎসকের সঙ্গে থাকতে হোত, পরে হাসপাতালে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হোত। ২১ বছর বয়সে জেনার লণ্ডনে সেণ্ট জর্জেস হাসপাতালে কাজ শিখতে যান, সেখানে তিনি সেকালের খ্যাতনামা সার্জন জন হাণ্টারের ছাত্র হিসেবে কাজ করার সুযোগ পান। এই ডাঃ হাণ্টার একজন অতি উৎসাহী ও অনুসন্ধিৎসু চিকিৎসক ছিলেন। কোন জিনিস বা তথ্য পরীক্ষা না করে তিনি মেনে নিতে চাইতেন না। এইভাবে নিজের শরীরে তিনি এক মারাত্মক রোগ সংক্রমণ করেন, যার দ্বারা তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায় এবং তিনি স্বল্পায়ু হন। পড়ার শেষে ডাঃ হাণ্টার, জেনারকে নিজের দেশে ফিরে যেতে উপদেশ দেন। দেশে ফেরার পরেও জেনার চিঠির মারফত ডাঃ হাণ্টারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন।

দেশে ফিরে ডাঃ জেনার গ্রামের লোকের চিকিৎসায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু একটা চিন্তা তিনি মন থেকে দূর করতে পারতেন না। সেটা হলো গ্রামের লোকের কাছে শোনা কথা—"যার গো-বসন্ত হয়েছে তার



ডাঃ জেনারকে ব্যঙ্গ করে প্রকাশিত কার্টুন

নাকি বসন্ত হয় না।' এই ধারণাটা কি সত্যি! এই বিশ্বাসের মূলে কি কোন ভিত্তি আছে? তিনি চিঠি দিলেন তাঁর গুরু ডাঃ হাণ্টারের কাছে। গুরু উত্তর দিলেন "চেষ্টা করে দেখ, ধৈর্য্য ধরে দেখ, তারপরে সঠিক সিদ্ধান্ত করো।" জেনার মনস্থির করে ফেলেছেন—দেখতে চাই এ ধারণা সত্য কি না! সুযোগ এলো ১৪ই মে ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে। সারা নেমস্ নামে এক গ্রাম্য গোয়ালিনী হাতের ফোস্কা নিয়ে এলো। গায়ে ব্যথা, জ্বর জ্বর ভাব, জেনার পরীক্ষা করে বললেন, "সারা, ভীষণ বসন্ত হচ্ছে একটু সাবধানে থেকো।" সারা বললো, "তা কি করে হতে পারে ডাক্তার! আমার তো গো-বসন্ত হয়ে গেছে! হাতের পিছনে গাছের কাঁটায় ছড়ে গিয়েছিল পরে গরুর বাঁট থেকে বসন্তের পুঁজ ঐ ছড়ে যাওয়া জায়গায় লেগে এটা হয়েছে।" সারা'র কথায় জেনার যেন নতুন আলো দেখতে পেলেন। সেই সময় তাঁর চেম্বারের জন ফিপ্‌স্ নামে একটি ছেলে বসে আছে। আট বছরের ছেলে বাবা-মার সঙ্গে এসেছে। ডাঃ জেনার ঐ ছেলের বাবা-মার কাছে অনুমতি চাইলেন যে তাঁদের ছেলের শরীরে সারার

ক্ষত থেকে একটু পুঁজ নিয়ে লাগিয়ে দেখবেন, গো-বসন্ত সত্যি-কারের বসন্ত রোগকে আটকাতে পারে কি না? জনের বাবা-মা একটু পরামর্শ করে সম্মতি দিলেন। ডাঃ জেনার জনের বাঁ-হাতে ছুরি দিয়ে দুটো দাগ কেটে সেখানে সারার ক্ষত থেকে নেওয়া পুঁজ লাগিয়ে দিলেন। দিনটা সারা বিশ্বের পক্ষে স্মরণীয়। ১৪ই মে ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে এই পৃথিবীতে প্রথম রোগ-প্রতিষেধক টীকা দেওয়া হোল। একমাস পরে জেনার এক ভীষণ সাহসের কাজ করলেন। জনের শরীরে আসল গুটিবসন্তের বীজ ঢুকিয়ে দিলেন। আরও একমাস কেটে গেল, কিছু হোল না। আবার ঐ বীজ ঢুকিয়ে দিলেন, এবারেও বসন্ত হোল না। এইভাবে ২৭টি টীকা দেওয়া লোকের নথীপত্র তৈরি করে জেনার এক রিপোর্ট পাঠালেন লণ্ডনের



ডাঃ জেনার তাঁর পুত্র সন্তানকে টীকা দিচ্ছেন। তারই পাথরের মূর্তি

'রয়েল কলেজ অব ফিজিসিয়ান্‌স্‌'-এ। তাঁরা জেনারকে এইরূপ হঠকারী পরীক্ষা না করার নির্দেশ দিলেন। এও জানালেন—"আর কাউকে কিছু বলো না বাপু, তাহলে তোমার যেটুকু সুনাম হয়েছে তাও একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।" জেনার কিন্তু দমলেন না। রিপোর্ট প্রকাশ করলেন। ব্যস! ভীমরুলের চাকে ঘা পড়লো—শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলেই জেনারকে একহাত নেয় আর কি! অপমান, লাঞ্ছনা, ব্যঙ্গচিত্র দিয়ে আক্রমণ শুরু হলো তাঁর ওপর। কিন্তু জেনার কোন ব্যাপারেই কান না দিয়ে নিজের বিশ্বাস মতো কাজ করতে লাগলেন। অবশেষে দেশের লোক বুঝলো যে জেনারের আবিষ্কারের ফলে তারা বসন্তরোগ থেকে রক্ষা পাবে। জেনার তখন তাদের কাছে দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার জেনারকে ১০,০০০ পাউণ্ড সাহায্য দিলেন গবেষণার জন্য এবং আরও ২০,০০০ পাউণ্ড দিলেন ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে। এর-পর সরকার তাঁকে "স্যার" উপাধিতে ভূষিত করলেন। নেপোলিয়ন পাঠালেন উচ্চ প্রশংসাপূর্ণ চিঠি, রাশিয়ার জার পাঠালেন সোনার আংটী। আমেরিকা থেকে রেড ইণ্ডিয়ানরা নিয়ে এলো প্রচুর উপহার। সারা বিশ্ব স্বীকার করলো তাঁর এই আবিষ্কারকে। এই টীকা যেহেতু পাওয়া গেছে গরুর কাছ থেকে সেই হেতু এর নাম দেওয়া হলো "ভ্যাক্সিন"—ল্যাটিন ভাষায় গরুর নাম হলো "ভেক্কা", সেই থেকে "ভ্যাক্সিন্‌" নামকরা হলো।

জেনার দেহ রাখলেন ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে। দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু তিনি মানুষের মন থেকে মুছে গেলেন না। মরণকে জয় করে অমরত্ব লাভ করলেন তিনি। সভ্য জগতের মানুষ তাঁর জন্ম-টীকার দাগ দেখে সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করবে সেই পথিকৃৎ এডওয়ার্ড জেনারকে যিনি অমরত্ব লাভ করেছেন প্রতিটি নবজাতকের শরীরে দেওয়া টীকা প্রচলনের মধ্য দিয়ে। আর স্মরণ করুক সেই বালক জন্‌ ফিপ্‌স-এর বাবা ও মা'কে, যারা অসীম সাহসিকতায় নিজের প্রিয় সন্তানকে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য "গিনিপিগ্‌" হতে দিয়েছিলেন—সেই অজ্ঞাতনামা ফিপস দম্পতিকে জানাই আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা।

লুই পাস্তুর

ফ্রান্সের পূর্বাঞ্চলে এক গ্রামের কামারশালার দরজায় ন' বছরের এক বালক উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল। হঠাৎ সে দু'চোখ ভরা আতঙ্ক নিয়ে ছুটে পালালো। কি এমন ব্যাপার, যা দেখে সে ভয় পেয়ে পালিয়েছিল ?

আর্বো গ্রামের এক চাষী নিকলকে পাগলা নেকড়ে ভীষণভাবে জখম করেছিল। সময়টা ১৮৩১ খ্রীঃ অক্টোবর মাস। পাগলা জন্তুর কামড়ে যে জলাতঙ্ক হয়, তা লোকের জানা ছিল। কিন্তু কেন যে হয় সেটাই ছিল অজানা। ধর্মপ্রাণ লোকেরা একে ভগবানের ইচ্ছা বা অভিশাপ বলেই মেনে নিয়েছিলেন। এ রোগের ওষুধও কিছুই ছিল না। চিকিৎসা হোত গ্রামের কামারশালায়। লোহা আগুনে পুড়িয়ে কামড়ানো জায়গা পুড়িয়ে দেওয়া হত। ভাগ্যবান রোগীরা এই 'চিকিৎসা' সত্ত্বেও বাঁচতো, কিন্তু মারা যেত প্রায় সকলেই—পাগলা কুকুর বা নেকড়ের কামড়ে না হলেও পোড়া ঘায়ের জন্য। এই বীভৎস চিকিৎসা, পোড়া চামড়ার গন্ধ ও রোগীর পরিত্রাহি চিৎকারে ভয় পেয়ে যে বালকটি সেদিন পালিয়েছিল, তিনিই পরবর্তী কালের বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর।

লুইয়ের বাবা জিন জোসেফ পাস্তুর ছিলেন সম্রাট নেপোলিয়নের সৈন্যদলের একজন ক্যাপ্টেন। নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর লুইয়ের বাবা নিজ গ্রাম ডোলের বাস উঠিয়ে দিয়ে আর্বোতে বাস করতে থাকেন এবং চামড়া পাকা করার কারখানা শুরু করেন। নিজে স্কুলে লেখাপড়ার সুযোগ পান নি, সেইজন্য তাঁর ইচ্ছা ছিল লুই ভালভাবে লেখাপড়া শিখে একজন স্কুলশিক্ষক হোক। কিন্তু লুইয়ের জীবনের প্রথম পনের বছরের মধ্যে বিশেষ কোন উন্নতির লক্ষণ দেখা যায় নি। লুই ছবি আঁকতে ভালবাসতেন। মা বা ভগ্নীদের নদীর ধারে বা বাগানে বসিয়ে ছবি আঁকতেন। বসে থাকতে থাকতে তাঁদের ঘাড়ে ব্যথা হয়ে যেত। তাঁর সেদিনের আঁকা সেই ছবি আজও প্যারীর 'পাস্তুর ইনষ্টিটিউট'-এ রক্ষিত



লুই পাস্তুর

আছে। সেই ছবিগুলি দেখে অনেকে বলেছেন যে, তিনি বিজ্ঞানী না হয়ে চিত্রকর হলেও বিখ্যাত হতে পারতেন।

কিন্তু পরে তাঁর মনে বড় হবার বাসনা জাগে। তিনি নিজেকে এক-জন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে তৈরী করতে চেয়েছিলেন। কলেজে সর্বকনিষ্ঠ হয়েও তিনি মনিটর হতে চাইতেন। মাত্র বিশ বছর বয়সে তিনি একজন সহকারী শিক্ষকের মত অন্যদের পড়াতেন। এই সময়ে তাঁর ভগ্নীদের কাছে তিনি এক চিঠি লেখেন, তার মধ্যে একটি অংশে ছিল যা সকলের পক্ষে এবং সর্বকালেই প্রযোজ্য। তিনি লিখেছিলেন, 'ভগ্নী, ইচ্ছাটাই সব। তুমি যদি সত্যি কিছু পেতে চাও, তোমাকে পরিশ্রম করতে হবে। কঠোর পরিশ্রম, যা তোমায় এনে দেবে সাফল্য। প্রবল ইচ্ছা সফলতার দরজায় পৌঁছে দেয়, পরিশ্রম সেই দরজা পার করে তোমায় সাফল্যের অঙ্গনে পৌঁছে দেবে।'

তাঁর কর্মময় জীবনে পাস্তুর এই কথার সত্যতা প্রমাণ করেছিলেন।

ছাত্রাবস্থায় তিনি মেধা ও অধ্যবসায়ের জন্য তাঁর রসায়ন-শিক্ষক জেরোম ব্যালাডের নজরে পড়েছিলেন। তাঁর নিজের একটা ছোট ল্যাবরেটরি ছিল। তিনি সেখানে পাস্তুরকে তাঁর সহকারী হিসেবে কাজ করতে বলেন। পাস্তুর এখানে টারটারিক এসিডের ক্রস্ট্যাল সম্বন্ধে বহুদিনের প্রচলিত ধারণাকে ভুল প্রতিপন্ন করে নিজের মতকে বিজ্ঞানী সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেন। ব্যালাড এ বিষয়ে সে যুগের পদার্থবিদ্যার খ্যাতনামা শিক্ষক বায়টকে বলেন। বায়ট আবার সেই তথ্য জানালেন ফরাসী বিজ্ঞান সভার সদস্যদের কাছে। এর ফলে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে বায়ট ও বিজ্ঞান সভার সদস্যরা পাস্তুরকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করলেন। কিন্তু পাস্তুর তো এ কাজ চান নি। তাঁর পছন্দ হোল রসায়ন। এক বছর ধরে প্রতিবাদ, আবেদন নিবেদন করে অবশেষে স্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন অধ্যাপকের পদ পেলেন পাস্তুর, তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৬ বছর।

অধ্যাপক পদে যোগ দেওয়ার কয়েক সপ্তাহ পরে এই তরুণ সাহসী অধ্যাপক বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকটরকে এক চিঠি লেখেন তাঁর মেয়েকে বিবাহের প্রস্তাব করে। চিঠিখানি বেশ মজার—তার এক অংশে লেখা ছিল—'আমি আপনার কন্যাকে বিবাহ করতে চাই। যদিও আমার আর্থিক সঙ্গতি বলতে কিছুই নাই, তবু আছে আমার সুস্বাস্থ্য, সাহস ও বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরিটুকু। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলতে পারি যে, আমি নিজেকে রসায়নের গবেষণায় উৎসর্গ করবো…আপনার সম্মতি পেলে আমার বাবা আপনার কাছে এই বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আসবেন।'

২৯শে মে, ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁদের বিবাহ হয় এবং এই বিবাহ খুব সুখের হয়েছিল। মেরী পাস্তুর শুরু থেকেই তাঁর স্বামীকে চিনতে পেরেছিলেন। সংসারের সব ঝামেলা তিনি নিজে সামলেছেন, পাস্তুরকে কোনদিন বুঝতে দেন নি। ছেলেমেয়েদের দায়িত্ব নিজে নিয়েছেন এবং পরেও স্বামীর বক্তৃতা শুনতেন ও সন্ধ্যায় গবেষণা বিষয়ে ডিকটেশন নিতেন। তিনি শুধু অতুলনীয় সঙ্গী ছিলেন না, স্বামীর শ্রেষ্ঠ সহযোগীও ছিলেন মেরী পাস্তুর।

কিন্তু সংসারে শুধু সুখ থাকতে পারে না, দুঃখও আসে তার পরেই। পাস্তুর দম্পতির জীবনেও দুঃখের ঝড় বইতে শুরু হলো। ন' বছরের মেয়েটি প্রথম মারা গেল। তারপর দু' বছরের আর একটি মেয়ে। পরের বছর বারো বছর বয়সের আর এক মেয়ে। তার পাঁচ বছর বাদে কুড়ি বছরের ছেলে জার্মান যুদ্ধে গিয়ে নিরুদ্দেশ হলো। লুইয়ের গবেষণায় ছেদ পড়লো। তিনি যুদ্ধ ফেরত সৈনিকদের মধ্যে ছেলের খোঁজে গেলেন এবং সুখের বিষয় তাঁদের একমাত্র ছেলেকে আহত অবস্থায় তাঁরা ফিরে পেলেন।

এর কিছুদিন পরে পাস্তুরের ডাক এলো ফ্রান্সের মদ প্রস্তুতকারীদের কাছ থেকে। ফরাসী মদ হচ্ছে বিশ্বের সেরা মদ, সেই মদ কিনা টকে যাচ্ছে! ব্যবসায়ীদের মাথায় হাত। পাস্তুর দেখিয়েছিলেন যে আঙ্গুর থেকে ঈস্ট-এর প্রক্রিয়া দ্বারা মদ তৈরী হয়। ডাক পেয়ে তিনি তাঁর ল্যাবরেটরী থেকে কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে ছুটলেন সেখানের দ্রাক্ষাক্ষেত্রে। সেখানে বিভিন্ন জালা থেকে মদের নমুনা নিয়ে পরীক্ষা করলেন। অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখলেন, যে মদ নষ্ট হয়ে যায় নি, তার মধ্যে শুধু ইস্ট আছে। কিন্তু যে মদ টকে গেছে, তার মধ্যে ইস্ট ছাড়াও এক শ্রেণীর পোকা নড়ছে। তিনি প্রতিবিধান দিলেন যে, মদ তৈরি করার পর একটু গরম করে বোতলে রাখতে হবে যাতে পোকা না হতে পারে। এর ফলে ফ্রান্সের মদ্যশিল্প বাঁচল।

এবার ডাক এলো তাঁর এক সময়ের শিক্ষক ডুমা-র কাছ থেকে। তিনি অনুরোধ করেছেন—তাঁর দেশ দক্ষিণ ফ্রান্সে রেশমের গুটিপোকা মরে যাচ্ছে, তুমি একবার নিজে এসে দেখ যাতে রেশমশিল্প বাঁচে।' পাস্তুর সাড়া দিলেন সেই ডাকে। তিনি লক্ষ্য করে দেখলেন, রেশমপোকার মধ্যে যারা অসময়ে মরছে তারা রুগ্ন এবং তাদের সংস্পর্শে এসে ভাল পোকাদের রোগ হচ্ছে। রুগ্ন পোকাকে আলাদা করে পুড়িয়ে দেবার উপদেশ দিলেন তিনি। ফল হাতে হাতে মিললো। রেশম শিল্পের সুরাহা হোল।

এর পরের ঘটনা যুগান্তকারী আবিষ্কারের সম্ভাবনা নিয়ে এলো তাঁর

সামনে। তখন তিনি মুরগীদের কলেরা রোগ নিয়ে গবেষণা করছিলেন। একটা কালচার টিউবে কলেরা রোগের জীবাণু ফেলে রেখে তিন কিছু-দিনের জন্যে বাইরে গিয়েছিলেন। তখন গ্রীষ্মকাল। ফিরে এসে সেই টিউব থেকে বীজাণু নিয়ে মুরগীদের ইন্‌জেকশন দিলেন। দেখা গেল মুরগীদের কোন অসুখ হোল না। বেশ সুস্থই রইল তারা। তিনি মনে করলেন, গরমে বোধ হয় টিউবের জীবাণুগুলো মরে গিয়েছিল, তাই নতুন কলেরা জীবাণু নিয়ে আবার সেই মুরগীদের ইন্‌জেকশন দিলেন। এবারেও তাদের কোন অসুখ হোল না। তখন তিনি কয়েকটি নতুন মুরগী ছানাকে নতুন জীবাণুর ইন্‌জেকশন দিলেন। তারা সব কটাই মরে গেল। এটা কেমন হোল? খুব চিন্তায় পড়লেন পাস্তুর। তা'হলে পুরানো কালচার টিউবে জীবাণুগুলো মরে যায় নি, কেবল দুর্বল হয়েছে। এরা রোগ সৃষ্টি করতে পারে না, তবে রোগ প্রতিরোধ করতে পারে। ভাবতে লাগলেন—এটা কি সম্ভব? হতেও পারে। তাঁর মনে এলো যে গ্রামে যেখানে পশুদের অ্যানথ্র্যাক্স্ রোগে মৃত্যু হবার পর কবর দেওয়া হয়, সেই জমিতে যে সব গরু, ভেড়া ইত্যাদি চরে তাদের মধ্যে রোগ হয় না। তিনি এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, ঐ জমির ঘাস খাবার সময়ে নিশ্চয় দুর্বল শ্রেণীর জীবাণুর সংস্পর্শে এসেছে, যার ফলে সেই প্রাণীদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ভাবলেই তো হবে না—তার প্রমাণ চাই। সব কাজ ছেড়ে তিনি ল্যাবরেটরীতে জীবাণু কালচার-এর পদ্ধতি আবিষ্কার করে সেই জীবাণুকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় দুর্বল করলেন। তারপর মনে দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে কয়েকটি পশুকে সেই দুর্বল জীবাণু ইন্‌জেকশন দিলেন। কিছুদিন পরে তাদের শরীরে শক্তিশালী জীবাণু ইন্‌জেকশন দিলেন। মন খুব অশান্ত—কি হবে? সব সময়ে নজর রাখছেন—না, ভেড়ার জ্বর হয় নি, আরামে ঘাস খাচ্ছে। তাহলে কি তিনি সফল হয়েছেন? নাঃ, আবার পরীক্ষা করা যাক। আর এক-দল পশুকে একইভাবে ইন্‌জেকশন দিলেন। এবারেও তাদের কোন অসুখ হোল না। তিনি মনে সাহস নিয়ে এবার এই ঘটনা সাধারণের মধ্যে প্রকাশ করলেন।

কিন্তু সব দেশেই সব সময়ে পরশ্রীকাতর ও ঈর্ষাপ্রবণ লোক থাকে। ফরাসী দেশও তার ব্যতিক্রম নয়। রোসিগনল-এর নেতৃত্বে একদল লোক পাস্তুরের দাবি মেনে নিতে রাজি হলেন না। তাঁকে অপমান ও বিদ্রুপ করতেও ছাড়েন নি। ওঁরা দাবি করলেন সকলের সামনে প্রমাণ দিতে হবে। এতে পাস্তুর রাজি হলেন। পরীক্ষার স্থান ঠিক হোল মেলুরের কাছে পুলি-লে ফোর্ট-এ রোসিগ্‌নলের নিজের গো-চারণের মাঠে। পাস্তুর ২৯টি প্রাণীকে (২৪টি ভেড়া, ১টি ছাগল ও ৪টি গরু) তাঁর তৈরি অ্যানথ্রাক্স প্রতিরোধ করার টিকা দিলেন। কিছুদিন পরে তিনি সকলের সামনে সেই সব প্রাণীকেও অ্যানথ্রাক্স জীবাণু ইনজেকশন দিলেন। এই সঙ্গে আরও ২৯টি প্রাণীকেও (২৪টি ভেড়া, ১টি ছাগল ও ৪টি গরু) ঐ একই অ্যানথ্রাক্স জীবাণু ইনজেকশন দিলেন। দুদিন পরে পাস্তুর মনে শঙ্কা ও সংশয় নিয়ে পরীক্ষার ফলাফল দেখবার জন্য মাঠের দিকে চললেন। আশ্চর্য ব্যাপার, যে লোকেরা তাঁকে অপমান করেছিল, বিদ্রুপ করেছিল, তারা সব চুপ। সসম্মানে তাঁর জন্য পথ করে দিচ্ছে। তাঁর পরীক্ষা আশাতীত-ভাবে সফল হয়েছে—তাঁর তৈরী টীকার উপকারিতা আজ প্রতিষ্ঠিত। টীকা দেওয়া সব কটি প্রাণীই বেঁচে আছে, খুশী মনে ঘাস চিবুচ্ছে। আর যাদের টীকা দেওয়া হয় নি, তাদের মধ্যে একুশটি ভেড়া আগেই মরে গেছে। আর দুটি সকলের সামনেই মরল এবং বাকিটি তখন ধুঁকছিল, সন্ধ্যায় মারা গেল। গরু চারটিও অসুস্থ। এরপর কি আর সংশয়ের অবকাশ থাকে?

এর চার বছর পরে, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে পাস্তুর আবিষ্কার করলেন জলাতঙ্ক রোগ প্রতিরোধের টীকা। ছেলেবেলার কামারশালের সেই ঘটনা হয়তো তাঁকে এই আবিষ্কারের প্রেরণা দিয়েছিল।

পাস্তুর ধারণা করেছিলেন যে, জলাতঙ্ক জীবাণু মস্তিষ্ক ও মূল স্নায়ু আক্রমণ করে।

তাঁর সহকারী রু অনুবীক্ষণ যন্ত্রে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও জীবাণু দেখতে পান নি। কিন্তু পাস্তুরের বোধ হয় ঋষিদের মত দূরদৃষ্টি ছিল। তিনি বলেছিলেন, "দেখ রু, তুমি আমি আজ যা দেখতে পাচ্ছি না, ভবিষ্যতে হয় তো আরও শক্তিশালী যন্ত্রের সাহায্যে সেই জীবাণু দেখা যাবে।" তাঁর

ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছে। শক্তিশালী আলট্রামাইক্রোস্কোপ দিয়ে জলাতঙ্ক রোগের ভাইরাস আজ দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর আরও বিশ্বাস ছিল যে কলেরা বা অ্যানথ্রাক্স রোগের ক্ষেত্রে যেমন জীবাণুকে না মেরে দুর্বল করে রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে, সেই রকম জলাতঙ্ক রোগেও সেটা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু কি করে করা যাবে? সে যুগে বড় বড় গবেষণাগার ছিল না। পাস্তুর তাঁর সাধারণ ল্যাবরেটরীর একটি ঘর যথাসম্ভব পরিষ্কার করে জলাতঙ্ক রোগে মৃত খরগোশের মস্তিষ্ক ও মূল স্নায়ু ঝুলিয়ে রাখলেন যাতে ক্রমশঃ সেটা শুকিয়ে যায়। কিছুকাল এই-ভাবে রাখলে পোকাগুলো নিশ্চয়ই দুর্বল হবে। এই মতের উপর ভিত্তি করে তিনি কিছুদিন বাদে সেই শুকনো স্নায়ু এক বিশেষ পদার্থের সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন। তারপরে এলো পরীক্ষা করে দেখার পালা।

প্রথমে তিনি কুকুরকে ঐ ইনজেকশন দিলেন, তাতে কোন খারাপ ফল দেখা গেল না। সেই কুকুরকে পাগলা কুকুর কামড়ালো, তার কিন্তু জলাতঙ্ক রোগ হল না। মনে দারুণ ভরসা পেলেন তিনি। এবার তো মানুষের ওপর পরীক্ষা করে দেখতে হয়। কিন্তু মানুষ কোথায় পাওয়া যাবে? তাই শেষে ঠিক করলেন নিজের ওপরেই পরীক্ষা করে দেখবেন। কিন্তু তার দরকার হোল না। ১৮৮৫ খ্রীঃ ৬ই জুলাই আলসাস থেকে জোসেফ মাইসটার নামে একটি ন' বছরের ছেলেকে তার মা নিয়ে এলো চিকিৎসার জন্যে। পাগলা কুকুর কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে তার হাত পা শরীরের চৌদ্দ জায়গায় কামড়ের দাগ। পাস্তুর বুঝলেন, এর মৃত্যু নিশ্চিত, কিন্তু তবুও তিনি দ্বিধা করতে লাগলেন। জোসেফের মাকে বললেন, 'আমার এই টীকা আমি মানুষের ওপর এখনও ব্যবহার করি নি, কি করে একে দেবো?' ভদ্রমহিলা বললেন, 'তুমি চিকিৎসা না করলে এ মারা যাবে নিশ্চয়ই। সুতরাং তুমি চেষ্টা করো। যদি মরে যায় তোমাকে দোষী করবো না। আমি সান্ত্বনা পাবো যে, আমি চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারি নি।' তখন পাস্তুর বললেন, 'আমাকে একটু ভাবতে দাও। তুমি সন্ধ্যায় এসো।'

পাস্তুর তাঁর দুজন ডাক্তার সহকারীর সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলেন

যে, জোসেফের চিকিৎসা তাঁরা করবেন। সন্ধ্যায় জোসেফকে প্রথম ইনজেকশন দেওয়া হল। পাস্তুর ছেলেটিকে তাঁর কাছে রেখে যেতে বললেন। খুশী মনে জোসেফের মা সম্মতি দিয়ে গেলেন। পাস্তুরের গবেষণাগার হয়ে উঠল ডাক্তারের চেম্বার। পাস্তুর চিকিৎসা শুরু করলেন ঠিক, কিন্তু তার উৎকণ্ঠা বাড়তে লাগল। রাত্রে ঘুমোতে পারেন না, বার বার উঠে যান ছেলেটির ঘরে। জানলা দিয়ে দেখেন অঘোরে ঘুমোচ্ছে জোসেফ। আর ঘরে গেলেন না, সেইখানেই বসে রইলেন তিনি। দিন কেটে যায়। অন্য সব কাজ ফেলে তিনি ছোটেন রোগীর কাছে। বাঃ! ও তো বেশ গিনিপিগ, খরগোশ নিয়ে খেলা করছে। কামড়ানো ক্ষতগুলোও চিকিৎসার ফলে বেশ শুকিয়ে উঠছে। দিন যায় সপ্তাহ কাটে, জোসেফের মা বলেন, 'ছেলে আমার নিশ্চয় সেরে উঠবে।' কিন্তু তাঁর নিজের যেন



কুকুরের সাথে লড়াইরত জুপিলির প্রতিমূর্তি

বিশ্বাস হয় না—বিজ্ঞানী তিনি, এত সহজে একটা সিদ্ধান্তে আসা ঠিক হবে না। পাস্তুরের নিজের শরীরের ওপর নজর নেই। তিনি খুবই অন্য-মনস্ক। মনের সবটা দখল করে আছে জোসেফের ভাবনা। এক মাস তো কাটলো, এখনও জলাতঙ্ক হয় নি—তা হলে কি ও বেঁচে গেল? তাঁর যেন বিশ্বাস হচ্ছে না যে, তিনি সফল হয়েছেন, ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। তাঁর মনে হচ্ছে—আচ্ছা, এও তো হতে পারে যে, ওর জলাতঙ্ক হোতই না। সাধারণ কুকুরে কামড়েছিল, ঘা ভাল হয়ে গেছে।

সন্দেহ কিন্তু কেটে গেল কিছুদিন পর। জিন ব্যাপটিস্ট জুপিলি নামে এক পনের বছরের মেষপালক একদিন ভেড়া চরাবার সময় দেখতে পেল একটা পাগলা কুকুর কতকগুলি বাচ্চা ছেলেদের দিকে তেড়ে আসছে। জুপিলি তার চাবুক নিয়ে সেই কুকুরের সঙ্গে লড়তে লাগল। বাচ্চা ছেলেরা পালিয়ে বাঁচল, কিন্তু জুপিলি কুকুরের কামড়ে ভীষণ ভাবে জখম হোল। কদিনের মধ্যে কুকুরটা মরেও গেল। তখন জুপিলিকে তাড়াতাড়ি নিয়ে আসা হোল প্যারীতে পাস্তুরের কাছে চিকিৎসার জন্য। মনে তাঁর এখন দ্বিধা নেই যথেষ্ট ভরসা নিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি চিকিৎসা শুরু করলেন। জুপিলি বেঁচে গেল। চিকিৎসা বিজ্ঞানে এই আবিষ্কার যুগান্তর নিয়ে এলো। আজ পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে, প্রায় প্রতি বড় শহরে পাস্তুরের নামে হাসপাতাল আছে; যেখানে পাগলা কুকুরের কামড়ানো চিকিৎসা করা হয়।

পাস্তুরের প্রথম রোগী জোসেফ প্যারীর পাস্তুর ইন্‌ষ্টিটিউটে দ্বাররক্ষীর কাজ পেয়েছিল। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানবাহিনী যখন প্যারী দখল করে ইন্‌ষ্টিটিউটে তাঁর কবরের দরজা খুলতে আসে তখন জোসেফ সেই সৈন্য-দের প্রতিরোধ করতে না পেরে আত্মহত্যা করে। আর জুপিলি যে নিজের জীবন বিপন্ন করে বালকদের রক্ষা করেছিল, তার সেই সাহসিকতার স্বীকৃতি হিসাবে কুকুরের সঙ্গে লড়াই করা অবস্থায় জুপিলির এক প্রতিমূর্তি প্যারীতে পাস্তুর ইনষ্টিটিউটের সামনে স্থাপিত হয়েছিল যা আজও আছে। তোমরা কেউ হয়তো বড় হয়ে প্যারী যাবে তখন ওই মূর্তি যেন দেখতে ভুলো না।

পাস্তুর তাঁর গবেষণাসমূহের জন্য দেশে ও বিদেশে প্রভূত সম্মান অর্জন করেছিলেন। পেয়েছিলেন প্রচুর অর্থ যা তিনি তার গবেষণা কেন্দ্রের জন্য ব্যয় করেছিলেন।

রাশিয়া থেকে পাগলা নেকড়ে বাঘের কামড়ে আহত উনিশ জন রোগীকে নিয়ে আসা হয়েছিল চিকিৎসার জন্য। তাদের মধ্যে মাত্র তিনজন মারা যায়, তাও বোধহয় অত্যন্ত দেরিতে চিকিৎসা শুরু হওয়ার জন্য। কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসাবে সে দেশের সম্রাট জার পাস্তুরকে একটি হীরকখচিত ক্রুশ ও এক লক্ষ ফ্রা (ফরাসী মুদ্রা) উপহার দিয়েছিলেন। সেই টাকায় পাস্তুরের নিজস্ব গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত, যা আজ "পাস্তুর ইনষ্টিটিউট" নামে বিশ্ববিখ্যাত।

এই মহাবিজ্ঞানী ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর গবেষণাগারের পাশে যেখানে তাঁর আদরের কুকুরদের রাখা হোত তারই পাশে একটি ছোট্ট বাংলোয় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর সময় পাশে ছিলেন তাঁর সহধর্মিনী এবং তাঁর দুই একনিষ্ঠ সহযোগী ডাঃ রু ও চেম্বারল্যাণ্ড। পাস্তুরের পরে পৃথিবীতে বহু বৈজ্ঞানিক এসেছেন ও আসবেন, কিন্তু এই রকম নিরলস নিরহঙ্কারী ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি আসবেন কি না সন্দেহ আছে।

রবার্ট কক্

ইংরাজী ১৮৭৩ সাল ; জার্মানীর এক ছোট্ট শহর উলষ্টিনে এক মহিলা তাঁর চিকিৎসক স্বামীর ২৮তম জন্মদিনে উপহার দিলেন একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র। খুব ছোট্ট ঘটনা, খুব কম লোকই জানেন ; কিন্তু সেদিনের সেই ছোট ঘটনাটি ৯ বছর পরে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নিয়ে এলো এক বিরাট যুগান্তর। যদি এমি কক্ সেদিন তাঁর স্বামী রবার্ট কক্‌কে এই ক্ষুদ্র উপহার না দিতেন ; তাহলে চিকিৎসা বিজ্ঞান নিশ্চয়ই কয়েক বছর পিছিয়ে থাকত।

রবার্ট কক্ ১৮৪৫ খ্রীঃ ১১ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার কাছে অল্পবয়সেই ভূবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর হাতেখড়ি। ছেলেবেলাতেই নানা ধরনের মাটি, পাথর, গাছ পাতা জীব-জন্তুর হাড় দিয়ে যেন একটা ছোট্ট জাদুঘর করে ফেললেন। ছেলেবেলার এই কাজ ও ভাবনাই তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনকে প্রভাবিত করেছিল।

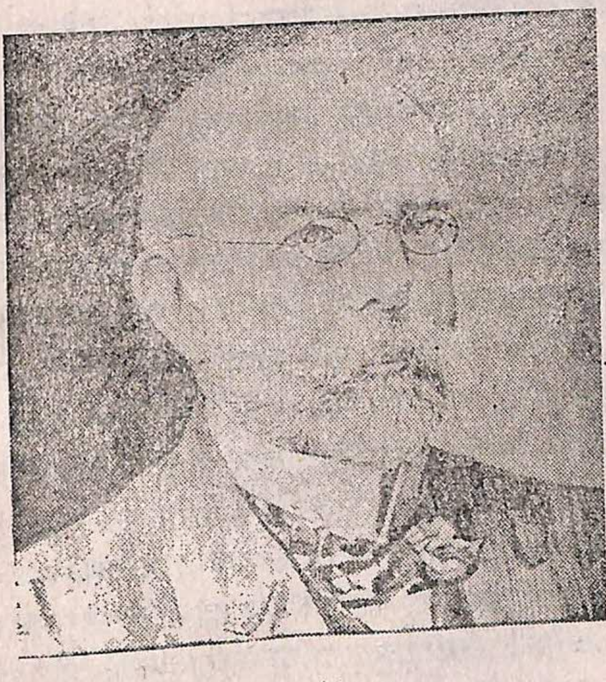
রবার্ট-এর বাবা ডাক্তার হবার জন্য তাঁকে পাঠালেন গোটিংগণ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে। এখানে তিনি বিখ্যাত শরীরতত্ত্ববিদ জোসেফ হেনলি ও নিদানশাস্ত্রবিদ ক্লাউসের কাছে গবেষণার কাজে কি ধরনের সত্যনিষ্ঠা প্রয়োজন বা কত পরিশ্রম করতে হয়, তার আভাষ পেয়েছিলেন। এই শিক্ষা পরবর্তী জীবনে খুব কাজে এসেছিল।

ডাক্তারী পরীক্ষা পাস করে ১৮৬৯ খ্রীঃ হ্যানোভার ও হামববুর্গ হাস-পাতালে কিছুদিন কাজ করার পরে, তিনি সামরিক বাহিনীর চিকিৎসকের কাজ করেন। পরে ১৮৭২ খ্রীঃ স্নাতকোত্তর উপাধি নিয়ে উলষ্টিনে চেম্বার করে বসলেন। কিন্তু চিকিৎসকের কাজে তাঁর মন বসে না। রোগীর বাবা মা হয়ত জানতে চান তাঁদের ছেলেটির ডিপথেরিয়া সারবে তো ? কক ঠিক মতো উত্তর দিতে পারেন না। দেবেন কি করে ? ডিপথেরিয়া কেন হয় তাই তো অজানা, সারবে কিনা জানবেন কি করে ? মনে তাঁর ক্ষোভ জন্মে ; তার মনে হয় যে তিনি বোধ হয় চিকিৎসার নামে রোগীদের ধাপ্পা দিচ্ছেন। এমি সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, "তুমি হয়তো না

জানতে পারো, কিন্তু বার্লিনের অধ্যাপকরা নিশ্চয়ই এতদিনে রোগের কারণ জেনে গেছেন।" কিন্তু কিছুতেই ককের মনের অশান্তি, অস্থিরতা দূর হয় না। অবশেষে অশান্ত স্বামীকে শান্ত করার জন্য এমি কক্ স্বামীর জন্মদিনে উপহার দিলেন একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

তবে যে উদ্দেশ্যে এমি কক্ তাঁর স্বামীকে উপহার দিলেন, সেটা কিন্তু পূরণ হোল না। রবার্ট তাঁর আসল কাজ ভুললেন; রোগী দেখেন বটে তবে মন পড়ে থাকে অন্য কোথাও। নাড়ী দেখছেন আর অন্য কথা ভাবছেন। ব্যবস্থাপত্র লিখতে ভুল হচ্ছে, কোথাও বা রোগীর নাম লেখেন নি, কোথাও বা নিজের নাম স্বাক্ষর করতে ভুলে যান।

এমি খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। এ কি হোল, পসার নষ্ট হলে সংসার চলবে কি করে? এদিকে রবার্ট কিন্তু অবসর পেলেই অণুবীক্ষণ যন্ত্রে চোখ দিয়ে বসেন, দেখতে থাকেন স্লাইড-এ মানুষের রক্ত, গরু, ভেড়ার রক্ত, লক্ষ্য করেন মানুষ ও পশুর রক্তের পার্থক্য কি। এমনি একদিন এনথ্রাক্স



রবার্ট কক্

রোগে মৃত একটি ভেড়ার রক্তের নমুনা দেখেছিলেন রবার্ট। এ কি ? কালো কালো ছোট রড-এর মত কি যেন দেখা যাচ্ছে। এ জিনিস তো কোন প্রাণীর রক্তে আগে তাঁর নজরে পড়ে নি। ছুটলেন কসাইখানায়, সুস্থ ভেড়ার রক্ত নিয়ে এসে দেখতে থাকেন,—কৈ না, এতে তো কোন রড জাতীয় পদার্থ নেই। কাজ রইল পড়ে ; আবার ছুটলেন রবার্ট, এনথ্রাক্স রোগে মরে যাওয়া ভেড়ার রক্তের নমুনা আনতে। আশ্চর্য এনথ্রাক্স রোগে মরে যাওয়া ভেড়ার রক্তে কিন্তু কাল রড রয়েছে। নিজেকেই প্রশ্ন করেন ; এই কাল দাগগুলোই এনথ্রাক্স রোগ বীজাণু, না অন্য কিছু ? এরা কি জীবন্ত ? যদি জীবন্ত হয়, তাহলে এরা নিশ্চয়ই রোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম। কিন্তু একজন সাধারণ গ্রাম্য চিকিৎসক ; যাঁর গবেষণা ব্যাপারে কোন অভিজ্ঞতা নেই, নেই সামান্য সরঞ্জাম, তিনি কি করে গবেষণায় সফল হবেন। কিন্তু মনে যাঁর দুর্নিবার আকাঙ্খা, যে অক্লান্ত পরিশ্রমী, সাফল্য তার আসবেই। ল্যাবরেটারী চাই ; ছুতোর ডাকলেন, নিজের চেম্বারের এক অংশ আলাদা করে ঘিরে নিলেন। সেই হোল তাঁর গবেষণাগার, আর এই ৮´× ১০´ ঘরে প্রথম এনথ্রাক্স রোগজীবাণু আবিষ্কার ও উৎপাদন করেছিলেন রবার্ট কক্। যাক, সেই কালো ছোট্ট রড-এর কথায় ফিরে আসি। ওগুলো জীবিত কিনা, রোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম কিনা, সেটা তো প্রমাণ করতে হবে। তার জন্যে চাই জন্তু। কিছু সাদা ইঁদুর কিনে আনলেন, তাঁর পরীক্ষার কাজের জন্য। কিন্তু ককের 'গবেষণাগারে' প্লাটিনাম বা সিলভার ওয়ার লুপ নেই। তাই বলে দমে যাওয়ার লোক নন ডাঃ কক্। কাঠ চেঁচে ছোট ছোট মাপে কাঠি তৈরি করে সেগুলো গরম জলে ফুটিয়ে জীবাণুমুক্ত করে নিলেন। তার পরে এনথ্রাক্স রোগে মৃত পশুর রক্ত সেই কাঠিতে মাখিয়ে নিয়ে, ইঁদুরের লেজ একটু কেটে সেখানে রক্ত লাগিয়ে দিলেন।

পরদিন সকালে তিনি দেখলেন যে ইঁদুরগুলো মরে কাঠ হয়ে গেছে। তারপরে সেই ইঁদুরের রক্ত নিয়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে চোখ দিয়ে বসলেন। হ্যাঁ, এ রক্তের মধ্যেও সেই কালো কালো রড দেখা যাচ্ছে। প্লীহার টুকরো কেটে দেখলেন তার মধ্যেও কালো দাগ। সিদ্ধান্ত নিলেন এই কালো রড-

গুলোই এনথ্রাক্স জীবাণু এবং এরা জীবন্ত ও রোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম। কিন্তু প্রমাণ চাই ; তা না হলে কেউ বিশ্বাস করবে না। রবার্ট ভাবতে থাকেন ; রোগীদের ডাক তাঁর কানে পৌঁছায় না, কোন কাজে মন দিতে পারেন না। চিন্তা কেবল একটি, কি উপায়ে এনথ্রাক্স জীবাণু ল্যাবরেটারিতে উৎপাদন করা সম্ভব হবে। হঠাৎ তাঁর মনে হল অক্ষি গোলকের মধ্যে যে তরল পদার্থ থাকে, তার ভিতরে এনথ্রাক্স জীবাণু দিয়ে দেখা যেতে পারে যে এই জলীয় পদার্থের মধ্যে নতুন জীবাণু জন্মাতে পারে কিনা। যেই ভাবা সেই কাজ। কসাইখানা থেকে সদ্য মৃত বলদের চোখ নিয়ে এলেন কক্। তার পরে ছুরি পুড়িয়ে এনথ্রাক্স রোগে মৃত ইঁদুরের প্লীহা থেকে ছোট্ট একটু টুকরো নিয়ে, সেই তরল পদার্থের মধ্যে ছেড়ে দিলেন এবং সেটাকে একটি কাঁচের স্লাইড চাপা দিলেন। তার পরে লক্ষ্য করতে থাকেন কি হয় দেখি। ১ ঘন্টার মধ্যে ৫০ মিনিট ওই স্লাইড-এর দিকে এক মনে দেখছেন। একটা দিন কেটে গেল। দু'দিন পরে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে স্লাইড পরীক্ষা করলেন ; কিন্তু এনথ্রাক্স-এর চেয়ে অন্য জীবাণু বেশী। তিনি বুঝলেন যে বাতাসে যে জীবাণু সর্বক্ষণ উড়ে বেড়াচ্ছে, তারা নিশ্চয়ই এর মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ভাবতে থাকেন কি উপায়ে শুধু এনথ্রাক্স জীবাণু চাষ করা যাবে ; যাতে উৎপাদন ক্ষেত্রে অন্য জীবাণু না ঢুকতে পারে। কিন্তু সেটা কি করে সম্ভব। উপায় একটা হোল। একটি ওয়াচ গ্লাস-এর মধ্যে অক্ষিগোলকের তরল পদার্থে ও প্লীহার টুকরো রেখে ওয়াচ গ্লাসটি আর একটি জীবাণুমুক্ত স্লাইড দিয়ে চাপা দিয়ে, চারপাশে মোম দিয়ে এঁটে দেওয়া হোল, যাতে বাইরের হাওয়া ভিতরে ঢুকতে না পারে। এবারে তিনি সফল হলেন, আর ঘটনাটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে স্মরণীয় ; কারণ এই প্রথম ল্যাবরেটরীতে কৃত্রিম উপায়ে জীবাণুর জন্ম হোল মানুষের ইচ্ছা মত। কক্ কিন্তু এখনও নিঃসন্দেহ নন ; এরাই যে এনথ্রাক্স জীবাণু তার প্রমাণ কি ? সেই তরল পদার্থ তিনি আবার সাদা ইঁদুরের লেজ একটু কেটে খুব অল্প পরিমাণে লাগিয়ে দিলেন। এবারেও ইঁদুর মরে গেল। মোমের ট্রে'তে পিন করে সেই ইঁদুর কেটে ফেললেন ; তার শরীরের রক্ত ও প্লীহা নিয়ে বসলেন মাইক্রোস্কোপ-এর লেন্স-এ চোখ দিয়ে। এবার তিনি

নিশ্চিত হলেন যে, ইঁদুরটা এনথ্রাক্স রোগেই মরেছে।

কিন্তু দু-একবার পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া ডাঃ কক্ পছন্দ করতেন না। ওয়াচ গ্লাস থেকে তরল পদার্থ নিয়ে আবার নতুন করে কালচার করতে দিলেন। এবারেও তিনি সফল হলেন। এইভাবে আট বার কালচার করলেন। ভাবতে লাগলেন যে, এ জীবাণু প্রজাতি আট বার প্রাণী শরীরের বাইরে চাষ করা হয়েছে; এখনও কি এদের রোগ সৃষ্টির ক্ষমতা আছে? মনে দ্বিধা নিয়ে আবার ইঁদুরকে এনথ্রাক্স জীবাণু সংক্রমণ করলেন—এটিও মরে গেল।

আর কোন সন্দেহ নেই তাঁর মনে, দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে তিনি চিঠি লিখলেন বার্লিনে অধ্যাপক কন্-এর কাছে। আগেও তাঁর সঙ্গে চিঠির আদান-প্রদান হোত। কন্ উৎসাহ দিতেন ডাঃ কক্‌কে। সাফল্যের খবর পেয়ে অধ্যাপক কন্ তাঁকে বার্লিনে আসতে লিখলেন। ভরসা পেয়ে রবার্ট কক্ তাঁর সামান্য সরঞ্জাম নিয়ে বার্লিনে গেলেন। ডাঃ কক্ সমবেত বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার প্রণালী দেখালেন। যদিও আগামী দিনের ডাঃ রবার্ট কক্ জার্মান বিজ্ঞানী সমাজে তখন অপরিচিত; অধ্যাপক কন্-এর অনুরোধে বহু বৈজ্ঞানিক ককের বক্তৃতা শুনতে এসেছিলেন। অধ্যাপক কন্ তাঁর ছাত্রদের গিয়ে বললেন, "তোমরা সব কাজ ফেলে রেখে গিয়ে এসো, ডাঃ কক্ কি যুগান্তকারী আবিষ্কার করেছে।"

ছাত্ররা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে, "তিনি কোথায় অধ্যাপনা করেন; তাঁর নাম তো আমরা শুনিনি।" সেদিন সেই ছাত্রদের মধ্যে পরবর্তীকালে নোবেল প্রাইজ পাওয়া বিজ্ঞানী পল এর্লিকও ছিলেন।

এ ঘটনার পরে ডাঃ কক্ হঠাৎ এমন এক আবিষ্কার করেন, যার ফলে এক শ্রেণীর জীবাণুকে অপর শ্রেণী থেকে আলাদাভাবে গবেষণাগারে কালচার করা সম্ভব। ডাঃ ককের টেবিলের ওপর আধখানা সেদ্ধ আলু পড়েছিল ফেলে দিতে গিয়ে তিনি দেখলেন সেই আলুর ওপর কোথাও সবুজ, কোথাও বা হলুদ রং এর বিন্দু। মনে প্রশ্ন এলো এগুলো কি হতে পারে? নিশ্চয়ই বাতাসের কোন জীবাণু এখানে পড়ে নিজেদের বংশ-বৃদ্ধি করেছে। একটি বিন্দু আলাদা করে তুলে কয়েক ফোঁটা জলে ফেলে,

সেই জল অণুবীক্ষণযন্ত্রে পরীক্ষা করে দেখলেন, অসংখ্য জীবাণু চরে বেড়াচ্ছে। অন্য রং-এর বিন্দু নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন তাতে আর এক জাতের জীবাণু ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনি মনে করলেন, যদি জীবাণুর জন্যে সহজগ্রাহ্য এই ধরনের খাবার তৈরি করা যায়, তাহলে এক শ্রেণীর জীবাণুকে আলাদা করে সেই বিশেষ খাদ্যের মধ্যে চাষ করা সম্ভব হবে। তিনি বিফ ব্রথ-এ জেলাটিন নামে পদার্থ মিশিয়ে টেস্ট টিউব-এ ঢেলে একটু কাত করে রাখলেন। সেটা ঠাণ্ডা হবার পরে জমে গিয়ে শক্ত হোল এবং তাতে এক শ্রেণীর জীবাণুকে আলাদাভাবে চাষ করা সম্ভব হোল।



টেস্ট টিউবে যক্ষ্মা জীবাণু চাষ

এবারে ডাঃ কক্ মনে অনেক আশা নিয়ে, সাহস নিয়ে চললেন সে যুগের এক শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডাঃ ভিরকোর কাছে। বিনয়ের সঙ্গে তিনি ভিরকোকে বললেন, "অধ্যাপক মহাশয়, আমি এক বিশেষ পদ্ধতিতে আলাদাভাবে জীবাণু চাষ করতে পেরেছি।" কিন্তু ভিরকো তাঁর এই আবিষ্কারকে কোন গুরুত্ব দিলেন না। হেসে বললেন, "বাতাসে এত জীবাণু ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার থেকে কোন শ্রেণীকে তুমি যদি আলাদা করতে চাও, তোমাকে প্রত্যেক শ্রেণীর জন্যে আলাদা গবেষণাগার তৈরী করতে হবে।" আসলে প্রবীণ ভিরকো তখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছেন, যখন মানুষ ভাবে, তার আর কিছু বোধহয় জানতে বাকি নেই। ভিরকোর ব্যবহারে কক্ দুঃখিত হলেন কিন্তু দমে গেলেন না। নূতন উদ্যমে কাজ শুরু করে দিলেন, দৃঢ় সংকল্প নিলেন মনে, যে এই তত্ত্ব বিশ্বকে বিশ্বাস করাবেন তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে।

এবার ডাঃ রবার্ট কক্ ক্ষয় রোগের জীবাণু আবিষ্কারের প্রকল্পে হাত দিলেন। এর মধ্যে ডাঃ কক্ তাঁর বন্ধুদের সাহায্যে বার্লিনে সরকারী

গবেষণাগারে ভাল কাজ পেয়েছেন। লোফলার ও গ্যাফকি নামে দু'জন সহকারী দেওয়া হয়েছে তাঁকে, কিন্তু কক্ প্রথমজনকে ডিপথিরিয়া ও দ্বিতীয়জনকে টাইফয়েড জীবাণু নিয়ে গবেষণা কাজে নিয়োগ করলেন। এরা দুজনেই পরে ঐ বিষয়ে গবেষণা করে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিলেন। ডাঃ কক্ নিজে ক্ষয় রোগের কারণ জানবার জন্যে গবেষণায় হাত দিলেন, হঠাৎ একটা সুযোগও এসে গেল। এক চাষী অল্পদিন ক্ষয়রোগ ভোগ করে হাসপাতালে মারা যায়। তার দুটি ফুসফুসে ক্ষয় রোগের অসংখ্য ছোট্ট গুটি। কক্ তার ফুসফুস থেকে ছোট্ট গুটি কেটে নিয়ে, জলে গুলে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখতে থাকলেন। কিন্তু কিছুই নজরে আসে না। তখন তিনি স্লাইড-এর ওপর রং ঢেলে দেখতে থাকলেন। নানারকম রং, কিন্তু যা দেখতে চান, তাকে দেখতে পান না। অনেক পরিশ্রমের পরে ক্ষয়-রোগ জীবাণু মেথিলিন ব্লু দ্বারা নীল রং-এ রঞ্জিত হয়ে ডাঃ ককের চোখে ধরা দিল। চেহারা তাদের খুব ছোট, একটু লম্বামত কিন্তু সামান্য বাঁকা, কোথাও বা একা আবার কোথাও হয়ত অনেকগুলো একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে। মনকে নিজেই প্রশ্ন করেন, তাহলে এরাই কি ক্ষয়রোগ জীবাণু? উত্তেজিত হলেন না, চট করে সিদ্ধান্ত নিলেন না। প্রমাণ চাই, না হলে কেউ বিশ্বাস করবে না। কি করে প্রমাণ হবে? দেখতে হবে এরা ক্ষয়রোগ সৃষ্টি করতে পারে কিনা? এদের আলাদাভাবে চাষ করতে হবে এবং সেই নতুন তৈরী করা জীবাণু দিয়ে ক্ষয়রোগ সৃষ্টি করতে হবে। ক্ষয়রোগীর ফুসফুসের ক্ষত থেকে সামান্য অংশ জলে গুলে ইনজেকশন দিলেন গিনিপিগকে। তারপর আলাদা খাঁচায়, ভাল খেতে দিয়ে যত্ন করতে থাকেন। কিছুটা তরল পদার্থ নিয়ে বিফ ব্রথ জেলি টিউব-এ দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন, কি হয়, দেখা যাক। টেস্ট টিউব-এ কিছু হোল না; তবে গিনিপিগগুলো ক্রমশঃ শুকিয়ে যেতে লাগল এবং পাঁচ-ছ' সপ্তাহ বাদে সব গিনিপিগ মরে গেল। তাদের শরীর কেটে দেখলেন, মানুষের শরীরের ক্ষয়রোগের মত ক্ষত এদের শরীরেও হয়েছে। কিন্তু টেস্ট টিউবে এরা জন্মাল না কেন? মনে ভাবলেন এই টিউবে একটু রক্ত মিশিয়ে দেখা যাক, কি হয়। কসাইখানা থেকে রক্ত এনে একটু গরম করে জীবাণুমুক্ত



স্লাইডে অনেক যক্ষ্মা জীবাণু

করে, বিফ ব্রথ জেলি মিশিয়ে নূতন খাদ্য তৈরী করলেন ক্ষয়রোগের জীবাণুর জন্য। আবার অপেক্ষা ; সাতদিন, চোদ্দ দিন পার হোল ; কিছুই দেখা যায় না। তাহলে কি আবার ব্যর্থতা ? কিন্তু কে যেন হঠাৎ তাঁর কানে বললো, "ধৈর্য হারিয়ো না, ক্ষয়রোগ খুব ধীরে ধীরে বাড়ে, তার জীবাণুও ধীরে বাড়ে। অপেক্ষা করো।" অপেক্ষা করে সুফল পেলেন। কয়েকদিন পরে দেখলেন, সব কটি কালচার টিউব-এর মধ্যে সোনালী শিশির বিন্দুর মত কি যেন দেখা যাচ্ছে। টিউব থেকে একটু বিন্দু নিয়ে স্লাইড-এ ঘষে মেথিলিন ব্লু দিয়ে রং করলেন ডাঃ কক্। সেই নীল রং-এর জীবাণু এখানেও। এবারে টিউব থেকে সোনালী বিন্দু নিয়ে জলে গুলে ইনজেকশন দিলেন অনেক প্রাণীকে—যার মধ্যে ছিল গিনিপিগ, খরগোশ, বানর, ছাগল, কচ্ছপ, মাছ ইত্যাদি। প্রায় সকলেই মারা গেল, একমাত্র কচ্ছপ আর ইল মাছ ছাড়া। তাদের শরীর কেটে একই ধরনের ক্ষয়রোগের গুটি দেখা গেল ; আর সেই গুটি স্লাইডে রং করে পাওয়া গেল একই ধরনের নীল রং-এর জীবাণু।

আর সন্দেহের অবকাশ নেই। বন্ধুদের জানালেন রবার্ট কক্। ১৮৮২ খ্রীঃ ২৪শে মার্চ বার্লিনে ফিজিওলজিক্যাল সোসাইটিতে সভা ডাকা হোল। সেখানে ডাঃ রবার্ট কক্ ঘোষণা করলেন কিভাবে তিনি কাজ করেছেন, কিভাবে সাফল্য তাঁর কাছে ধরা দিয়েছে। তিনি বক্তা ছিলেন না। কাঁপা কাঁপা গলায় দেশের সেরা বিজ্ঞানীদের কাছে তাঁর বক্তব্য রেখে, কম্পিত বক্ষে, নিজের সোনার চশমাটি মুছে নিয়ে বসলেন তাঁর আসনে। সমস্ত ঘর নিথর নিস্তব্ধ। সকলে চেয়ে আছে ডাঃ রুডল্ফ ভিরোকের দিকে ; কি বলেন তিনি। যার সামান্য ভ্রূকুটিতে কত বিজ্ঞানীর জীবন ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। ভিরকো কিন্তু চুপ। মাথা নীচু করে কি যেন ভাবছেন। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে টুপি নিয়ে হল থেকে বেরিয়ে গেলেন ; কোন কথা না বলে। তারপরে এক অদ্ভুত দৃশ্য—সমবেত বিজ্ঞানীরা উঠে দাঁড়ালেন, সমস্ত হল করতালিতে যেন ফেটে পড়ল। অভিনন্দনে অভিভূত রবার্ট কক্। সেই রাত্রেই সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গেল এই খবর। উলষ্টিনের এক গ্রাম্য চিকিৎসক রাতারাতি হয়ে গেলেন বিশ্ববিখ্যাত।

এর পরে ডাক্তার কক্ কলেরা জীবাণু আবিষ্কারের কাজে হাত দিলেন। ডাঃ কক্ তাঁর বিশ্বস্ত সহকারী গ্যাফকিকে নিয়ে ছুটলেন মিশর দেশের বন্দর আলেকজান্দ্রিয়ায়। সেখানে তখন কলেরা রোগ মহামারী রূপে ছড়িয়ে পড়েছে। কলেরা রোগ ইউরোপ বা আফ্রিকায় পূর্বে ছিল না। ভারত থেকে এই রোগ ছড়িয়ে পড়েছিল আফ্রিকার মিশর দেশে। ফরাসী সরকার চেয়েছিলেন পাস্তুরকে এই কাজের জন্য মিশর দেশে পাঠাতে। কিন্তু তিনি তখন জলাতঙ্ক রোগের টীকা আবিষ্কারের জন্য ভীষণ ব্যস্ত। তিনি তাঁর সহকারী রু ও থুলিবেঁকে আলেকজান্দ্রিয়ায় পাঠালেন, কলেরা রোগ সম্বন্ধে গবেষণার জন্য। তাঁরা সেখানে পৌঁছোবার কিছুদিন পরেই কলেরার প্রকোপ কমে গেল। এছাড়া এক শোকাবহ ঘটনায় ফরাসী দেশের বৈজ্ঞানিকরা কাজ বন্ধ করে ফিরে আসেন। ফরাসী দলের অন্যতম বিজ্ঞানী ডাঃ থুলিবেঁ সেখানে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান। ডাঃ কক্ কিন্তু থামলেন না। তিনি বার্লিনে ফিরেই জার্মান সরকারের অনুমতি প্রার্থনা করলেন, ভারতে গিয়ে কলেরা নিয়ে গবেষণার জন্য। ১৮৮৩ খ্রীঃ তিনি

কলিকাতায় আসেন এবং ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজ-এ কলেরা জীবাণু নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি মিশরেই 'কমা' ধরনের কলেরা জীবাণু আবিষ্কার করেছিলেন, ভারতে এসে কলেরা রোগীর অন্ত্রে ও মলে 'কমা' জীবাণু দেখতে পেলেন। কিন্তু কোন সুস্থ লোকের ক্ষেত্রে 'কমা' জীবাণু দেখতে পান নি। তিনি আরও জানলেন যে কলেরা জীবাণু জল বা দূষিত খাবারের সাহায্যে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। দেশে ফিরে তিনি বিশ্বকে জানালেন কিভাবে কলেরা সংক্রমণ হয় এবং কিভাবে এই রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

১৮৯০ খ্রীঃ রবার্ট ককের জন্য নিয়ে এলো দারুণ অখ্যাতি, অপমান ও হতাশা। এর কয়েক বছর আগে তিনি যক্ষ্মা জীবাণু থেকে পাওয়া প্রোটিন জাতীয় পদার্থ আলাদা করেন এবং ঘোষণা করেন এর দ্বারা ক্ষয়রোগ সারিয়ে ফেলা সম্ভব হবে। ডাঃ ককের মত খ্যাতিমান লোকের কথা কেউ অবিশ্বাস করতে পারে? সাধারণ চিকিৎসকেরা সরল বিশ্বাসে কয়েক হাজার লোককে সেই প্রোটিন জাতীয় ওষুধ 'টিউবারকিউলিন' ইনজেকশন দিলেন। ফলে শত শত নর-নারী ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং মারা যায়।

এই শোকাবহ ঘটনা ডাঃ ককের খ্যাতিকে কিছুটা ম্লান করেছিল। তিনি নিজেও কিছুদিন গবেষণার কাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সরে যেতে চাইলেও জার্মান সরকার এনথ্রাক্স, কলেরা ও যক্ষ্মা রোগ জীবাণু যিনি আবিষ্কার করেছেন তাঁকে সরে থাকতে দেবেন কেন? ১৮৯৭ খ্রীঃ তাঁকে বোম্বাই পাঠান হয়, প্লেগ কমিশনের নেতা হিসাবে

তিনি যে মানুষের রোগজীবাণু নিয়ে গবেষণা করেছিলেন তা নয়; পশুর রোগ নিয়েও তিনি বহু গবেষণা করেছিলেন। সত্যি বলতে কি, একটি বিশেষ রোগ যে মাত্র এক বিশেষ জীবাণু দ্বারা হয়, এই তথ্যের বিজ্ঞানভিত্তিক প্রতিষ্ঠা তিনিই করেন। তাঁর সফল গবেষণার স্বীকৃতি হিসাবে পৃথিবীর বহু দেশ তাঁকে নানাভাবে সম্মানিত করে। জার্মান সম্রাট কাইজার নিজের হাতে তাঁকে 'অর্ডার অব ক্রাউন' তারকা দিয়ে সম্মানিত করেন। ১৯০৫ খ্রীঃ তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক অবদানের স্বীকৃতি

হিসাবে নোবেল পুরস্কার পান। ১৯১০ খ্রীঃ ২৮শে মে এই বরেণ্য বিজ্ঞান সাধকের হৃদরোগে মৃত্যু হয়। তিনি বক্তা ছিলেন না, ছিলেন অক্লান্ত কর্মী ও একনিষ্ঠ সাধক। তাঁর সাধনা ও কঠোর পরিশ্রম তাঁকে উপহার দিয়েছিল সাফল্যের চাবি-কাঠি। তাঁর নিজের ভাষাতেই তা লক্ষ্য করা যায়।

"আমি সাধ্যমত কঠোর পরিশ্রম করেছি, যদি এমন হয় যে অন্যের থেকে অধিক সাফল্য লাভ করেছি, তার কারণ এই যে আমি চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চলতে চলতে পথের ধারে সোনা কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। এই সাফল্য আমার কোন বিশেষ মেধা বা কৃতিত্বের নয়। আমি মনে করি এই সাফল্য এসেছে নেহাত ভাগ্যের জোরে।"

পল এর্লিক ও জেরাল্ড ডোমেক

এখনকার জার্মানী নয় ; ১৯১০ খ্রীঃ অবিভক্ত জার্মানীর এক শহর কনিস্‌বুর্গে সারা দেশের চিকিৎসকদের এক সভার আয়োজন করা হয়েছে। সময়ের আগেই সভাগৃহ কানায় কানায় ভর্তি ; তিলধারনের স্থান নেই। সব দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এমন সময় এক খর্বকায় বলিষ্ঠ লোক হন্তদন্ত হয়ে সভাগৃহে প্রবেশের জন্য একবার সদর দরজা, একবার পাশের দরজায় ধাক্কা দিলেন। কিন্তু কেউ দরজা খুললো না। তখন তিনি প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে সদর দরজায় খুব জোরে জোরে ধাক্কা লাগালেন, তখন বিশালবপু দ্বাররক্ষক একটু দরজা ফাঁক করে জানাল, "মহাশয়, এখানে কোথায় আসবেন ? হলে একটিও চেয়ার খালি নেই।" ভদ্রলোক কিন্তু নাছোড়বান্দা, কোন রকমে নিজের কাঁধটা দরজার ফাঁকে ঢুকিয়ে বললেন, "কিন্তু আমাকে যে ভিতরে যেতেই হবে।" দ্বাররক্ষী তাঁকে ঢুকতে দেবে না, আর তিনিও ফিরে যাবেন না। দরজার কাছে ঠেলাঠেলি ও গোলমাল শুরু হতে সভার কর্মকর্তারা ছুটে এলেন। এসে সেই ভদ্রলোককে দেখে তো তাঁরা অপ্রস্তুতের একশেষ। কে এই ভদ্রলোক ? তিনি হলেন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী পল এর্লিক,—যিনি চিকিৎসা-বিজ্ঞানে রোগ নিরাময় করার নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করে, আমাদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করেছেন নূতন দিগন্তে।

সেদিনের সভার কথা আমরা জানতে পেরেছি অধ্যাপক এর্লিকের সচিবের লেখা এক বিবরণী থেকে। সেদিন অধ্যাপক এর্লিক প্রথমে সভায় যোগ দিতে এসে দেখলেন তখনও সভা আরম্ভ হতে অনেক দেরি। একটু ঘুরতে বেরোলেন পায়ে হেঁটে। অন্য মনে চলতে চলতে অনেক দূরে চলে এসেছেন। দ্রুত হেঁটে সভাস্থলে যখন এসে পৌঁছোলেন তার পরে ওই ঘটনা।

পল এর্লিকের জন্ম ১৮৫৪ খ্রীঃ মার্চ মাসে জার্মানীর সাইলেশিয়া



পল এর্লিক

প্রদেশে। তাঁর ঠাকুরদাদা অল্পস্বল্প বিজ্ঞানর্চ্চা করতেন এবং পল আকারে ও চরিত্রে তাঁর মত ছিলেন। পলের বাবা কিন্তু বাস্তব বুদ্ধির মানুষ ছিলেন না। তাঁদের একটি সরাইখানা ছিল এবং সুপরিচালনার অভাবে সেটা প্রায় বন্ধ হতে চলেছিল। কিন্তু পলের মা সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় সরাইখানাটির অপমৃত্যু রোধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পলের প্রাথমিক শিক্ষা ব্রেসলোর স্কুলে। তিনি কিন্তু বিদ্যালয়ের রুটিন মাফিক পড়া মোটেই পছন্দ করতেন না। একবার তো ঠিকমত রচনা না লেখার জন্য তিনি প্রায় ফেল করেছিলেন আর কি। যাই হোক, স্কুলের পাঠ শেষ করে তিনি প্রথমে ব্রেসলো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। কিন্তু সেখানে মন টিকলো না। ছেড়ে দিয়ে নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্ট্রাসবুর্গে এলেন। সেটাও ছেড়ে দিয়ে এলেন ফ্রাইবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। স্ট্রাসবুর্গের এক অধ্যাপক তাঁকে মন্ত্র দিয়েছিলেন, 'পল, একটা নতুন কিছু করো।' নতুন কিছু করার উপদেশ বোধহয় তাঁকে বিভিন্ন রং নিয়ে কাজ করার প্রেরণা দিয়েছিল।

পল এমনিতে ছিলেন ভীষণ আবেগপ্রবণ ও অস্থিরমতি। যে কাজ কেউ করে নি, সেই এনিলিন রং দিয়ে বিভিন্ন কোষ-তন্তুজাল (টিসু) রং করা তাঁর যেন নেশায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। রং নিয়ে নানাভাবে পরীক্ষা করে তিনি দেখেছিলেন যে রং করলে কোষতন্তুজাল বেশ ভালভাবে দেখা যায়।

কিন্তু পরে তিনি বুঝলেন যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষাগত যোগ্যতার স্বীকৃতি আদায় না করতে পারলে তাঁর কথায় কেউ কান দেবে না। তিনি ফ্রাইবুর্গ ছেড়ে আবার ব্রেসলোতে ফিরে এসে মন দিয়ে লেখাপড়া শুরু করলেন। এখানে গবেষণাগারে একদিন কাজের সময় রবার্ট কক্ এসেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে। সেই সময় পলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করান হয় এই বলে, "এই ক্ষুদে ছেলেটি হল পল এর্লিক, ভাল রং করতে জানে বটে ; তবে কখনও পরীক্ষা পাস করতে পারবে বলে মনে হয় না।" কিন্তু সেই শিক্ষকের ভবিষ্যৎ বাণী ব্যর্থ করে মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি এম. ডি. পাশ করেন এবং পরে তিনি ডাঃ ককের সঙ্গে তাঁরই গবেষণাগারে কিছুদিন কাজ করেছিলেন। এম. ডি. পাঠক্রমে তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল, তাঁর অতি প্রিয় এনিলিন রং। তাঁর থিসিসটি পরে হারিয়ে যায়। তাঁর স্ত্রী ও তাঁর বন্ধু অধ্যাপক মাইকেলিস সেই থিসিস প্রবন্ধ আকারে একটি পত্রিকায় দেখতে পান। ডাঃ এর্লিকের সচিব ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে এই পত্রিকার একটি সংখ্যা উদ্ধার করেন।

পল এর্লিকের কর্মময় জীবনের প্রথম উল্লেখযোগ্য কাজ হল রক্ত স্লাইড রং করে শ্বেত কণিকার শ্রেণী বিভাগ করা। কোন কণিকা মৌলিক (বেসিক-ব্যাসোফিল) রং, কোনটা অম্লধর্মী (অ্যাসিড-ইওসিনোফিল) রং, আবার কোনটা হয়ত নিরপেক্ষ (নিউট্রাল-নিউট্রোফিল) রং, এ রঞ্জিত হয়। এই কাজ আজ আমাদের মনে হয় খুব সহজ। স্কুল বা কলেজে শারীরতত্ত্বের যে কোন ছাত্র এই রং করে দিতে পারে। আজ আমরা জানি রং করলে যে কোন কোষ (সেল) চেনা কত সহজ ; কিন্তু পল এর্লিক ছিলেন এই পদ্ধতির পথপ্রদর্শক। পল আর কোন কাজ না করলেও এই আপাতঃদৃষ্ট ছোট কাজটির জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতেন। এর

পরে তিনি আরও অনেক বড় কাজ করেছিলেন, বোধ হয় সেইজন্যই তাঁর এই 'ছোট্ট' কাজকে কেউ অভূতপূর্ব বলে মনে করেন না।

১৮৮২ খ্রীঃ বার্লিনে রবার্ট ককের সেই বিখ্যাত সভায় শ্রোতা হিসাবে পলও উপস্থিত ছিলেন। সভার শেষে সেই রাত্রেই পল যক্ষ্মারোগীর কফ নিয়ে স্লাইড তৈরী করতে লেগে গেলেন। অনেক রাত হয়ে গেলেও কাজে তাঁর কোন ক্লান্তি ছিল না। পরে স্লাইডগুলো রং করে শুকোবার জন্য আগুন নিভে যাওয়া চুল্লীর ওপর রেখে তিনি শুতে যান। কিন্তু সকালে তাঁর আগেই ঝাড়ুদার এসে অন্যদিনের মত চুল্লীতে আগুন ধরিয়ে দেয়; সে বোধ হয় স্লাইডগুলো দেখতে পায় নি। একটু পরেই পল এসে একেবারে হতবাক। তাঁর রাতের পরিশ্রম বুঝি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল। কিন্তু না, ভাগ্য সব সময় যে পরিশ্রমী তাকেই সাহায্য করে। এই ছোট 'দুর্ঘটনা' থেকে তিনি বুঝতে পারলেন, যক্ষ্মাজীবাণু রং করার সময় একটু গরম করা হলে, রং আরও ভাল হয়। পল সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ কক্‌কে এ ঘটনা জানালেন এবং ডাঃ কক্ পরের বছর এক প্রবন্ধে পলকে অভিনন্দন জানালেন এবং এই তথ্য আবিষ্কারের কৃতিত্ব যে পল এর্লিকের তা স্বীকার করেন।

নিজের খেয়ালখুশী মতো গবেষণাগারে কাজ করছিলেন পল। বেশ কাটছিলো দিনগুলো। ইতিমধ্যে বিয়ে করেছেন তিনি এক ধনী শিল্পপতির উনিশ বছরের মেয়েকে। লেমনেড, সোডা আর চুরুট খেয়েই দিন কাটছে; অন্য কিছু খাওয়ার দিকে নজর নেই। এমন সময় তাঁর গবেষণাগারের মুখ্য অধিকর্তা হঠাৎ মারা গেলেন। নূতন অধিকর্তা এসে কঠোরভাবে তাঁর ওপর নিয়মমাফিক কাজের নির্দিষ্ট তালিকা বেঁধে দিলেন। মনে ভীষণ ঘা খেলেন তিনি। ভাবপ্রবণ মানুষ পল, তার ওপর খাওয়ার অনিয়ম, গবেষণার কাজও বন্ধ হয়ে গেল। মানসিক দুঃখে ও ক্লান্তিতে অসুখে পড়লেন তিনি। যক্ষ্মারোগ দেখা দিল তাঁর শরীরে। চাকুরি থেকে পদত্যাগ করে স্ত্রীকে নিয়ে মিশর দেশে চললেন রোগ সারাবার আশায়। বিশ্বের অশেষ সৌভাগ্য যে এর্লিক মিশর থেকে সুস্থ হয়ে ফিরে এলেন ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে।

দেশে ফিরে নিজের ইচ্ছামত কাজ করার বাসনা নিয়ে একটি ছোট গবেষণাগৃহ তৈরি করলেন। কিন্তু রবার্ট কক্‌ তাঁকে তাঁর গবেষণাগারে কাজ করার আমন্ত্রণ জানালেন। এখানে তিনি তাঁর সহকর্মী গবেষকদের নানাভাবে সাহায্য করে সুনাম অর্জন করেন। তখন ডিপথিরিয়া ও টিটেনাস রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় করা নিয়ে গবেষণা হচ্ছিল সেখানে। গবেষণা করে দেখা গিয়েছিল যে বিশেষ শ্রেণীর রোগজীবাণু শরীরে প্রবেশ করার কিছুদিন পরে এক প্রকার রোগ প্রতিহন্তা শক্তি (এনটিবডি) তৈরি করে। সেই শক্তি রোগ নিরাময় করতে পারে এবং রোগ প্রতিরোধ করতেও পারে। কিন্তু কি উপায়ে এই প্রতিহন্তা শক্তি প্রচুর পরিমাণে তৈরি করা যাবে ? ককের এক সহকারী বেরিং এর্লিককে বলতে তিনি উপায় বলে দিলেন। খুব সহজ উপায়। ঘোড়ার শরীরে বারবার অল্প পরিমাণে ডিপথিরিয়া রোগের বিষ ইনজেকশান দিলে, কিছুদিন পরে সেই ঘোড়ার সিরাম থেকে প্রচুর পরিমাণে রোগ প্রতিহন্তা সিরাম পাওয়া সম্ভব। এর্লিক খোলামনে বন্ধুকে সাহায্য করলেন ; কিন্তু বেরিং এই সাহায্যের স্বীকৃতি দিলেন না। উপরন্তু ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ডিপথিরিয়া ও টিটেনাস-এর ওষুধ তৈরীর সময় আর্থিক লেনদেনের সামান্য অংশও এর্লিককে দিলেন না। এর্লিক তখন বেশ অর্থকষ্টে ছিলেন। বন্ধুর এই অকৃতজ্ঞতায় তিনি খুব মর্মাহত হন এবং তাঁর সঙ্গে জীবনে আর কথা বলেন নি।

১৮৯৬ খ্রীঃ জার্মান সরকার সিরাম জাতীয় ঔষধের মান নিরুপণের জন্য নতুন গবেষণাগারের অধিকর্তা হবার জন্য এর্লিককে আমন্ত্রণ করেন। এই কাজ পেয়ে এর্লিক তো খুব খুশী। এবার নিজের ইচ্ছামত কাজ করার সুযোগ পাবেন তিনি। তাঁর মতবাদ ছিল, যখন কোন জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে, তখন শরীরে রোগ প্রতিরোধ করার জন্য রক্তে রোগ প্রতিহন্তা শক্তি সৃষ্টি হয়। সেই প্রতিহন্তা শক্তি আক্রমণকারীর জীবাণুর পাশে লেগে যায় এবং তার অনিষ্টকারী শক্তির বিনাশ করে (সাইড চেন থিওরি)। এই মতবাদ এবার তিনি প্রমাণ করবার সুযোগ পাবেন। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল, গবেষণাগারে এইরূপ এনটিবডি জাতীয় ওষুধ তৈরী

করা সম্ভব হবে, যা শরীরে প্রবেশ করার পরে আক্রমণকারী জীবাণুকে ধ্বংস করবে, অথচ শরীরের কোন কোষের ক্ষতি করবে না। তাঁর ধারণা ভ্রান্ত—একথা কেউ বললে তিনি ভীষণ চটে যেতেন। একবার তিনি দুজন ইংরেজ অধ্যাপক স্যার এলমথ রাইট ও উইলিয়াম বুলকের সঙ্গে ট্রেনে একই কামরায় বার্লিন থেকে ফ্রাংকফুর্ট যাওয়ার পথে তাঁদের তাঁর বিখ্যাত "সাইড চেন" মতবাদ বোঝাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু অধ্যাপক দুজন তাঁর ধারণা ভ্রান্ত বলে তাঁকে বিদ্রুপ করেন। ফলে তিনি এত বেশী উত্তেজিত হন যে, একটা হাতাহাতি হবার উপক্রম হয়। শেষে ট্রেনের কনডাকটর গার্ড তাঁদের সাবধান করে বলেন যদি তাঁরা শান্ত না হন এবং ভদ্রভাবে না থাকেন, তাহলে তাঁদের তিনজনকেই ট্রেন থেকে নামিয়ে দিতে বাধ্য হবেন।

যাই হোক, এর্লিক তাঁর নতুন গবেষণাগারে তাঁর বহুদিনের স্বপ্ন ও বাসনাকে রূপ দেওয়ার পূর্ণ সুযোগ পেলেন। রং নিয়ে গবেষণা করার স্বপ্ন বাস্তব হোল। প্রথমে যে রং নিয়ে তিনি কাজ করেন, তার নাম "ট্রাইপটান রেড"। বিভিন্ন রোগজীবাণুর ওপর এই রং প্রয়োগ করে, তিনি দেখতে পেলেন ট্রাইপটান রেড "ঘুমরোগ" (স্লিপিং সিকনেস) জীবাণুর ওপর কাজ করে। তার পরে তিনি গবেষণাগারে জন্তুর ওপর ট্রাইপটান রেড প্রয়োগ করে কি ফল হয়, তা লক্ষ্য করলেন। কারণ, রোগজীবাণু মরবে অথচ মানুষ বা পশুর কোন ক্ষতি হবে না, তবেই সেই ওষুধ মানুষের ব্যবহারের উপযোগী বলে বিবেচিত হবে। 'ঘুমরোগ' জার্মানী থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে আফ্রিকা মহাদেশে দেখা যেত এবং প্রতি বছর শত শত লোক এই রোগে মারা পড়ত। সেই ঘুমরোগের ওষুধ আবিষ্কার এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা; কারণ একটি বিশেষ রোগে একটি বিশেষ ওষুধ প্রয়োগ করে সফল হওয়ার তাৎপর্য অনেক বেশী ব্যাপক। এই সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্য বৈজ্ঞানিকরা গবেষণা শুরু করেন, যা পরবর্তী সময়ে নিয়ে এল একের পর এক সাফল্য। বিশেষ রোগে বিশেষ ওষুধ —এর্লিকের 'ম্যাজিক বুলেট'-এর স্বপ্ন বোধ হয় সফলতার দরজায় এসে দাঁড়াল।

ঘুমরোগের ওষুধ আবিষ্কারের এই সাফল্য এর্লিকের ভাগ্যে নিয়ে এল এক বিরাট পরিবর্তন। এক ধনী বিধবা ফ্রাউ স্নেয়ার প্রচুর টাকা দান করলেন, কেবলমাত্র বিশেষ ওষুধ নিয়ে গবেষণার জন্য। সেই টাকার কিছু অংশ দিয়ে তৈরী হল বিরাট গবেষণাভবন এবং বাকি টাকা রাখা হোল গবেষণার খরচ ও দৈনন্দিন খরচ চালাবার জন্য। এবারে এর্লিক হাত দিলেন আর্সেনিক নামে এক ভীষণ বিষ নিয়ে গবেষণার কাজে। সকলের ধারণা ছিল আর্সেনিকের বিষক্রিয়া নষ্ট করে একে মানুষের রোগ নিরাময়ের কাজে লাগান সম্ভব হবে না। এর্লিক তাঁর রসায়নবিদ্ সহকারীদের সাহায্যে আর্সেনিকের ফরমূলা নানাভাবে অদলবদল করে কয়েক শত বিভিন্ন রকম কম্পাউণ্ড তৈরী করলেন। সেগুলি বিভিন্ন রোগে পরীক্ষা করে দেখলেন যে তার বেশীর ভাগই কোন কাজের নয়। কোনটির হয়ত বিষক্রিয়া বেশী, আবার কোনটির হয়ত জীবাণু মেরে ফেলার ক্ষমতা নেই। তাঁর এক জাপানী সহকারী লক্ষ্য করেন ৪১৮নং কম্পাউণ্ড 'ঘুমরোগে' ভাল ফলপ্রদ। এসব হোল ১৯০৫-১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। কাজ না পেলেও কোন আর্সেনিকের কম্পাউণ্ড তিনি ফেলে দিলেন না, নম্বর অনুযায়ী প্রত্যেকটি সাজিয়ে রেখে অন্য কাজে হাত দিলেন। দু বছর পরে তাঁর নতুন একজন জাপানী সহকারী ডাঃ হাতা দেখতে পেলেন ৬০৬নং কম্পাউণ্ড খরগোশের উপদংশ রোগে ভাল ফল দিয়েছে। ডাঃ হাতা এই ঘটনা তাঁর গুরুর নজরে আনেন। এর্লিক খুব আশ্চর্য হয়ে বলেন, 'চলো আমি পরীক্ষা দেখবো।' দেখা মানে শুধু 'দেখা' নয়। দেখা, আবার দেখা, বার বার অনুসন্ধান করে নিশ্চিন্ত হলেন পল এর্লিক। খরগোশের মত ছোট প্রাণীর শরীরে কোন বিষক্রিয়া হয়নি এবং কার্যকরীও বটে।

একটা কথা পল প্রায়ই বলতেন—"কোন বিষয়ে সাফল্য পেতে হলে চাই ধৈর্য্য, যোগ্যতা, অর্থ ও ভাগ্য।" নিজের কাজ দিয়ে তিনি এই প্রবাদ বাক্যের সত্যতা প্রমাণ করলেন। বিধবা ভদ্রমহিলার অর্থ যোগ্য হাতে এসে কাজে লাগল। তাঁর ধৈর্যও ছিল অসীম ; একটা কম্পাউণ্ডকে ৬০৬ রকমভাবে পরিবর্তন করা সহজ কাজ নয়। আর ভাগ্যের কথা তো অনস্বীকার্য—কারণ, ভাগ্য প্রথম থেকেই তাঁর সহায়ক। প্রথম, যক্ষারোগ-

বীজাণুর স্লাইড ভুল করে গরম করা ; দ্বিতীয়, তাঁর নিজের ক্ষয়রোগ থেকে সেরে ওঠা ; কারণ সে যুগে কোন ওষুধ ছিল না এবং সব শেষে আর্সেনিক-এর কম্পাউণ্ডগুলো ফেলে না দিয়ে ডাঃ হাতা যে ধুলো ঝেড়ে সেগুলি নিয়ে আবার পরীক্ষা চালালেন, সেটা কি কম ভাগ্যের কথা !

সাফল্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে ডাঃ এর্লিক ১৯শে এপ্রিল, ১৯১০ খ্রীঃ বিশ্ববিজ্ঞানী সমাজে এই ঘটনার কথা প্রকাশ করলেন। সকলে একেবারে চমকিত—উদ্বেলিত, যাক, তাহলে এতদিনে 'ম্যাজিক বুলেট'-এর স্বপ্ন সত্য হোল। এর্লিক কিন্তু এর আগে ১৯০৮ খ্রীঃ নোবেল পুরস্কার পেয়ে গেছেন—রক্তের শ্বেতকণিকার স্বভাবধর্ম নিয়ে। এবারে আর তিনি নোবেল পুরস্কার পেলেন না বটে, তবে বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টরেট উপাধি দিয়ে ভূষিত করে ; বিভিন্ন বিজ্ঞানী সংস্থা তাঁকে করলো সম্মানিত সদস্য। যে রাস্তায় তাঁর গবেষণাভবন সেই রাস্তার নাম হোল পল এর্লিক স্ট্রাসে। প্রবন্ধের শুরুতে যে সভার কথা বলা হয়েছে, সেই সভাতেই ডাঃ এর্লিক তাঁর নতুন আবিষ্কার এবং কিভাবে সেই ওষুধ ব্যবহার করা যাবে, সে বিষয়ে দেশের চিকিৎসক ও বিজ্ঞানী সমাজকে জানিয়েছিলেন। ডাঃ এর্লিকের মৃত্যু হয় ১৯১৫ খৃঃ। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর ৬০৬ কম্পাউণ্ড আরও উন্নত হয় এবং সেই কম্পাউণ্ড-৯১৫, মানুষের রোগ নিরাময় ও দুঃখ নিবারণে এখনও নিয়োজিত।

ডাঃ এর্লিকের মৃত্যুর পরেও বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে গবেষণা চলতে থাকে, শত শত কম্পাউণ্ড তৈরী হতে থাকে, পরীক্ষা হতে থাকে। কোনটির কাজ হয়ত আশাপ্রদ, কিন্তু বেশীর ভাগই দেখা গেল অপ্রয়োজনীয় ও নিরর্থক। যাই হোক, ১৯২৭ খ্রীঃ জেরাল্ড ডোমেক নামে আর একজন জার্মান বিজ্ঞানী এর্লিকের মত এনিলিন রং নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন। যেহেতু তিনি চিকিৎসক, সেইজন্য সহকারী হিসাবে দুজন রসায়নবিদকে সঙ্গে নিলেন। কিন্তু কি বিষয়ে কাজ শুরু করা হবে, এত রকম কম্পাউণ্ড তখন তৈরী হয়েছে, যা মানুষকে বিভ্রান্ত করার পক্ষে যথেষ্ট। তাঁরা ঠিক করলেন দুটি নাইট্রোজেন অ্যাটম সমন্বিত এজো রং নিয়ে গবেষণা করবেন। কারণ তাঁরা অন্য একজন বিজ্ঞানীর এক জাতীয় হলুদ রং 'ক্রাইসোডিন'

ব্যবহারে কয়েকটি রোগে সাফল্যের কিছু সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন। এর আগে ১৯০৯ খৃঃ কাপড় রং করার রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করতে গিয়ে হোরলিন ও তাঁর সহযোগীরা লক্ষ্য করেছিলেন যে, এর সঙ্গে সালফোনা-মাইড গ্রুপ-এর একটি পদার্থ মেশালে তার কার্যকারিতা আরও বাড়ে। শেষ পর্যন্ত ডোমেক ও তাঁর সহকর্মীরা অ্যাজো ডাই-এর সঙ্গে সালফোনা-মাইড সংযোগ করে এমন এক ওষুধ আবিষ্কার করলেন, যা চিকিৎসা জগতে এক বিরাট পরিবর্তন সূচনা করে। এই নতুন ওষুধ তাঁরা সর্বপ্রথম ব্যবহার করলেন স্ট্রেপটোকক্কাই নামে এক রোগজীবাণুর কালচার প্লেটে। এই জীবাণু মানুষের শরীরে ঘা, ফোঁড়া, হার্টের অসুখ ইত্যাদি ভয়াবহ রোগ সৃষ্টি করে। কালচার প্লেট-এ পরীক্ষায় আশাতীত ফল পেলেন ডোমেক। দারুণ উৎসাহ আর আশা নিয়ে ইঁদুরের শরীরে স্ট্রেপটোকক্কাই জীবাণু ইঞ্জেকশন দিলেন। তার পরে কিছু ইঁদুরকে তাঁর তৈরী এজো রং সালফোনামাইড মিশ্রিত রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করলেন, আর বাকি ইঁদুরগুলিকে 'কন্‌ট্রোল' হিসাবে রেখে কোন ওষুধ দিলেন না। চমৎকার কাজ হোল। চিকিৎসিত সবকটি ইঁদুর বেঁচে গেল। আর যাদের চিকিৎসা হয়নি তার সবগুলি মরে গেল। এটা ১৯৩২ খ্রীঃ-এর ঘটনা। ডোমেক কিন্তু তড়িঘড়ি একথা কোথাও জানালেন না। আরও পরীক্ষা চালাতে লাগলেন—নানাভাবে, বিভিন্ন কালচার প্লেটে, নানা রকম জন্তুর ওপর পরীক্ষা চলতে থাকল। মানুষের শরীরে ব্যবহারের আগে তো নিশ্চিত হতে হবে—এর কোন বিষক্রিয়া আছে, না নেই। সেইজন্যই নানাভাবে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হবার জন্য দীর্ঘ তিন বছর পরীক্ষা নিরীক্ষা করে, অবশেষে ১৯৩৫ খ্রীঃ তাঁরা বিশ্ববাসীকে জানালেন—এই সাফল্যের কথা। কম্পাউণ্ডটির রং লাল ছিল বলে নাম দিলেন 'প্রোনটোসিল রুব্রাম' অথবা লাল রং-এর প্রণ্টোসিল। এটা খুব বেশী দিনের ঘটনা নয়, এখন যাঁরা বৃদ্ধ বা প্রবীণ বয়সের, তাঁদের মধ্যে অনেকেই হয়তো তাঁদের প্রথম জীবনে এই ওষুধ ব্যবহার করেছেন। নিউমোনিয়া, মেনিনজাইটিস, সন্তান হওয়ার পরে মায়ের জ্বর বা স্ট্রেপটোকক্কাশ জীবাণুঘটিত যে কোন অসুখ এবং আরও অনেক রকম রোগে এর কার্যকারিতা প্রমাণিত হল।

এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য ডোমেকের নামে নোবেল পুরস্কার ঘোষিত হলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছু আগে। তখন জার্মানীতে চলছে হিটলারী শাসন। জার্মান সরকারের নির্দেশে তিনি পুরস্কার নিতে পারেন নি। কিন্তু সেজন্য ডাঃ ডোমেকের কোন ক্ষোভ ছিল না। কারণ এই আবিষ্কারের পুরস্কার তিনি আগেই পেয়েছিলেন। তবে অন্য ভাবে, এবং সেটা মূল্যের নিরিখে বিচার করা কোনমতেই সম্ভব ছিল না। ডাঃ ডোমেকের মেয়ের বাঁ-হাতের আঙ্গুলে সেলাই করবার সময় ছুঁচ ফুটে যায়। কিন্তু সেই সামান্য দুর্ঘটনা কয়েক দিনের মধ্যে মারাত্মক রূপ নেয় এবং মেয়ের হলো জীবন সংশয়। তখনও প্রণ্টোসিল রুব্রাম-এর কথা অনেকেই ভালভাবে জানেন না। ল্যাবরেটরীর চার দেওয়ালের বাইরে মাত্র অল্প কয়েকজন ডাক্তার এই ওষুধের কথা জানতেন। এদিকে মেয়ের অবস্থা ক্রমশঃ চলেছে খারাপের দিকে। বাঁচবার আর কোন আশা দেখা যাচ্ছে না। অন্য যে সব চিকিৎসক বন্ধুরা মেয়েকে দেখতে আসতেন, ডোমেক তাঁদের কাছে তাঁর নব-আবিষ্কৃত প্রণ্টোসিল ব্যবহারের অনুমতি চাইলেন, কিন্তু তাঁরা সকলেই তাঁকে প্রণ্টোসিল ব্যবহার করতে নিষেধ করলেন। তাঁদের বক্তব্য হলো—যে ওষুধ এখনও পরীক্ষামূলক অবস্থায় আছে, সেই ওষুধ গিনিপিগের মতো নিজের মেয়ের শরীরে ব্যবহার করা অনুচিত। কিন্তু ডাঃ ডোমেকের বক্তব্য ছিল খুব কঠোর, তবে বাস্তব। তিনি বলেছিলেন যে যদি তাঁর মেয়ের বাঁচার সামান্য সম্ভাবনাও থাকে, তিনি ওই ওষুধ ব্যবহারে বিরত থাকবেন। কিন্তু প্রণ্টোসিল ব্যবহার করে সে যদি রোগমুক্ত হয় তাহলে সেটা হবে খুবই আনন্দের। আর তা না হলে সে দুদিন আগে মরবে। কিন্তু তাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। বরং সে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে। ক'জনের বাবা এইরূপ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এরূপ কঠিন সমস্যার মোকাবিলা করতে সাহস করবেন? তাঁর দৃঢ়তা দেখে অন্য চিকিৎসকেরা নতি স্বীকার করে প্রণ্টোসিল ব্যবহার করতে অনুমতি দিলেন। সকলকে আশ্চর্য করে মেয়ের রোগ কমতে শুরু হোল। মেয়ের মুখে হাসি ফুটল। সে সম্পূর্ণ সুস্থ হোল। নোবেল পুরস্কার পেলেন না বটে, কিন্তু নিজের তৈরী ওষুধে নিজের সন্তানকে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে

ফিরিয়ে আনার ঘটনা ইতিহাসে বোধ হয় নজিরবিহীন। এই প্রসঙ্গে আরও একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যা বিশ্বের রাজনীতির ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, তৎকালীন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিল উত্তর আফ্রিকা সফরকালে নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হন। জার্মান সরকার যদিও প্রন্টোসিল ফরমুলা গোপন রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা গোপন থাকেনি। বৃটিশ বিজ্ঞানীরা বসে ছিলেন না। তাঁরা গবেষণা করে প্রন্টোসিল-এর চেয়ে উন্নত, বেশী কার্যকরী ওষুধ আবিষ্কার করেছিলেন এবং তার নাম ছিল এম. বি ৬৯৩। এই ওষুধ ব্যবহারে চার্চিলের রোগ সেরে যায়। সেই সময় চার্চিলের মৃত্যু হলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিণতি কোন পথে যেত তা বলা কঠিন এবং এশিয়া ও আফ্রিকার যে সব দেশ আজ পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচন করেছে, তাদের পরিণতি কি হতে পারত তা কেবলমাত্র অনুমানসাপেক্ষ।

লেভার্ন ঃ রস ঃ গ্রাক্সী

১৯৭৯-র জানুয়ারী মাসে কলকাতা শহরে চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়েছিল। সভায় আলোচনার বিষয় ছিল একটি মাত্র রোগ, যার নাম—"ম্যালেরিয়া"। আজ যাঁরা মধ্যবয়সী বা বৃদ্ধ, ম্যালেরিয়া রোগ সম্বন্ধে তাঁদের বেশ অভিজ্ঞতা আছে, কিন্তু যাদের বয়স কম, তাদের মধ্যে অনেকেরই হয়ত ম্যালেরিয়া রোগ সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা ছিল না। যদিও দুঃখের কথা, এই রোগটি আবার নতুন করে ফিরে এসেছে।

ম্যালেরিয়া কথাটি এসেছে ম্যাল (খারাপ) এয়ার (বাতাস) কথা দুটি যোগ করে। দু'হাজার বছরেরও আগে গ্রীস দেশের খ্যাতনামা চিকিৎসক হিপোক্রেটিস (খ্রীঃ পূঃ ৪৬০-৩৭০) লক্ষ্য করেন, যেখানে বদ্ধ জলা, জঙ্গল, সেই এলাকার আশেপাশে বিশেষ এক ধরনের জ্বর হয়। সেই জ্বর খুব শীত করে আসে, আবার কয়েক ঘণ্টা পরে ঘাম দিয়ে ছেড়ে যায়। তাঁর মনে হয়েছিল, খারাপ জল হাওয়ার জন্য এই রোগ, সেই কারণে এই জ্বরের নাম দিয়েছিলেন 'ম্যালেরিয়া'। সেদিন ম্যালেরিয়া রোগের সঠিক কারণ তাদের জানা ছিল না। কিন্তু প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে আমাদের দেশের বিখ্যাত চিকিৎসক শুশ্রুত তাঁর 'শুশ্রুত-সংহিতা' গ্রন্থে লিখেছিলেন—কোন কোন স্থানে খুব বেশী সংখ্যায় মশা দেখা যায় এবং সেখানে যে সব লোক বাস করে তাদের খুব শীত করে এক ধরনের জ্বর হতে দেখা যায়। তখন অনুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার হয় নি, বিজ্ঞান তখন এত অগ্রসর হয় নি, তা সত্ত্বেও শুশ্রুত ম্যালেরিয়া জ্বরের জন্য মশাকে সন্দেহ করেছিলেন, সেটাই আশ্চর্য।

প্রায় দু হাজার বছর আগে হিপোক্রেটিসের শিষ্য গ্যালেন (১৩০-২০০ খ্রীঃ) গ্রীস দেশ ছেড়ে রোমের রাজসরকারে চাকরী নিলেন। রোমান সম্রাট তখন বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখছেন; বিরাট তাঁর সৈন্য দল, কিন্তু তাদের মধ্যে

রোগের প্রকোপ খুব বেশী। গ্যালেনের চাকরি হোল রোমান সৈন্য-বাহিনীর চিকিৎসক হিসাবে। গুরুর মতন গ্যালেনও বিশ্বাস করতেন বদ্ধ জলার খারাপ বাতাস থেকে ম্যালেরিয়া হতে পারে। তিনি নালা কাটিয়ে বদ্ধ জলার জল নিকাশের ব্যবস্থা করলেন ভূমধ্যসাগরে অথবা নিকটের কোন নদী বা খালে। এর ফলে ম্যালেরিয়া রোগ বেশ কিছুটা কমে গেল। রোগের কারণ ঠিকমত না জেনেও গ্যালেন রোগ কমিয়ে ফেলতে সক্ষম হলেন এবং প্রচুর সুনাম পেলেন।

গ্যালেনের সময় থেকে ১৮৮০ খ্রীঃ পর্যন্ত দুই-একজন বিজ্ঞানী ছাড়া ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে নতুন তথ্য বিশেষ কেউ আর আবিষ্কার করতে পারেন নি। অবশেষে ১৮৮০ খ্রীঃ ৬ই নভেম্বর অধ্যাপক চার্লস লুই আলফানসো লেভার্ন নামে এক ফরাসী চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ম্যালেরিয়া পরজীবী আবিষ্কার করলেন। ডাঃ লেভার্নের জন্ম ১৮৪৫ খ্রীঃ ১৮ই জুন। বাবা ছিলেন নেপোলিয়ানের সামরিক বাহিনীর অফিসার। মামার বংশেও সামরিক বাহিনীর জেনারেল ছিলেন দাদামশায়। লেভার্ন পাস করার পরে সামরিক বাহিনীতে যোগ দেন এবং ১৮৭৪ খ্রীঃ সামরিক মেডিকেল কলেজে অধ্যাপক হন। ১৮৮০ খ্রীঃ ২০শে অক্টোবর এক ম্যালেরিয়া রোগীর রক্ত পরীক্ষা করছিলেন তিনি, সুদূর আফ্রিকার উত্তর অঞ্চলে আলজিয়ার্স রাজ্যে কনসটানটাইন শহরে। রোগীর রক্তে অস্বাভাবিক কিছু কালো কালো কণিকা দেখলেন তিনি। নিজের মনে প্রশ্ন করলেন এগুলো কি হতে পারে! সুস্থ লোকের রক্তে তো এমন জিনিস কখনও তাঁর নজরে পড়ে নি। তবে কি এগুলো ম্যালেরিয়া জীবাণু? আরও ৪৪ জন রোগীর রক্ত নিয়ে পরীক্ষা করলেন তিনি। রোজ রক্তের স্লাইডে অনুবীক্ষণ যন্ত্রে রেখে চোখ দিয়ে বসেন তিনি। ২৬ জন রোগীর রক্তে ঐ জাতীয় কালো কণিকা দেখতে পেলেন। ২৪শে ডিসেম্বর তিনি হাসপাতালের চিকিৎসকদের এই ঘটনা জানালেন এবং রক্তের স্লাইডও তাঁদের দেখালেন। যাঁরা লেভার্নের দাবি অবিশ্বাস করেছিল, তাঁরাও বিশ্বাস করতে বাধ্য হল যে ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু আছে।

শেষ পর্যন্ত ম্যালেরিয়া জীবাণু আবিষ্কার হোল। কিন্তু এরা মানুষের

শরীরে কিভাবে প্রবেশ করে ? সেই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গিয়েছিল আরও ১৮–১৯ বছর পরে। আগেই বলা হয়েছে, শুশ্রুত ম্যালেরিয়ার সঙ্গে মশার সম্পর্ক থাকা সম্ভব বলে মনে করেছিলেন। হিপোক্রেটিস বদ্ধ জলায় খারাপ বাতাসের (যেখানে প্রচুর সংখ্যায় মশা থাকা সম্ভব) কথা চিন্তা করছিলেন, কিন্তু কোন প্রমাণ তাঁরা দেন নি। তাঁদের গভীর দূরদৃষ্টি ছিল, তাঁরা যা অনুমান করেছিলেন, পরে তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল। ম্যালেরিয়া জীবাণু কিভাবে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে, এই তথ্য আবিষ্কারে তিনজন বিজ্ঞানীর বিশেষ অবদান আছে। প্রথমে যাঁর নাম উল্লেখ করা উচিত তিনি হলেন ডাঃ প্যাট্রিক ম্যানসন। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৮৪৪ খ্রীঃ ৩রা অক্টোবরে, স্কটল্যাণ্ডের এবার্ডিন শায়ারে। ডাক্তারী পাশ করার পরে তিনি পূর্ব এশিয়ার প্রথমে ফরমোসা দ্বীপে এবং পরে এময় শহরে কাজ করেছিলেন। এখানে তিনি গবেষণা করে প্রমাণ করেছিলেন যে ফাইলেরিয়া (গোদ, সাধারণতঃ যে রোগে পা ফোলে) রোগের বাহন হল এক জাতীয় মশা। এই তথ্যটি গবেষণা ক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণীয়। কারণ মশা, মাছি প্রভৃতি যে কোন প্রকার রোগের বাহন হতে পারে, তার প্রথম প্রমাণ পাওয়া গেল এই গবেষণা থেকে। এই গবেষণার বিষয় তিনি ১৮৭৯ খ্রীঃ প্রকাশ করেন। তার পরে ম্যানসন ম্যালেরিয়া রোগের কারণ অনুসন্ধান করতে আরম্ভ করলেন। তিনি শহর, গ্রাম, মাঠ, জলা-জঙ্গল সব জায়গায় গেলেন। তাঁরও চোখে পড়ে জলার আশেপাশে ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপ বেশী। তখন ১৮৮৬ খ্রীঃ; তাঁর কাছে লেভার্নের আবিষ্কারের বিষয় তখনও অজ্ঞাত। কারণ সে যুগে সংবাদ প্রচারের সুযোগ ছিল খুব সীমাবদ্ধ। খারাপ জলহাওয়া এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁর শরীর খারাপের দিকে যাচ্ছিল, ফাইলেরিয়ার বাহন আবিষ্কারের পরে তিনি আর খুব বেশি অগ্রসর হতে পারেন নি। কিন্তু তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে মশার সঙ্গে ম্যালেরিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কিন্তু কীভাবে, সেটা তিনি জানতে পারেন নি। দেশে ফিরে এলেন ১৮৮৯ খ্রীঃ। পরের বছর লণ্ডনে তিনি অধ্যাপক লেভার্নের আবিষ্কার করা ম্যালেরিয়া জীবাণু প্রথম দেখলেন তাঁর এক সহকর্মীর কাছে। তিনি

আবার সেই স্লাইড এনেছিলেন ইতালীর এক অধ্যাপক ডাঃ গ্রাজীর কাছ থেকে। ম্যালেরিয়া বিষয়ে এই ডাঃ গ্রাজীর বিরাট অবদান আছে। কিন্তু নিজের দেশ ছাড়া পৃথিবীর অন্যত্র তাঁর অবদান উপেক্ষিত।

আরও চার বছর পরে ডাঃ ম্যানসন এলেন ডাঃ রোনাল্ড রসের সংস্পর্শে। ম্যানসনের তখন বয়স হয়েছে বেশী খাটবার ক্ষমতা নেই। তিনি বোধ হয় রসের দ্বারা তাঁর অসমাপ্ত কাজ পূর্ণ করার স্বপ্ন দেখে-ছিলেন। রসকে তিনি একজন বড় বিজ্ঞানী হয়ে উঠতে সাহায্য করে-ছিলেন। রস ডাঃ ম্যানসনকে গুরু হিসাবে দেখতেন। তিনি বলতেন —'আপনি আমার দূরবীন, আপনার মধ্য দিয়ে আমি অজানা রহস্য জানবার চেষ্টা করি।'

গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক প্রথম দিকে বেশ ভালো ছিল, কিন্তু শেষের দিকে এই সম্পর্ক তিক্ত হয়েছিল।

রোনাল্ড রসের জন্ম ভারতেরই মাটিতে হিমালয়ের পাদদেশে আলমোড়ায়; ১৮৫৭ খ্রীঃ ১৩ই মে তারিখে সিপাহী বিদ্রোহের বছরে। বাবা স্যার ক্যাম্পবেল রস ছিলেন ব্রিটিশ-সৈন্যবাহিনীর জেনারেল, ঠাকুর-দাদাও ছিলেন জেনারেল, তবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যদলে। ছেলের লেখাপড়া যাতে ঠিকমত হয়, সেইজন্য রসকে বৃটেনে পাঠিয়ে দিলেন। তখন রসের বয়স দশ বছরও হয় নি। কিন্তু বাবা লেখাপড়া শেখাতে চাইলে কি হবে, রসের লেখাপড়াতে একেবারেই মন ছিল না। কোন রকমে স্কুলের লেখাপড়া শেষ করে ১৮৭৪ খ্রীঃ ২৯শে অক্টোবর সেন্ট বার্থালোমিউ হাসপাতালে ভর্তি হলেন ডাক্তারী পড়তে। কিন্তু পড়া তাঁর ভাল লাগত না; ভাল লাগত কবিতা, গান আর ছবি আঁকা। খটমটে ল্যাটিন ভাষা, রোগীর বিছানার পাশে বসে তার দুঃখকষ্টের ফিরিস্তি শোনা তাঁর অসহ্য মনে হোত। ওসব পড়ে কি হবে? ইউরোপে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নূতন কি আবিষ্কার হচ্ছে তা জানবার কোন ইচ্ছা নেই তাঁর। সময় কাটছে কবিতা লিখে, গান আর স্বরলিপি লিখে। কিছুদিন বাদে খেয়াল হল নাটক লিখবেন। লেখাপড়া শিকেয় তুলে নাটক লিখে ফেললেন। কিন্তু অবুঝ প্রকাশকরা কেউই সে নাটক প্রকাশ করতে

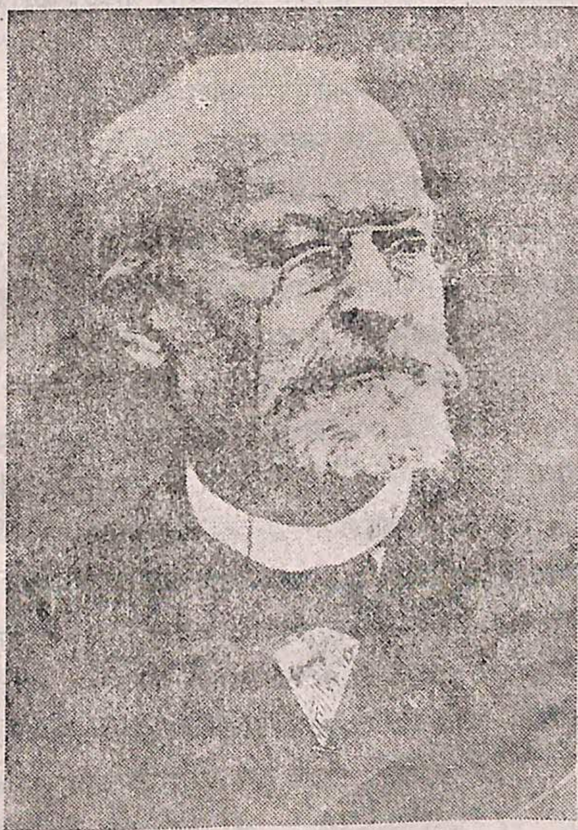
এগিয়ে এল না। সেজন্য কি দমে যাবেন রস? মোটেই না। নিজেই পয়সা খরচ করে নাটক প্রকাশ করলেন। কিন্তু পাঠকরা কেউ আগ্রহ করে সেই নাটক কিনতে এগিয়ে এল না। এদিকে পরীক্ষা হচ্ছে, কখনও তিনি পরীক্ষায় বসছেন না, আর কখনও পরীক্ষা দিয়ে অকৃতকার্য হচ্ছেন। বাবার কানে এলো ছেলের কীর্তিকলাপ। রাগ করে লিখলেন—'দেখ বাপু, যদি পড় তবে টাকা পাঠাবো, না হলে টাকা বন্ধ করব।'

রস পড়লেন বিপদে। শেষে এক জাহাজে চাকরি নিয়ে লণ্ডন-নিউইয়র্কের পথে পাড়ি দিলেন। জাহাজে নানা ধরনের লোক; তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন, তাঁদের মন বুঝবার চেষ্টা করেন, আর সুযোগ পেলেই কবিতা লেখেন। ফিরে এসে আবার পড়া শুরু করে অবশেষে ডাক্তারী পাশ করলেন। তার পরে ভারতীয় মেডিকেল সার্ভিসে চাকরির জন্য পরীক্ষা দিলেন এবং পাশও করলেন।

ভারতে এসে রস কিন্তু খুব খুশী, যদিও গরমটা একটু কষ্টদায়ক। কিন্তু কাজ খুবই কম। সাহিত্যচর্চার প্রচুর সময় পেলেন তিনি। আগামী দিনের এক বড় বিজ্ঞানীর জীবনের শুরু হল এইভাবে। রসের ধারণা ভারতে কাজ নেই, কিন্তু সত্যিই কি তাই? তাঁর কর্মস্থল মাদ্রাজে। তখন আশেপাশে পচা পুকুর জলা ডোবার অভাব নেই। কলেরা সেখানে প্রায় নিত্যদিনের সঙ্গী, রোজ ম্যালেরিয়া নিয়ে কত রোগী আসছে, কত লোক নিত্য মারা যাচ্ছে। কিন্তু তা দেখবার চোখ থাকা চাই, শুনবার কান থাকা চাই, গুরুত্ব অনুভব করার মানসিকতা থাকা চাই। রস তখন তো আর বিজ্ঞানী নন, নিত্য দেখা এই সব ঘটনা তাঁর মনে কোন রকম রেখ পাত করে না। এই ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করার ক্ষমতা তাঁর তৈরী হয় নি। নিজের খেয়াল খুশী মত কবিতা, নাটক, উপন্যাস লেখা, ছবি আঁকা, আবার কখনও হয়ত অঙ্কের ধাঁধা নিয়ে সময় কাটাচ্ছেন। পৃথিবীর কোথায় কি আবিষ্কার হচ্ছে, তা নিয়ে তাঁর কোন মাথাব্যাথা নেই।

কিছুদিন বাদে তাঁর বদলির নির্দেশ এল ব্রহ্মদেশ যেতে হবে। তখন ব্রহ্মদেশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেখানে কয়েকটি কঠিন অপারেশন ভালভাবে করলেন। কিন্তু যত ভাল কাজই করুন না কেন কারো মনে

তাঁর সেই ভাল কাজ রেখাপাত করে নি। শেষে তিনিও বিরক্ত হয়ে ভাবলেন ভাল কাজ করে যদি সুনাম না হয়, তাহলে কাজ করে কি হবে? ছুটি নিয়ে চললেন ইংল্যাণ্ডে ১৮৮৮ খ্রীঃ। সেখানে বিয়ে করলেন মিস রোজা ব্লকসাম নামে এক মহিলাকে। আবার ফিরে এলেন ভারতে। অস্থিরচিত্ত, কি করি? উপন্যাস লিখলেন, শর্টহ্যাণ্ড পদ্ধতির বিন্যাস করতে লাগলেন, কিছুদিন গলফ ক্লাবের সম্পাদক হলেন, কিন্তু নিজের কাজের বেলায় মন বসে না। কানে এসেছে যে ফ্রান্সের সামরিক বাহিনীর কে এক ডাঃ লেভার্ন নাকি ম্যালেরিয়া জীবাণু আবিষ্কার করেছেন। তিনি ম্যালেরিয়া রোগীর রক্তে ম্যালেরিয়া পরজীবী খুঁজতে লাগলেন। অণুবীক্ষণ



অধ্যাপক লেভার্ন

যন্ত্রে দেখা খুব অভ্যাস নেই, পরজীবী খুঁজে পেলেন না। খুঁজে পাওয়াও সহজ নয় ; কষ্ট করতে হবে, শিখতে হবে, সাধনা চাই। রসের কিন্তু অত ধৈর্য নেই। তিনি অল্প সময়েই সিদ্ধান্ত নিলেন, লেভার্ন ভুল করেছেন, ম্যালেরিয়ার পোকা বলে কিছুই নেই, আসলে ওটা-পেট গরমের জ্বর। শুধু ভাবা নয়—চিকিৎসা বিজ্ঞান পত্রিকায় এ নিয়ে চারটি প্রবন্ধ লিখে ফেললেন। রসের বিজ্ঞান সাধনার আরম্ভ এইভাবে এই ভুলের মধ্য দিয়ে।

কিন্তু রোনাল্ড রস যখন ঠিক পথ খুঁজে পেলেন, তখন তিনি একেবারে অন্য মানুষ ; আগের মত অশান্ত নয়, কাজে তার দারুণ উৎসাহ। ১৮৯৪ খৃঃ তিনি আবার লণ্ডন গিয়েছিলেন, সেই সময় তাঁর পরিচয় হল ডাঃ প্যাট্রিক ম্যানসনের সঙ্গে। চীন দেশে থাকার সময়ে ডাঃ ম্যানসন দেখেছিলেন যে, মশা ম্যালেরিয়া রোগীকে কামড়ায় এবং রক্ত শোষণ করে। তিনি মনে ভেবেছিলেন যে রক্তের সঙ্গে ম্যালেরিয়া পরজীবী মশার শরীরে যায় এবং বোধ হয় সেই জীবাণু মশার পেটে বৃদ্ধি পায়। তাঁর এই মতবাদ কিন্তু সেই কালের খ্যাতনামা চিকিৎসকরা কেউ বিশ্বাস করতেন না ; বরং এজন্য অনেকে তাঁকে উপহাস করতেন। এমন লোকের সঙ্গে আলাপ হোল রোনাল্ড রসের, যাঁকে তাঁর সহকর্মীরা ছিট-গ্রস্ত বলে অবজ্ঞা ও উপহাস করত। মশা সম্বন্ধে ম্যানসনের কিছু ভুল ধারণা ছিল সত্য, কিন্তু তিনি রসের ভুল সংশোধন করে গবেষক হিসাবে তাঁর কি কাজ করতে হবে, সেই নিশানা ঠিক করতে সাহায্য করেছিলেন। ডাঃ ম্যানসন তাঁর শিষ্য রসকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ম্যালেরিয়া পরজীবী দেখালেন ; যা প্রায় ১৪ বছর আগে ডাঃ লেভার্ন আবিষ্কার করেছিলেন এবং ডাঃ রস যা আগে বিশ্বাস করেন নি। প্রাচ্যদেশ থেকে আসা নাবিকদের লোহিত কণিকার মধ্যেও তাঁরা এই পরজীবী দেখেছিলেন। তাঁরা আরও লক্ষ্য করেছিলেন যে রোগীর যখন কাঁপুনি হয় তখন সেই লোহিত কণিকা ফেটে যায় এবং ঐ জীবাণুরা রক্তের তরল অংশের সঙ্গে মিশে যায়। রস তো এই সব দেখে একেবারে তাজ্জব। ম্যানসন আরও দেখালেন যে ম্যালেরিয়া রোগী ছাড়া আর কারো রক্তে

এই জাতীয় পরজীবী দেখা যায় না। 'কিন্তু সমস্যা কি জান?' ম্যানসন বললেন, 'একজন রোগী থেকে অপর একজন সুস্থ মানুষের শরীরে এরা কিভাবে যায়? আমার কি মনে হয় জান? মশা তার জীবনে একবারই রক্ত শোষণ করে এবং রক্তের সঙ্গে ম্যালেরিয়া জীবাণু মশার পেটে যায়। পরে সেই জীবাণু শুঁড়ের মত আকার নেয় এবং পাকস্থলী ফুটো করে মশার শরীরে প্রবেশ করে। তার পরে ম্যালেরিয়া পরজীবীরা এক প্রকার খোলস তৈরি করে, মশা কিন্তু এর পরে মরে যায়, জলে পড়ে, আর সেই জল যে পান করে তার ম্যালেরিয়া হয়।'

ডাঃ ম্যানসনের এই ধারণার কিছুটা ছিল ঠিক, আবার কিছুটা ছিল ভুল। তবে ডাঃ রসের মশা সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা ছিল না। যেটুকু জানতেন তা খুব ভাসাভাসা, কোনদিন গভীরে প্রবেশ করেন নি। ম্যানসনের উপদেশ তাঁকে কাজে হাত দিতে অনুপ্রাণিত করল। তিনি তার দিনলিপিতে লিখেছেন, 'যে কাজ করতে চেষ্টা করেছি, সেখানেই ব্যর্থ হয়েছি। কিন্তু ব্যর্থতা আমাকে দমিয়ে দিতে পারবে না।' তিনি ভাবলেন, সকলে তাকে উপহাস করে, কিন্তু যদি মশা থেকে ম্যালেরিয়া হয়, এই তথ্য তিনি প্রমাণ করে দিতে পারেন, তবে যাঁরা তাকে উপহাস করেন, তাঁদের মুখের মত জবাব হবে। তিনি ম্যানসনকে আশ্বাস দিলেন 'আমি নিষ্ঠার সঙ্গে এই তথ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবো। তবে আপনি আমাকে সর্বপ্রকারে এই কর্তব্য পালনে সাহায্য করবেন এই আশা আমি রাখি।'

পরের বছর মার্চ মাসে স্ত্রী ও সন্তানদের ইংল্যাণ্ডে রেখে ডাঃ রস ভারতে ফিরে এলেন। আসবার আগে মশা সম্বন্ধে জেনে নেওয়ার জন্য লণ্ডনে বই-এর দোকানে দোকানে ঘুরলেন। কিন্তু মশার বিষয়ে একটিও বই পেলেন না। ভেবেছিলেন, ফিরে আসার সময় জাহাজে মশা সম্বন্ধে কিছু পড়ে নেবেন। তা তো হোল না। তাই বলে কি ডাঃ রস সময় নষ্ট করবেন? নাঃ জাহাজে আরশুলা ছিল, তাই কেটে দেখলেন। জাহাজের ডেকে একটা উড়ুক্কু মাছ লাফিয়ে এসেছিল, সেটা কেটে দেখলেন।

ভারতে ফিরে তিনি সেকেন্দ্রাবাদে কাজে যোগ দিলেন। মশা ও ম্যালেরিয়া নিয়ে গবেষণার কাজও এবার শুরু করলেন। তার মধ্যে

আবার হাসপাতালে রোগী দেখার কাজও করতে হোত। নিরবচ্ছিন্ন অবাধ গবেষণার সুযোগ তিনি পান নি সেদিন। কেন? কারণ সেদিন কেউই তাঁকে একজন বিজ্ঞানী বলে মেনে নিতে পারেন নি। আর তাঁর উপর-ওয়ালারা তাঁকে একজন ভূঁইফোঁড় অপ্রকৃতিস্থ চিকিৎসক বলে মনে করতেন। রোগীরা তাঁকে দেখলেই পালাত। কারণ তিনি রোগী পেলেই আঙ্গুলে সূঁচ ফুটিয়ে রক্ত নিতেন। তাঁর সহকর্মী চিকিৎসকরা ম্যালেরিয়া পরজীবীর কথা বিশ্বাস করত না। একদিন এক ম্যালেরিয়া রোগী এনে হাজির করে রসকে তারা বলল, 'দেখাও তো দেখি তোমার ম্যালেরিয়া পরজীবী।' রক্ত নিয়ে পরীক্ষা করলেন ডাঃ রস, কিন্তু কোন জীবাণু দেখাতে পারলেন না। তিনি অপদস্থ হলেন, সহকর্মীরা উপহাস করলো তাঁকে। কিন্তু এই অপমান তাঁর সংকল্পকে মোটেই দমিয়ে দিতে পারে নি। তাঁর তখন জেদ চেপে গেছে। মশা ধরতে হবে। প্রমাণ করতে হবে, মশা থেকে ম্যালেরিয়া হয়। যত রকম মশা পাওয়া যায় ধরতে আরম্ভ করলেন, কোন রকম বাছবিচার নেই। কিউলেক্স, এডিস জাতের মশাকে ম্যালেরিয়া রোগীর রক্ত খাওয়ালেন। তাদের কামড়ে কিন্তু ম্যালেরিয়া হোল না। ১৮৯৭ খ্রীঃ এপ্রিলে নীলগিরি পাহাড়ে দেখলেন এক নতুন জাতের মশা—এনোফিলিস। সেই মশা ধরে এক রোগীকে উলঙ্গ করে মশারীর মধ্যে মশা ছেড়ে দিলেন। কিন্তু অবাধ্য মশাগুলো অসহযোগ করলো, রোগীকে না কামড়ে মশারীর গায়ে বসে থাকে, না হয় গুন গুন করে গান গায়। মহাবিপদে পড়লেন রস, নানা ভাবে চেষ্টা করলেন, কিছুতেই মশারা কামড়াবে না। শেষে করলেন কি মশারীটা জল দিয়ে ভিজিয়ে দিলেন। এবার কিন্তু মশারা রোগীর গায়ে বসল ও তাঁকে কামড়ে অস্থির করে তুলল। রস আবার সেই মশাগুলোকে বোতলে ভরে ফেললেন। তার পরে রোজ মশা বার করেন আর কেটে দেখেন তাদের পাকস্থলীতে ম্যালেরিয়া জীবাণু পাওয়া যায় কি না। এতদিন তিনি তড়বড় করে কাজে ভুল করেছেন, সেই ভুল থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। আগের মত হঠাৎ চট করে আর তিনি সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন না। শান্তভাবে দিনের পর দিন মশা কাটেন আর তার পাকস্থলী পরীক্ষা করেন অনুবীক্ষণ যন্ত্রে।

হঠাৎ একদিন ২০শে আগস্ট ১৮৯৭ খ্রীঃ তাঁর চোখে পড়ল মশার পাকস্থলীর গায়ে একটা যেন কাল আঁচিল। পরদিন, তার পরদিন যত মশা কাটেন দেখেন আঁচিল থেকে আবার শুঁড় বেরোচ্ছে। তাহলে তো এরা জীবিত; এরাই তাহলে ম্যালেরিয়া পরজীবী। সমস্ত বিষয় বিশদভাবে লিখলেন ডাঃ ম্যানসনকে। সাহিত্যিক মানুষ, ম্যালেরিয়া জীবাণু নিয়ে একটা কবিতা লিখে পাঠালেন বিলেতে স্ত্রীর কাছে।

চিঠির জবাবে ডাঃ ম্যানসন লিখলেন, 'রোগীকে কামড়াবার পরে মশাকে জলের কাছে রাখ; মশা সেই জলে ডিম পাড়বে, পরে সেই জল কোন সুস্থ মানুষকে খাওয়াও, তার ম্যালেরিয়া হবে।'

গুরু ডাঃ ম্যানসন বললেন আর শিষ্য ডাঃ রস তার চাকর লছমনকে খাওয়ালেন মশার ডিম সমেত জল। জ্বরও হোল, রস তো আনন্দে আত্মহারা হয়ে নেচে উঠলেন। কিন্তু সে আনন্দ স্থায়ী হল না। এ জ্বরের প্রকৃতি অন্য রকম, এ তো ম্যালেরিয়া নয়। ম্যানসন বলেছিলেন মশা মরে জলে পড়ে, সেই জল খেয়ে ম্যালেরিয়া হতে পারে; মশা পিষে খাওয়ালেন সুস্থ লোককে, কিন্তু ম্যালেরিয়া হোল না। রস অনুভব করলেন যে গবেষণা সহজ ব্যাপার নয়। টানা পরীক্ষা করতে হবে, তার মধ্য থেকে ব্যর্থতাকে বাদ দিয়ে আসলকে খুঁজে নিতে হবে।

কিন্তু ডাঃ রসের গবেষণা কাজে আবার বাধা পড়ল, তাঁকে এবারে বদলী করা হোল উত্তরে রাজপুতানায়। সেখানে মশা নেই, নেই ম্যালেরিয়া; নাড়ী টেপা, সর্দিজ্বর খোস-প্যাঁচড়ার চিকিৎসা করা, আর অবসর সময়ে মাছ ধরা; এইভাবে সময় কাটে। বদলি রদ করার জন্য ওপর মহলে আবেদন-নিবেদন সব ব্যর্থ হয়েছিল। ডাঃ ম্যানসনকে লিখেছিলেন রস, কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টাও ফলপ্রসূ হয় নি। ম্যানসন কিন্তু চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিছুদিন বাদে তাঁকে আবার বদলি করা হোল কলকাতার সেদিনের প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে, যা এখন এস. এস. কে. এম হাসপাতাল নামে পরিচিত।

রস কিন্তু কলকাতায় কাজ করার সুযোগ পেয়ে খুব খুশী হলেন। সেকেন্দ্রাবাদে কাজের সুযোগ ছিল খুবই কম। এখানে তিনি পেলেন



স্যার রোনাল্ড রস

ডাঃ কানিংহামের ভাল ল্যাবরেটারী, কয়েকজন সহকারী আর সবার ওপরে প্রচুর মশা। কিন্তু মশার কামড় খাওয়ার জন্য কোন স্বেচ্ছাসেবক পাওয়া গেল না। বিশেষ করে তখন এদেশে কলেরা ও প্লেগের টীকা দেওয়া আরম্ভ হয়েছে এবং তার জন্যে এখানে-ওখানে দাঙ্গা পর্যন্ত হয়ে গেছে। শেষে বিজ্ঞাপন দিলেন কিছু সাহায্যকারী চেয়ে ; মশা ধরতে হবে, মশার কামড় খেতে হবে। অল্প কিছু লোক এলো। তিনি তাদের ভিতর থেকে দুজনকে বেছে নিলেন। এর মধ্যে একজনের নাম মহম্মদ বক্স, অপর জনের নাম পূর্বানা ; কিন্তু পূর্বানা অল্পদিন পরেই কাজ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। মহম্মদ বক্সকে নালা, নর্দমা, খানা ডোবা নানা জায়গায় দেখতে পাওয়া যেত, জাল দিয়ে মশা ধরছে আর বোতলে ভরে

নিচ্ছে। মশা পাওয়া গেল, ম্যালেরিয়া রোগীও অনেক ; কিন্তু কামড় খাওয়ার লোক নেই। রস তখন অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন, কে ধৈর্য ধরে মশার কামড় সহ্য করবে। এই সময় বোধহয় ঈশ্বর তাঁকে সাহায্য করলেন। যে পরিশ্রমী এবং কর্মনিষ্ঠ, ঈশ্বর তাঁদেরই সাহায্য করেন। রস দেখলেন যে পাখীদেরও ম্যালেরিয়া হয় ; তাহলে মানুষ যখন পাওয়া যাচ্ছে না তখন পাখী নিয়েই গবেষণা করা যাক। পাখীর সমস্যা মহম্মদ বক্স সমাধান করে দিল, সে চড়াই, কাক আর ভরত পাখী ধরে আনল। যত্ন করে তাদের খাঁচায় রাখা হোল। খাঁচা ঢেকে ডাঃ রস দশটি ধূসর মশা ছেড়ে দিলেন তার ভিতর। ভরত পাখীর রক্তে ম্যালেরিয়া পরজীবী ভর্তি ছিল। এদিকে মহম্মদ বক্স বিড়াল তাড়াবার জন্য খাঁচা পাহারা দিচ্ছে। তিন দিন বাদে রস মশা কেটে দেখলেন তাদের পাকস্থলীর দেওয়ালে ম্যালেরিয়া পরজীবী, যেমনটি তিনি দেখেছিলেন এক বছর আগে সেকেন্দ্রাবাদে। রস এবার ডাঃ ম্যানসনকে লিখলেন, 'আমি সত্যিই গর্দভ ; কারণ আপনি অনেক আগেই পাখী নিয়ে কাজ করতে বলেছিলেন এবং আমি আপনার উপদেশ এতদিন শুনি নি।'

এর পরে মহম্মদ বক্স চড়াই পাখী নিয়ে এলো, তার থেকে ডাঃ রস তিনটি পাখী বেছে নিলেন। তাদের মধ্যে একটির রক্ত ছিল পরিষ্কার, কোন পরজীবী নেই, দ্বিতীয়টির রক্তে সামান্য এবং তৃতীয়টির রক্তে ম্যালেরিয়া পরজীবী ভর্তি। এদিকে মহম্মদ বক্স, সে তখন একজন ছোটখাট বিজ্ঞানী হয়ে গেছে, নতুন জন্মান মশা থেকে স্ত্রী মশা বেছে দিল। এই নতুন মশারা এখনও কোন ম্যালেরিয়া রোগীর রক্ত খাওয়ার সুযোগ পায় নি। সে তিনটি চড়াইকে আলাদা আলাদা খাঁচায় রেখে মশাগুলো তিনটি খাঁচার মধ্যে ছেড়ে দিল। যে চড়াই-এর রক্তে পরজীবী ছিল না, তার রক্ত খাওয়া মশার পাকস্থলীতে কোন পরজীবী পাওয়া গেল না ; আর যে চড়াই-এর রক্তে বেশী সংখ্যায় পরজীবী ছিল—তার রক্ত খাওয়া মশার পেটে প্রচুর পরজীবী পাওয়া গেল। দিনের পর দিন ডাঃ রস মশা কাটতে লাগলেন। তিনি দেখলেন মশার পাকস্থলীতে ম্যালেরিয়া পরজীবী একটা আঁচিল তৈরি করেছে ; তার থেকে অনেক পরজীবী তৈরী হয়ে দানার মতো ছড়িয়ে

পড়েছে। এরাই কি ম্যালেরিয়া পরজীবী? তার পরে এরা কোথায় যায়? এই প্রশ্ন থেকে গেল। তিনি আবার লিখলেন ডাঃ ম্যানসনের কাছে। উত্তর আসার আগেই আবার ডাঃ রসের গবেষণা বন্ধ করতে হল ; তিনি অল্পদিনের জন্য দার্জিলিং-এ বদলী হলেন।

জুন মাসে ডাঃ রস আবার কলকাতায় ফিরে এলেন। তখন এখানে খুব গরম, ফিরে এসেই অসমাপ্ত কাজ আবার আরম্ভ করলেন। প্রশ্নের উত্তর চাই, এরা কোথায় যায়? মানুষের শরীরে কিভাবে প্রবেশ করে? তিনি আবার মশা নিয়ে বসলেন। লক্ষ্য করলেন ম্যালেরিয়া রোগীর রক্ত খাওয়ার সাত দিন পরে আঁচিল ফেটে খুব সরু টাকুর মত পোকা বেরিয়ে আসে এবং মশার শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু মানুষের শরীরে কিভাবে প্রবেশ করে? বিরাট প্রশ্ন ; সাফল্যের দুয়ারে এসেছেন তিনি, শেষ বাধা-টুকু পার হতে পারলেই পরিশ্রমের সার্থকতা। অবশেষে ৪ঠা জুলাই তিনি দেখলেন মশার লালাগ্রন্থিতে ম্যালেরিয়া পরজীবী। সমস্যার সমাধান পাওয়া গেল, তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে মশার কামড়ে এই পরজীবী সুস্থ প্রাণীর শরীরে প্রবেশ করে। কিন্তু এটা অনুমান, এ তথ্যের প্রমাণ না দিতে পারলে কেউ বিশ্বাস করবে না। মহম্মদ বক্সকে ডাঃ রস তিনটি সুস্থ চড়াই পাখী আনতে বললেন। তাদের খাঁচায় ভরে ম্যালেরিয়া রোগীর রক্ত খাওয়া স্ত্রী এনোফিলিস মশা ছেড়ে দেওয়া হল। মহম্মদ বক্স পাহারায় থাকল, রস অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে থাকলেন। কিছুদিন বাদে সেই চড়াইগুলো অসুখে কাবু হয়ে পড়ল। এবার তাদের রক্ত পরীক্ষা করে ম্যালেরিয়া পরজীবী পাওয়া গেল।

প্রমাণ এখন হাতের মধ্যে, আর কোন সংশয় নেই। ডাঃ রস লিখলেন অধ্যাপক লেভার্নকে প্যারিসে, তার পাঠালেন ডাঃ ম্যানসনকে, বিজ্ঞান পত্রিকা ও চিকিৎসা পত্রিকায় এই তথ্য জানালেন। এখানে কলকাতায় সহকর্মীদের জানালেন এই আবিষ্কারের কথা। তাঁকে যাঁরা অপমান করত, উপহাস করত কোন কাজের নয় বলে, তাদের সেই অপমান সুদ সমেত ফিরিয়ে দিলেন। সকলে অবাক্ হয়ে গেল। ডাঃ ম্যানসন এডিনবরা শহরে ব্রিটিশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের এক সভা ডাকলেন,

২৪শে জুলাই। সেখানে তিনি ডাঃ রসের তারবার্তা এবং ৬ই জুলাই তারিখের ১২ পৃষ্ঠার লম্বা চিঠি পড়ে শোনালেন। অজানা, অচেনা বৈজ্ঞানিক ডাঃ রোনাল্ড রসকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রস্তাব নেওয়া হোল এই বিরাট আবিষ্কারের জন্য।

কিন্তু ডাঃ ম্যানসনের মনে একটা সংশয় থেকে গেল—যেটা পাখীর বেলা সম্ভব, সেটা মানুষের ক্ষেত্রে ঠিক নাও হতে পারে। তিনি কিছু অন্যায় ভাবেন নি। তিনি রসকে লিখলেন, 'তুমি সুন্দর শুরু করেছে, খুব সুন্দর কাজ করেছ। কিন্তু আমি খবর পেলাম রবার্ট কক্ ইতালীতে মশা নিয়ে কাজ করে ব্যর্থ হয়েছেন, তোমাকে আরও একটু পরিশ্রম করে, এই আবিষ্কারের সম্মান ইংলণ্ডের জন্য অর্জন করতে হবে।' কিন্তু রসের আর ধৈর্য ছিল না, খেটে খেটে তাঁর ১১ পাঃ ওজন কমে গিয়েছিল ; প্রায়ই রাতে ঘুম হোত না। তার ওপর ঐ বছরেই সেপ্টেম্বর মাসে তাঁকে আসামে বদলি করা হোল কালাজ্বর নিয়ে অনুসন্ধান করবার জন্য। এই ধরনের ঘটনা তাঁকে হতাশ করে তুলছিল। পরের বছর ফেব্রুয়ারীতে তিনি দেশে ফিরে গেলেন এবং ঐ বছরেই জুন মাসে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ডাঃ রস আফ্রিকায় সিয়েরা লিয়ঁ রাজ্যে গিয়ে মশা থেকে যে মানুষের ম্যালেরিয়া হয়—এই তথ্য প্রমাণ করতে পেরেছিলেন। ইতালীয়ানরা অবশ্য এই তথ্য প্রমান করেছিল আরও এক বছর আগে। তবে একথা ঠিক যে তাঁর পরিশ্রমে জানা তথ্যের ব্যবহারিক প্রয়োগ করে অন্যেরা নিজেদের বিচারবুদ্ধি মত পৃথিবী থেকে ম্যালেরিয়া নির্মূল করার পথ দেখিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের অনেকেই আজ অজ্ঞাত ও অবহেলিত, যদিও ম্যালেরিয়া দূর করতে তাঁদের অবদান উপেক্ষণীয় নয়।

সেই রকম ভুলে যাওয়া একজন বিজ্ঞানীর নাম জিওভানি বাতিস্তা গ্রাজী। তিনি ইতালীর পাভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্নাতক হয়েও, গবেষণার বিষয় হিসাবে জীববিজ্ঞানকে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন বিনয়ী ও প্রচারবিমুখ, অনেক বিষয়ে গবেষণা করে ফল প্রকাশ করতে দেরি করতেন, অথবা হয়ত মত পরিবর্তন করে জানা তথ্য প্রকাশ করতেন না। মাত্র ২৯ বছর বয়সে তিনি অধ্যাপক। যখন কেউ মশা ও

ম্যালেরিয়ার যোগসূত্র চিন্তা করেন নি, গ্রাজী তখন মশার কথা ভাবছেন। তবে তিনি ভুল মশাকে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন। এটা অবশ্য তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যেখানে মশা সেখানে ম্যালেরিয়া, মশা নেই ম্যালেরিয়াও নেই। আবার এমন জায়গা যেখানে মশা আছে অথচ ম্যালেরিয়া নেই। তাতে গ্রাজী মনে করলেন, কোন বিশেষ শ্রেণীর মশা ম্যালেরিয়া বহন করে। জুলাই মাসে গ্রাজী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুটি নিলেন। মশা খুঁজতে হবে। ইতালীতে প্রায় ৩০—৪০ রকমের মশা আছে, তার মধ্যে কে দোষী খুঁজে বার করতে হবে। প্রায় ২০ জাতের মশার মধ্যে কোন দোষ পেলেন না। গ্রাজী কিন্তু হন্যে হয়ে ম্যালেরিয়া বহনকারী মশাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন—মাঠে, জলায়, ঘরে, খাটের নীচে, চেয়ারের নীচে, এমন কি জুতোর মধ্যে। লোকদের জিজ্ঞাসা করছেন, 'তোমাদের বাড়িতে কারো কি ম্যালেরিয়া হয়েছিল।' কেউ বলে 'না,' আবার কেউ বলে 'হ্যাঁ,' তবে মশা নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যথা নেই। ওরকম অল্পবিস্তর মশা সব জায়গায় আছে, তার জন্যে ম্যালেরিয়া হতে পারে, সেটা তাদের বিশ্বাসের বাইরে।

অবশেষে 'আসামী' ধরা পড়লো ; পালিয়ে বেড়াচ্ছিলো তারা। গ্রামের লোকেরা বলে, 'আমরা ওদের বলি 'জানজারোন,' জলায় প্রচুর দেখা যায়। জলা থেকে শহর বা গ্রামের আলো দেখে ওরা আসে, চেনার উপায় বিশেষ ধরনের বসা, লেজের দিকটা উঁচু করে।' গ্রাজী মশা সম্বন্ধে রসের চেয়ে বেশী জানতেন। তিনি বুঝলেন এরা এনোফিলিস শ্রেণীর স্ত্রী মশা। ১৮৯৮ খ্রীঃ ২৮শে সেপ্টেম্বর তিনি বিজ্ঞানীদের এক সভায় জানালেন, যদিও দেশে প্রায় ৪০ রকম মশা আছে, কেবল মাত্র এনোফিলিস শ্রেণীর মশাই ম্যালেরিয়ার বাহক। এবার গ্রাজী ঠিক করলেন যেখানে কখনও ম্যালেরিয়া হয়নি, যেখানে মশা যেতে পারে না সেইখানে ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টি করে প্রমাণ দিতে হবে। সুযোগ এসে গেল আর স্বেচ্ছাসেবকও পাওয়া গেল খুব সহজে। রোমের কাছে এক পাহাড়ের ওপর একটি হাসপাতাল, সেখানে ৬ বছর ধরে মিঃ শোলা বলে এক রোগী আছেন, তিনি রাজী হলেন মশার কামড় খেতে। রোগীর ঘরের দরজা বন্ধ করে শত শত মশা

ছেড়ে দেওয়া হোল, মিঃ শোলা মশার কামড় সহ্য করলেন, কিন্তু ম্যালেরিয়া হোল না। গ্রাজী রোম থেকে গ্রামে ফিরে দু' বোতল মশা নিয়ে এলেন। আবার মিঃ শোলা মশার কামড় সহ্য করলেন। এবারেও জ্বর এলো না। গ্রাজী ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে থাকলেন। দশ দিন পরে হাড় কাঁপিয়ে জ্বর এলো।

এই সময় ডাঃ গ্রাজী রসের গবেষণার বিষয় জানতে পারলেন; কিভাবে মশার পাকস্থলীতে আঁচিল হয়, কিভাবে সেটা ফেটে ছোট পোকারা সারা শরীরে ছড়িয়ে পরে লালাগ্রন্থিতে যায়, তাও জানতে পারলেন। কিন্তু তিনি নিজের পদ্ধতিতে প্রমাণ করেছেন বিশেষ শ্রেণীর স্ত্রী এনোফিলিস মশা ম্যালেরিয়া পরজীবী বহন করে ম্যালেরিয়া রোগীর রক্ত খাওয়ার পরে। রবার্ট কক্ মনে করেছিলেন মশার বাচ্চারা তাদের মায়ের কাছ থেকে এই জীবাণু জন্মসূত্রে পায়। এটা কি ঠিক? পরীক্ষা করে দেখতে হবে, গ্রাজী মশার বাচ্চা তৈরী করলেন। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে হাঁটু পর্যন্ত প্যাণ্ট গুটিয়ে বসলেন, মশার কামড় খেলেন। বেশ কয়েক দিন কাটল, ম্যালেরিয়া হোল না। প্রমাণ হোল ককের ধারণা ভুল।

ডাঃ গ্রাজী নিজের দেশকে খুব ভালবাসতেন। স্থির করলেন, কারণ যখন জানা গেছে ইতালী থেকে ম্যালেরিয়া মুছে ফেলতে হবে। জান-জারোন থেকে দূরে থাকলে ম্যালেরিয়া হবে না। এই সময় ইতালীতে রেললাইন বসান হচ্ছিল। ১৯০০ খ্রীঃ গরমকাল, এই সময়ে মশার প্রকোপ বেশী। তিনি রেল কর্মচারীদের ঘরের দরজা, জানালা ছোট তারের জাল দিয়ে ঢেকে দিলেন; সকলকে নির্দেশ দিলেন, 'সন্ধ্যার পর বাইরে বেরোবে না।' কয়েক মাস এইভাবে চলল তাঁর তদারকি কাজ। নিজে লক্ষ্য করলেন তাঁর উপদেশ ঠিকমত পালন করা হচ্ছে কি না। পরে দেখা গেল গ্রামে যাদের বাড়িতে তারের জাল নেই, তাদের ৪১৫ জনের ম্যালেরিয়া হয়েছে; আর রেল কর্মচারী যারা জাল ঘেরা বাড়িতে ছিল, তাদের মধ্যে মাত্র ৫ জনের ম্যালেরিয়া হোল।

অধ্যাপক বাতিস্তা গ্রাজী আজ ইতালীর বাইরে একটি অপরিচিত নাম। ম্যালেরিয়া গবেষণা ও ম্যালেরিয়া নির্মূল করতে তাঁর কি অবদান,

তা বহু লোকের অজ্ঞাত। নোবেল প্রাইজ ডাঃ রস পেয়েছিলেন ; কিন্তু তিনি পান নি। এই ঘটনায় মনে পড়ে আমাদেরই বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্রের কথা, যিনি রেডিও আবিষ্কারের সম্মান থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন।

ম্যালেরিয়া বিষয়ে গবেষণা করে অধ্যাপক লেভার্ন ১৯০৭ খ্রীঃ এবং ডাঃ রোনাল্ড রস ১৯০২ খ্রীঃ নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। লেভার্ন ১৯২৪ খ্রীঃ পরলোকগমন করেন এবং ডাঃ রস পরলোকগমন করেন ১৯৩২ খ্রীঃ।

এ পর্যন্ত বলা হোল রোগ কেমন করে হয়, তার ইতিহাস। কিন্তু রোগ হলে তা নিরাময় করার জন্য প্রথম ফলপ্রদ ওষুধ যে কুইনাইন, এই তথ্যও প্রথম জানা গিয়েছিল ১৮৪৯ খ্রীঃ কোলকাতা শহরে প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে ডাঃ এডওয়ার্ড হেয়ারের গবেষণার ফলে। কুইনাইন পাওয়া যায় সিন্‌কোনা গাছের ছাল থেকে। এই গাছ প্রথম পাওয়া গিয়েছিল দক্ষিণ আমেরিকার পেরু রাজ্যে। স্থানীয় লোকেরা একে বলত 'জ্বর গাছ'। গাছের ছাল অনেকটা দারুচিনির মত দেখতে। ওষুধ হিসাবে সিন্‌কোনা ছালের ব্যবহার প্রথম জানতে পারা যায় ১৬৩৩ খ্রীঃ প্রকাশিত এক ধর্মগ্রন্থে। গাছের ছাল চূর্ণ করে দুইটি সিকি মুদ্রার ওপর যতটা ধরে, সেই পরিমাণ চূর্ণ জলের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে জ্বর সেরে যেত। এই ছালের ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে ; সেগুলির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। সবচেয়ে প্রচলিত গল্প হোল, ১৬৩৮ খ্রীঃ পেরুর বড়লাট-পত্নী কাউন্টেস আনাডেন সিনকন ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হবার পরে এই ছাল খেয়ে সেরে ওঠেন। পরে ১৬৪০ খ্রীঃ বড়লাট ঔষধ গুণসম্পন্ন এই ছাল জাহাজে করে প্রচুর পরিমাণে স্পেন দেশে নিয়ে আসেন। ১৬৪৩ খ্রীঃ বেলজিয়াম সরকার সিন্‌কোনাকে ঔষধ হিসাবে তালিকাভুক্ত করেন আর ইংলণ্ড করে ১৬৭৭ খ্রীঃ। অবশেষে ১৮২০ খ্রীঃ ফরাসী দেশে পেলে টিয়ের ও ক্যাভেনটু সিন্‌কোনা থেকে কুইনাইন পৃথক করেন।

ভারতে প্রথম সিন্‌কোনা গাছ রোপন করা হয়েছিল ১৮৬০ খ্রীঃ ; আর ১৮৬৪ খ্রীঃ ব্যবসাভিত্তিক চাষ আরম্ভ হয়। দার্জিলিং জেলার

মংপুতে। পরে ১৮৭৪ খ্রীঃ সেখানে একটা কুইনাইন তৈরি করার কারখানা স্থাপিত হয়।

আজ অবশ্য কুইনাইন ছাড়া আরও অনেক ফলপ্রদ ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে। গত যুদ্ধের সময় ডি. ডি. টি. এবং অন্যান্য প্রতিরোধ ব্যবস্থার ফলে আমাদের দেশ থেকে ম্যালেরিয়া প্রায় অদৃশ্য হয়েছিল। কিন্তু আবার মশা বাড়ছে, ম্যালেরিয়াও বাড়ছে। মশা কমাতে হবে আর নিয়মিত ওষুধ ব্যবহার করলে, ম্যালেরিয়া কমান সম্ভব হবে। গবেষণা এখনও চলছে; চেষ্টা চলছে ম্যালেরিয়ার টীকা আবিষ্কার করার। ম্যালেরিয়া গবেষণা ক্ষেত্রে লেভার্ন ও রসের অবদান ছিল বিরাট; কিন্তু সেই সঙ্গে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি অপর দুই বিজ্ঞানী ডাঃ ম্যানসন ও ডাঃ গ্রাজীকে, ম্যালেরিয়া গবেষণা কাজে যাঁদের অবদান মোটেই উপেক্ষণীয় ছিল না। বিশ্ববিজ্ঞানী সমাজের কাছে যে সম্মান তাঁদের পাওয়া উচিত ছিল তা থেকে তাঁরা বঞ্চিত হয়েছিলেন।

ব্যানটিং ও বেস্ট

১৯২০ খ্রীঃ ৩০শে অক্টোবর রাত্রি। উত্তর আমেরিকার কানাডা রাজ্যের অনটোরিয়ো মেডিকেল স্কুলের শিক্ষক পরদিন ছাত্রদের যে বিষয়ে পড়াবেন, সেই বিষয়ে নিজেকে তৈরি করে নিচ্ছেন। তিনি ঠিক পাঠ্য-পুস্তকের লেখা অনুসরণ করে পড়ানো পছন্দ করেন না ; ছাত্রদের আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের নতুন-পুরাতন পত্রিকায় চোখ বুলিয়ে দেখছেন, নতুন কিছু চোখে পড়ে কিনা।

পরিশ্রম কখনও বিফলে যায় না, দেখতে পেলেন বহু পুরাতন একটি প্রবন্ধ ১৮৮৯ খ্রীঃ মিনকোস্‌কি নামে এক জার্মান বিজ্ঞানীর লেখা। তিনি পরীক্ষা করে দেখেছেন কুকুরের অগ্নাশয় কেটে বাদ দিয়ে দিলে রক্তে চিনি বেড়ে যায়, ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত কুকুর খুব রোগা হয়ে দিন দশের মধ্যে মারা যায়।

শিক্ষক এই তথ্যটি লিখে নিয়ে আরও বই ঘাঁটতে লাগলেন। দেখতে পেলেন, ১৯০১ খ্রীঃ ডাঃ অপি ডায়েবিটিস রোগে মরে যাওয়া রোগীদের শব-ব্যবচ্ছেদ করে দেখেছেন অগ্নাশয়ের (প্যানক্রিয়াস) ভিতরের অন্য এক প্রকৃতির কোষগুলি কেমন যেন রুগ্ন, আকারেও ছোট, যেন শুকিয়ে গেছে। এই বিশেষ ধরণের কোষের কথা প্রথম বলেছিলেন বহু বছর (১৮৬৯ খ্রীঃ) আগে জার্মানীর এক চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র, পল লাংয়ারহান্‌স। অগ্নাশয় কেটে মাইক্রোস্কোপে দেখেছিলেন তিনি ; হঠাৎ তাঁর চোখে ধরা পড়ল এক বিশেষ ধরণের কোষ, যা অগ্নাশয় কোষ থেকে আলাদা ; অনেকটা অগ্নাশয় কোষ সমুদ্রের মধ্যে দ্বীপের মত—যার নাম হয়ে গেল সেই ছাত্রটির নামে, ল্যাংয়ারহান্‌স এর দ্বীপপুঞ্জ (আইলেটস্‌ অফ ল্যাংয়ারহান্‌স)।

শিক্ষকের উত্তেজনা বেড়ে যেতে লাগল। রাত গভীর হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু পড়ায় বিরতি নেই। এবার চোখে পড়লো ডাঃ মোসে ব্যারো'র

বই, যেখানে তিনি লিখেছেন অগ্নাশয়নলী যদি পাথরে বা অন্য কোন কারণে বন্ধ হয়, অগ্নাশয়ের কোষগুলো শুকিয়ে যায় বটে কিন্তু ল্যাংয়ার-হান্‌স কোষগুলির কোন ক্ষতি হয় না এবং তাদের ডায়বেটিসও হয় না।

মাথা গরম হয়ে গেল শিক্ষক মহাশয়ের,—তাহলে এই তিনটি সূত্র মিলিয়ে কি এই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে আইলেটস্ অফ ল্যাংয়ারহান্‌স এমন কোন জিনিস শরীরকে সরবরাহ করে, যা আমাদের শরীরে চিনি জাতীয় জিনিস হজম করতে সাহায্য করে। কারণ ডায়েবিটিস রোগীদের অগ্নাশয়ের দ্বীপ-কোষগুলি শুকনো ; আর যাদের অগ্নাশয় নলীতে পাথর, তাদের অগ্নাশয় শুকনো কিন্তু দ্বীপকোষগুলি সুস্থ এবং তাদের ডায়েবিটিস হয় না। ঘুম ছুটে গেল, কান ভোঁ, ভোঁ করতে লাগল ; তাহলে কি এই তিনটি সূত্র যোগ করে তিনি ডায়েবিটিস রোগের কারণ আবিষ্কার করে ফেলেছেন। রাত চারটে বেজে গেল, চোখে ঘুম নেই হঠাৎ আধঘুম অবস্থায় মনে এল, 'অগ্নাশয় নলী বেঁধে মাস দুই অপেক্ষা করো, তারপর অগ্নাশয় জলে মিশিয়ে, ছেঁকে নিয়ে ইনজেকশন দিয়ে দেখ।' এক টুকরো কাগজে কথা কয়টি লিখে, ক্লান্ত শিক্ষক গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলেন।

অনটোরিয়ো মেডিকেল স্কুলের এই শিক্ষকের নাম ফ্রেড ব্যানটিং। জন্ম ১৮৯১ খ্রীঃ কানাডায় এক চাষী পরিবারে। বিজ্ঞানী হওয়ার কথা নয় তাঁর, বাসনাও ছিল না কোনদিন। তিনি ছিলেন অস্থিরোগ বিশেষজ্ঞ এক সার্‌জেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভীষণ ভাবে আহত হয়ে ফিরে এলেন। চিকিৎসকরা অভিমত দিলেন, 'হাতটা কেটে বাদ দিতে হবে।' ভীষণ জেদী লোক ছিলেন ব্যানটিং, কিছুতেই হাত কেটে ফেলতে রাজি হলেন না। বললেন, 'মরব সেও ভাল, কিন্তু হাত কেটে ফেলব না।'

অনটোরিয়োর এক শিশু হাসপাতালে কয়েকমাস কাজ করার পরে নিজে স্বাধীনভাবে চিকিৎসকের বৃত্তি শুরু করলেন। নিজের নামের ফলক ঝুলিয়ে বসে পড়লেন অনটোরিয়ো শহরে। কিন্তু বসার সঙ্গে সঙ্গে তো আর পসার হয় না। আটাশ দিন পরে একটি রোগী এল এবং উপার্জন হোল মাত্র চার ডলার। এই রোজগারে কি কারও সংসার চলে, না পেট চলে ? অগত্যা বাধ্য হয়ে ঐ শহরের মেডিকেল স্কুলের ফিজিওলজির



ডাঃ ব্যানটিং

ডেমনস্‌ট্রেটরের কাজ নিতে হোল। শিক্ষকতার কাজে তাঁর আন্তরিকতা ছিল, আর হাতে সময় ছিল প্রচুর। সেইজন্য অত সব বই দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। বিজ্ঞানী হবার বিন্দুমাত্র বাসনা তাঁর ছিল না ; কিন্তু বোধ হয় কোন অজানা শক্তি তাঁকে দিয়ে এক বিরাট কাজ করাতে চেয়েছিল। তিনি না চাইলেও পাকে-চক্রে তাঁকে এর মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হবে। ব্যানটিং-এর বোধ হয় তাই হয়েছিল। নাহ'লে ৩০শে অক্টোবরের আগে পর্যন্ত যিনি ডায়েবিটিস নিয়ে কোন রকম চিন্তা করেন নি, তাঁর চোখে এত পুরোন সব তথ্য ধরা দিল কেন ?

যদিও সময়টা ১৯২০ খ্রীঃ কিন্তু ডায়েবিটিস রোগের ওষুধ বের হওয়া দূরের কথা, কারণটাও সেদিন পর্যন্ত ছিল অজানা। রোগটা কিন্তু খুবই পুরোন। ৩৫০০ বছর আগে মিশরের 'এবার্স-প্যাপিরাস'-এ এই রোগের লক্ষণ ও উপসর্গের বর্ণনা আছে, কারণ সেদিনেও অজানা ছিল, প্রাচীন

ভারতীয় চিকিৎসক এই রোগের নাম দিয়েছিলেন 'মধুমেহ'। তাঁরা বিশদ-ভাবে এই রোগের উপসর্গ বর্ণনা করেছিলেন এবং এই রোগে প্রস্রাব যে মধুর মত মিষ্টি হতে পারে তাও তাঁরা জানতেন। তাঁরা বলেছিলেন এই রোগ সাধারণতঃ মধ্যবয়সী ধনী, যাঁরা পরিশ্রম করে না এবং বেশী খায়, তাদের মধ্যে বেশী সংখ্যায় দেখা যায়। ডায়েবিটিস নামটি কিন্তু দিয়েছিলেন এরেটিয়াস। আর আজ থেকে প্রায় ১৭০ বছর আগে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের উইলিয়ম কালেন, দু'ধরনের ডায়েবিটিস রোগের কথা বলেছিলেন,—এক প্রকার রোগে প্রস্রাবে চিনি থাকে, যার নাম ডায়েবিটিস মেলিটাস; অপরটির নাম ডায়েবিটিস ইনসিপিডাস, যে রোগে প্রস্রাব বেশী হয় কিন্তু চিনি থাকে না। শেষের রোগটি কিন্তু অগ্নাশয়ের কারণে নয়; মাথার মধ্যে পিটুইটারী নামে ছোট একটি গ্রন্থি (গ্লাণ্ড) আছে, যার পিছনের অংশ খারাপ হলে এই রোগ হতে পারে।

ব্যানটিং-এর মনে এই ধারনা তখন জেঁকে বসেছে যে ডায়েবিটিস রোগের কারণ তিনি জানতে পেরেছেন, কিন্তু প্রমাণ না দেখালে তো কেউ বিশ্বাস করবে না। তাছাড়া ওষুধও তৈরী করতে হবে, অন্ততঃ চেষ্টা করে দেখতে হবে ল্যাংয়ারহানস্ দ্বীপের ঐ বিশেষ কোষ থেকে কোন ওষুধ পাওয়া সম্ভব কিনা। ক্লাস শেষ হবার পরে তিনি হাজির হলেন ফিজিওলজি বিভাগের অধ্যাপক ম্যাকলিয়ডের ঘরে। খুব ব্যস্ত মানুষ ম্যাকলিয়ড, সারা দেশ জোড়া নাম তাঁর; আর ব্যানটিং এক অখ্যাত-নামা শল্যবিদ—ডেমনস্ট্রেটর।

মুখ তুলে অধ্যাপক বললেন, 'কি চাও।'

কি যে বলবেন ঠিক করতে পারেন না ব্যানটিং। অবশেষে আমতা আমতা করে বলে ফেললেন মনের কথা।

'তুমি কি করে জানলে যে ল্যাংয়ারহানস্ কোষের আলাদা কোন রস আছে? হয়ত অগ্নাশয় অন্যভাবে আমাদের ডায়েবিটিস থেকে রক্ষা করে' —অধ্যাপক বললেন।

'স্যার, এটা আমার মনে হয়েছে, তবে কোন প্রমাণ আমি এখন দিতে পারবো না,' ব্যানটিং জবাব দিলেন।

ধৈর্য্য ধরে ম্যাকলিয়ড ব্যানটিং-এর প্রলাপ শুনলেন। নষ্ট করার মত সময় তাঁর নেই। কথা না বাড়িয়ে জানতে চাইলেন, 'আমার কাছে তুমি কি সাহায্য চাও?'

'স্যার, আমাকে দশটি কুকুর আর দু'মাসের জন্য একজন সহকারী দিন।'

অধ্যাপককে ধন্যবাদ যে তিনি সেদিন ব্যানটিং-এর আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন নি।

ম্যাকলিয়ডের অনুমতি পাওয়ার পরে ব্যানটিং স্থির করলেন, তিনি চিকিৎসা ব্যবসা একেবারে ছেড়ে দিয়ে গবেষণা করবেন। যে সব অধ্যাপকরা তাঁকে স্নেহ করতেন তাঁরা বারণ করলেন, বন্ধুরা বিরত করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তিনি কারো কথায় কান দিলেন না। তাঁর শিক্ষক অধ্যাপক স্টার বললেন, 'সে কি তুমি তো এখনও ব্যবসা আরম্ভই কর নি। কিছুদিন সবুর কর, দেখবে পসার জমে গেছে।' মনে ভাবলেন ও তো বরাবরই একটু খেয়ালী প্রকৃতির, কিছুদিন বাদে মাথা ঠাণ্ডা হলে নেশা কেটে গেলে আবার কাজ করবে।

কিন্তু নেশা তো ছুটলো না আরও বেড়ে গেল। নিজের আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি সব বেচে দিলেন। অধ্যাপক না হয় কুকুর দিয়েছেন, আরও খরচও তো আছে। সেটা কোথা থেকে আসবে? আর তাছাড়া তিনি বুঝেছেন চিকিৎসা ব্যবসায়ী হিসাবে তিনি ব্যর্থ। কবে একটা রোগী আসবে আর সেই আশায় তিনি বসে থাকবেন অত ধৈর্য্য তাঁর নেই। প্র্যাকটিস যখন করবেন না ওসব রেখে কি লাভ?

ম্যাকলিয়ড প্রতিশ্রুতি মত দশটি কুকুর দিলেন, আর একজন সহকারীও দিলেন দু'মাসের জন্য। সহকারীর নাম চার্লস বেস্ট। কিন্তু তিনি তখনও ছাত্র, তবে ব্যানটিং-এর চেয়ে ব্যবহারিক ফিজিওলজি ভাল জানতেন তিনি। রক্তে চিনি কত, প্রস্রাবে চিনি আছে কি নেই, থাকলে পরিমাণ নির্ণয় করতে বেষ্ট কিন্তু ভালই জানতেন। এদিকে ব্যানটিং ছিলেন শল্যবিদ, কুকুরের অগ্নাশয় কেটে বাদ দিয়ে, তার পেট সেলাই করে রিপু করতে তিনি ছিলেন দক্ষ শিল্পী। ঘটনাক্রমে উভয়ের যোগা-

যোগ কিন্তু ভালই হয়েছিল।

তুই আনকোরা নতুন 'বিজ্ঞানী' কাজ শুরু করলেন ১৬ই মে। কুকুরকে ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করে, অগ্নাশয়ের পাচক রস বের হবার নলী বেঁধে দিলেন। তারপর অপেক্ষা করতে হবে, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা—প্রায় তু'মাস সময়। এই সময় দিন রাত পড়তে থাকলেন তাঁরা। ডায়েবিটিস, অগ্নাশয় সম্বন্ধে যেখানে যা লেখা আছে, পড়লেন সব। জানতে পারলেন আগের বিজ্ঞানীদের ব্যর্থতার কাহিনী; কেউ হয়ত অগ্নাশয় খাওয়াচ্ছে, আবার কেউ হয়ত জলে গুলে ইন্‌জেকশন দিচ্ছে, কিন্তু কোন ফল পাওয়া যায় নি। সুতরাং তাঁরা স্থির করলেন, ওপথে আমরা যাব না; অগ্নাশয়ের পাচক রসই ল্যাংয়ারহানস্ কোষের ডায়েবিটিস প্রতিরোধক রস নষ্ট করে। সুতরাং অগ্নাশয়ের রসক্ষরণ বন্ধ করতে হবে; তাহলে পাচক রস তৈরী করার কোষগুলি শুকিয়ে যাবে এবং ডায়েবিটিস প্রতিরোধকারী রস তার কাজ করতে পারবে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই কুকুরের পাচক রসের নলী বেঁধে তাঁরা কাজ আরম্ভ করেছিলেন।

সাত সপ্তাহ কেটে গেল। এতদিন নিশ্চয়ই পাচক রস তৈরী করার কোষগুলি শুকিয়ে গেছে; যেমন দেখা গিয়েছিল পিত্তথলীর নলী পাথরে বন্ধ থাকার পরে। এই আশা নিয়ে তুটি কুকুরের পেট খুলে ফেললেন আবার। কিন্তু হতাশ হলেন তাঁরা, বিস্ময় অপেক্ষা করছিল তাঁদের জন্য। আশ্চর্য্য, অগ্নাশয় তো মোটেই ছোট হয় নি, বেশ স্বাভাবিক আকারেই আছে। এমন হোল কেন? খুঁজে পেতে দেখলেন যে, নলীটা এত জোরে বেঁধেছেন, যে সেটা পচে গিয়ে আশপাশে জুড়ে যেন নতুন নলী তৈরী করেছে। কাজের প্রথমেই ব্যর্থতা, কিন্তু দমে গেলেন না। তুজনে চললেন ঘোরানো লোহার সিঁড়ি বেয়ে চিলে কোঠার ঘরে, যেখানে তাঁদের গবেষণার ঘর দেওয়া হয়েছে। বাকি কুকুর ক'টির পেট কেটে দেখলেন। কয়েকটি অগ্নাশয় বেশ ছোট হয়েছে। তবু সাবধানের মার নেই, সব কটি কুকুরের অগ্নাশয় নলী আবার বাঁধলেন; কোনটা জোরে, কোনটা বা হালকাভাবে, আবার কোনটা বা মাঝারি চাপে। এদিকে তু'মাস সময়ও তো ফুরিয়ে এলো। গবেষণার খরচ

বাদ দিয়ে বেস্‌ট-এর হাত খরচের টাকা আসবে কোথা থেকে? ভাবনায় পড়লেন দুজনে, অবশ্য ম্যাকলিয়ড এখন বিদেশে, তাই রক্ষা।

শেষ পর্য্যন্ত আরও কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল; বেস্‌টকে টাকা ধার নিতে হোল। সৌভাগ্যবশতঃ ম্যাকলিয়ড এখনও কাজ বন্ধ করতে নির্দেশ দেন নি। পরিশ্রমের সাফল্য হিসাবে এইটুকু মাত্র বলা যায় যে অগ্নাশয় বাদ দিয়ে একটি কুকুরের ডায়েবিটিস রোগ তৈরী করতে পেরেছেন তাঁরা। ব্যানটিং কুকুরের শিরা থেকে রক্ত নিচ্ছেন; আর বেস্‌ট সেই রক্ত পরীক্ষা করছেন, চিনির পরিমাণ কত বাড়ছে। প্রস্রাবে কখন চিনি আসছে। কুকুরটা ক্রমে দুর্বল হচ্ছে, দাঁড়াতে পারে না, এমনকি লেজও নাড়তে পারে না। ভীষণ ক্ষুধা আর পিপাসা, জল খেয়েও সে পিপাসা মেটে না। ভাল খেয়েও শরীর দুর্বল হচ্ছে, রক্তে ক্রমশ চিনির পরিমাণ বাড়ছে, প্রস্রাবও খুব বেশী হচ্ছে এবং তাতেও খুব বেশী চিনি।

২৭শে জুলাই; অগ্নাশয় বাদ দেওয়া কুকুরটি মৃত্যুর পথে। আর একটি কুকুরকে অজ্ঞান করে তার অগ্নাশয়টি বার করে বড় খলের মধ্যে রাখা হোল বরফ দিয়ে। সেটাকে নুড়ি দিয়ে থেঁতো করে ঠাণ্ডা নুনজল অল্প পরিমাণে মিশিয়ে নেওয়া হোল, স্যুপ তৈরী করার মত করে। তার পরে ছাঁকনি কাগজের (ফিলটার পেপার) মধ্যদিয়ে ছেঁকে নেওয়া হোল। শরীরের তাপের সঙ্গে সমতা রেখে সেটাকে গরম করা হোল এবং ইন্‌জেকশন দেওয়ার পিচকারীতে ভরে যে কুকুরটা তখন ডায়েবিটিসে মরতে চলেছে, তার গলার শিরায় ইন্‌জেকসন দিলেন তিনি। এর পরে অপেক্ষা, ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা, উৎকণ্ঠিত অপেক্ষা, কিন্তু সময় যেন আর কাটে না। প্রতি ঘণ্টায় বেস্‌ট সেই কুকুরের রক্ত নিয়ে পরীক্ষা করছেন, যন্ত্রের দিকে চেয়ে বসে আছেন। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন বেস্‌ট, 'ফ্রেড, রক্তে চিনি প্রায় শুন্যে এসে গিয়েছে।'

ছুটলেন দু'জনে চিলে কোঠায় সেই কুকুরের কাছে। তাজ্জব ব্যাপার, সে উঠে বসেছে, লেজ নাড়ছে। কৃতজ্ঞতায় চেয়ে দেখছে তাদের দিকে; যেন সে বলতে চাইছে, 'তোমরা আমার জীবন ফিরিয়ে দিয়েছ।' লেজ নাড়তে নাড়তে তাদের চারপাশে ঘুরতে লাগল। একি সম্ভব? যে কুকুর

মাথা তুলতে পারছিল না, সে চলাফেরা করছে। তাহলে সত্যিই কি তাঁরা একটা বিরাট আবিষ্কার করে ফেলেছেন ?

এদিকে বেস্টের ঘাম ছুটে যাচ্ছে উপর-নীচ করে, রক্ত পরীক্ষা আর প্রস্রাব পরীক্ষা করে ব্যানটিংকে খবর দিচ্ছেন। আর ব্যানটিং কুকুরের পাশে বসে তার চাল-চলন, হাব-ভাব লক্ষ্য করছেন আর লিখে নিচ্ছেন। সময় কেটে যাচ্ছে, ৪ ঘণ্টা, ৫ ঘণ্টা, ৬ ঘণ্টাও কেটে গেল, প্রস্রাবে এখন চিনি নেই ; আশ্চর্য্য নিশ্চয়ই। দারুণ উৎকণ্ঠায় দুজনের রাত কাটল, ঘুম এলো না। কুকুরটা কিন্তু বাঁচলো না। পরদিন মারা গেল।

ব্যানটিং ভাবতে লাগলেন, এই কুকুরটাকে অগ্নাশয়ের নির্য্যাস ইনজেকশন দিতে রক্তে চিনির পরিমাণ কমে গেল ; এটা কি অগ্নাশয়ের কোন রসের জন্য কমেছে, না কি কাকতালীয়বৎ অন্য কোন কারণে কমেছে ? যাই হোক, দুজনে ঠিক করলেন আবার পরীক্ষা করে দেখা হোক। আর একটি কুকুরের প্রথমটির মত অগ্নাশয় বাদ দিয়ে ডায়েবিটিস তৈরী করা হোল। সে ধীরে ধীরে যখন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, সেই সময় ৪ঠা আগষ্ট তাকেও একই পদ্ধতিতে অগ্নাশয়ের নির্য্যাস ইন্‌জেকশন দেওয়া হোল। ফল একই হোল, সাময়িক ভাবে সেও মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এলো এবং তিনদিন বেঁচেও রইল। তবে তাকে তিন-দিন বাঁচিয়ে রাখতে দুটি স্বাস্থ্যবান কুকুর হত্যা করতে হোল। এটা নিছক পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয় ; দুই বিজ্ঞানী এই অমানবিক ও পাশবিক পরীক্ষা বন্ধ করতে মনস্থির করলেন ; তাছাড়া আর তো কুকুর নেই, সেই দশটি কুকুর তো কবে শেষ হয়ে গেছে। শেষে আবার তাঁরা মত পরিবর্তন করলেন। এবার নিজের পোষা কুকুরটি বিজ্ঞানের কাজে শহীদ হতে চলেছে। রাস্তার কুকুর ধরে 'সিক্রিটিন' নামে এক প্রকার আন্ত্রিক রস ইন্‌জেকশন দিয়ে, অগ্নাশয় বার করে, তার নির্য্যাস ইন্‌জেকশন দিয়ে, ডায়েবিটিস রোগে মৃত্যুপথযাত্রী কুকুরটিকে আটদিন বাঁচিয়ে রেখেছেন তাঁরা ; আর তার জন্য পাঁচটি কুকুরকে প্রাণ দিতে হয়েছে। এই ভাবে কুড়ি দিন বেঁচে থাকার পরে এটিও মারা গেল। ব্যানটিং যেন ক্ষেপে গেলেন। বললেন 'না ; এই নিষ্ঠুর পরীক্ষা করতে আর চাই না। অন্য



ডাঃ চালস বেস্‌ট

পথ দেখতে হবে', একটা ব্যাপারে তারা নিশ্চিত, অগ্নাশয়ে নিশ্চয়ই এমন কোন রস, হয়তো বা 'হরমোন' আছে যা আমাদের ডায়েবিটিস থেকে রক্ষা করে। দুজনে পরামর্শ করে এই অজানা হরমোনের নাম দিলেন 'আইলেটিন'।

নভেম্বর মাস ; ম্যাকলিয়ড ফিরে এসেছেন ইউরোপ থেকে। তবে তিনি নিজের গবেষণা কাজ নিয়েই ব্যস্ত। ব্যানটিং কিছু করতে পেরেছেন কি না, কোন খোঁজ খবর নেন নি। এদিকে ব্যানটিং ও বেস্‌ট একেবারে হতাশায় ভেঙ্গে পড়েছেন। এত পরিশ্রম বিফল গেল ; সাফল্যের দরজা কি তাঁদের সামনে বরাবর বন্ধই থাকবে ? না, অধ্যাপক হেনডারসন, যিনি ব্যানটিংকে স্নেহ করতেন, তিনি এগিয়ে এলেন সাহায্য করতে অযাচিত ভাবে।

'ব্যানটিং তুমি আমার ডিপার্টমেণ্টে লেকচারারের কাজ নাও,' অধ্যাপক বললেন।

ব্যানটিং যেন আকাশ থেকে পড়লেন, 'স্যার, আমি তো ফার্মাকোলজির কিছুই জানি না ছাত্রদের পড়াব কি করে ?

অধ্যাপক আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'পড়াব আমি ; কিন্তু তোমার তো একটা কাজ চাই। না হলে তুমি তোমার গবেষণা কি করে শেষ করবে, আর খাবে কি ?'

নতুন উৎসাহ নিয়ে দুজনে আবার কাজ আরম্ভ করলেন, তবে এবার আর বহু কুকুর হত্যা করে একটি কুকুর বাঁচান নয়। নতুন একটা তথ্য ব্যানটিং-এর চোখে ধরা পড়েছে। যখন কোন কাজ ছিল না, পুরনো পত্রিকা ঘাঁটতে ঘাঁটতে চোখে পড়েছিল যে শিশুদের অগ্নাশয়ে জন্মের আগে পর্যন্ত ল্যাংয়ারহানস্ কোষগুলি খুব বড় থাকে। এটা খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ খবর। সারারাত ঘুমোতে পারলেন না ব্যানটিং, যেটা মানব শিশুর বেলা সম্ভব, অন্য প্রাণীর ক্ষেত্রে সেটা হবে না কেন ? শিশু যখন মায়ের পেটে থাকে তার অগ্নাশয় তখন পাচক রস তৈরী করে না, কারণ তাদের তো আর মুখে খেতে হয় না। মায়ের রক্ত তাদের খাবার পৌঁছে দেয়। এই খাবার হচ্ছে রক্তের মধ্যে চিনি ; তাকে হজম করতে অগ্নাশয়ের হরমোন 'X' বা 'আইলেটিন' দরকার হবে। এই মতবাদে যদি কোনরকম সত্যতা থাকে তাহলে অন্য প্রাণীর ক্ষেত্রেও এটা প্রয়োগ করা যেতে পারে। চাষীর ঘরের ছেলে তিনি, এটা তাঁর জানা উচিত ছিল। তাহলে অগ্নাশয়ের জন্য এত হাতড়ে খুঁজে বেড়াতে হোত না, এত কুকুর হত্যা করতে হত না। তিনি তো জানেন বেশী মাংস ও বেশী চর্বির জন্য গর্ভবতী গরু হত্যা করা হয় কসাইখানায়। কসাইখানার বাছুরের অগ্নাশয়ে তাঁদের এই সমস্যা মিটতে পারে। কত সহজ সমাধান, অথচ এটা তাঁদের মাথায় আসে নি। অবশ্য একটা চলতি কথা আছে, 'সমাধানের পর সব সমস্যা সহজ মনে হয়।'

অগ্নাশয় সরবরাহের সমস্যা মিটল। দু'জনে কসাইখানা থেকে প্রথম দিনেই তেরটি অগ্নাশয় নিয়ে এলেন। এছাড়া বেস্ট অগ্নাশয়ের হরমোন 'X' রক্ষা করার এক নতুন উপায় আবিষ্কার করলেন ; অগ্নাশয়কে নুনজলে না দিয়ে এসিড-এলকোহলে চুবিয়ে দিলেন। এর ফলে পাচক রস তৈরীর কোষগুলি নষ্ট হয়ে গেল কিন্তু ল্যাংয়ারহানস্ কোষগুলির কোন ক্ষতি

হোল না। দরকার মত আইলেটিন তৈরী করতে লাগলেন বেস্ট, সেই রস দেওয়া হোল অগ্নাশয় বাদ দেওয়া আর একটি কুকুরকে।

১৯২১ খ্রীঃ শেষ হল, জানুয়ারী এল কুকুরটি এখনও বেঁচে, ৭০ দিন সে বেঁচে আছে ; অথচ তার বহুদিন আগেই মরে যাওয়া উচিত ছিল। এই ঘটনার কয়েক মাস আগে ব্যানটিং এর দেখা হয়েছিল তার সহপাঠী বন্ধু ডাঃ জো গিলক্রিস্টের সঙ্গে ; তার হয়েছে ডায়েবিটিস, রোগ ধরা পড়েছে পাঁচ বছর আগে। চেহারা শুকিয়ে একেবারে হাড় আর চামড়া ছাড়া আর কিছু নেই। ব্যানটিং বন্ধুকে বললেন, 'তোমাকে আমি বোধহয় একটা ভাল খবর দিতে পারবো কয়েক মাস পরে।'

জো কিন্তু বন্ধুর এই কথাকে কোন গুরুত্ব দিলেন না। ব্যানটিং তাঁর বাল্যকালের বন্ধু, দু'জনে একসাথে খেলাধূলা করেছেন ছেলেবেলায়। ছাত্র হিসাবেও ব্যানটিং খুবই সাধারণ শ্রেণীর, সে একটা বিরাট কিছু করবে এটা আশা করা দুরাশা ছাড়া আর কি হতে পারে। অসুস্থ শরীর নিয়ে জো প্রাকটিস করেন, বিধবা মাকে খাওয়াতে হবে তো! এর মধ্যে অক্টোবর মাসে জো'র হোল ইনফ্লুয়েঞ্জা, ভাঙ্গা শরীর আরও ভেঙ্গে গেল। জো এবার ব্যানটিং এর শরণ নিলেন, যে মানুষ ডুবে যাচ্ছে সে তো খড় ধরে বাঁচার চেষ্টা করে। কিন্তু 'আইলেটিন' তো কোন মানুষের শরীরে ইনজেকশন দেওয়া হয় নি, জো'কে দেবেন, কেমন করে? ব্যানটিং ও বেস্ট নিজেরা ঐ ইন্‌জেকশন নিলেন, কোন খারাপ ফল হল না। তারপরে হাসপাতালে মৃত্যু পথযাত্রী কয়েকটি ডায়েবিটিস রোগীকে ইনজেকশন দিলেন, ফল ভালই হোল। চারিদিকে ব্যানটিং-এর ওষুধ নিয়ে গুজব ছড়াতে থাকল। ওষুধের নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে ১১ই ফেব্রুয়ারী বন্ধু ডাঃ জো গিলক্রিসটের চিকিৎসা আরম্ভ করলেন ব্যানটিং। প্রথমে তাকে গ্লুকোজের জল খাওয়ান হোল, তারপর 'আইলেটিন' ইনজেকশন দেওয়া হোল। তারপরে ব্যানটিং ও বেস্ট অপেক্ষা করতে থাকেন ; দেখছেন সে কিভাবে শ্বাস নিচ্ছে, কি ভাবে শ্বাস ছাড়ছে তাতে কার্বন ডাই-অক্সাইড বাড়ছে কি না। এক ঘণ্টা, দু ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা কাটল ; কোন পরিবর্তন নেই। ভীষণ দুঃখ পেলেন ব্যানটিং, শেষে কি তিনি বন্ধুর মৃত্যুর কারণ হলেন? মনের দুঃখে

বেস্টের অনুরোধ না শুনে ট্রেন ধরে নিজের দেশে চলে গেলেন। কিন্তু পরিবর্তন এলো তার পরে। জো জোরে শ্বাস নিচ্ছেন, জোরে ছাড়ছেন, মাথা সোজা করে কথা বলছেন, সব কিছু বুঝতে পারছেন পরিষ্কার ভাবে। উঠে দাঁড়ালেন জো, 'বেস্ট একি হোল, আমি যেন আমার শক্তি ফিরে পেয়েছি। আমি বাঁচবো বেস্ট, আমি বাঁচতে চাই। দুদিন আগে ভাবতাম গ্লুকোজ খেয়ে অজ্ঞান হয়ে মরে গেলে ভাল হয়, কোন অনুভূতি থাকবে না। কিন্তু আজ আমি মরতে চাই না।'

ছুটে বেরিয়ে গেলেন বেস্ট। ট্রাংক কল করে ব্যানটিং-এর আত্মীয়দের জানিয়ে দিলেন, 'ফিরতি ট্রেনেই যেন তিনি ফিরে আসেন। ডাঃ জো খুব ভাল আছেন।' এদিকে ডাঃ জো মাথা উঁচু করে রাস্তায় হাঁটছেন। যারা তাঁকে চিনত, তারা অবাক হয়ে তাঁকে দেখছে ; ভাবছে ব্যানটিং-এর ওষুধ কি সত্যিই যাদু করেছে ডাঃ জো'কে ?

খবর চাপা থাকে না ; অধ্যাপক ম্যাকলিয়ডের কানেও কথাটা উঠলো। তিনি ভাবলেন, আধপাগল ছোকরাটা তাহলে নেহাৎ বাজে কথা বলে নি। নিজের কাজ বন্ধ করে সমস্ত সহকারী নিয়ে এগিয়ে এলেন ডায়েবিটিস ওষুধ তৈরীর কাজে। ব্যানটিং এর কাছে জানতে চাইলেন, 'কি ভাবে কাজ করেছ সব দেখাও।' একজন সহকারী ডাঃ কলিপকে নির্দেশ দিলেন, 'কিভাবে ওষুধ তৈরী করছে জেনে নাও।' খোলা মনে তাঁর সব প্রকাশ করলেন। ডাঃ কলিপ একাই স্বাধীনভাবে কাজ করতে আরম্ভ করলেন। টেস্ট টিউবে ওষুধ তৈরী করতে সক্ষম হলেন ; কিন্তু হায়, মানুষের শরীরে দেখা গেল সেটা একেবারেই অকেজো অথবা প্রতিক্রিয়া এত বেশী যে প্রাণী গুলো মরে যেতে লাগলো। অধ্যাপক ম্যাকলিয়ড কাজে হাত দিয়ে প্রথমেই ব্যানটিং-এর দেওয়া 'আইলেটিন' নাম বদলে, নাম দিলেন 'ইনসুলিন'। অবশ্য বছর ছয় আগে স্যার শেফার নামে খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ল্যাংয়ারহানস্ কোষের তৈরী করা অন্তক্ষরিত রস আছে অনুমান করে-ছিলেন এবং তিনিও নাম দিয়েছিলেন 'ইনসুলিন'।

এইরূপ ভাগ্য বিরূপতায় ব্যানটিং যেন ভেঙ্গে পড়লেন। এই আবিষ্কারের কোন কৃতিত্ব যেন তাঁর নেই। কয়েকমাস আগে আমেরিকায়

ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি 'আইলেটিন' বিষয়ে কিছু বলতে গিয়েছিলেন। অখ্যাতনামা ব্যানটিংকে প্রায় বলতেই দেওয়া হয় নি ; কারণ অনেক বড় বড় বক্তা ছিলেন সেই সভায়। এদিকে আমেরিকান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন অধ্যাপক ম্যাকলিয়ড আর তাঁর সহকারীদের ডায়েবিটিস সম্বন্ধে গবেষণার জন্য এক বিশেষ সভায় উঠে দাঁড়িয়ে সম্বর্ধনা জানাল এবং অধ্যাপক সেই অভিনন্দন গ্রহণ করলেন নিজের ও তাঁর সহকারীদের তরফে।

এই ঘটনার পরে ব্যানটিং হতাশ হলে তাঁকে কি দোষ দেওয়া যায় ? তিনি নিজের ভাগ্য ছাড়া আর কাকে দোষী করবেন ? বাজারে দেনা হয়ে গেছে, চাকরীটাও গেছে। হাসপাতালের আশাহত রোগীগুলো শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। জো হতাশ মনে মৃত্যুর দিন গুনছেন। এই সময়ে ভাগ্যই আবার পটভূমি বদলে দিল। আমেরিকার কনট ল্যাবরেটারী কর্তৃপক্ষরা এসে বললেন। 'টাকা, কুকুর, রাসায়নিক জিনিষ, সব পাবে কাজ কর আমাদের এখানে।'

নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবার তিনজনে, সেই তৃতীয়জন ডাঃ জো। হাসপাতালের খুব খারাপ রোগীদের বেছে নিলেন তাঁরা। বেস্‌ট ওষুধ তৈরী করে দিচ্ছেন, আর জো প্রথম সেই ওষুধ ব্যবহার করছেন নিজের ওপর। জো বলেন, 'আমরা শহীদ নই, আমরা সৈনিক। আমরা তে মরেই গিয়েছিলাম, ব্যানটিং আর বেস্‌ট আমাদের নতুন প্রাণ দিয়েছে ; তাই লড়বো, মানুষ মারতে নয়, ডায়েবিটিস রোগের বিরুদ্ধে মানুষকে বাঁচাতে আমাদের সংগ্রাম।' অন্য রোগীরা জো'কে বলত 'ক্যাপটেন।'

একদিন এক নতুন ওষুধ পরীক্ষা করতে গিয়ে ডাঃ জো'র প্রাণ সংশয় হয়েছিল। ওষুধটা ছিল ভীষণ তেজী, শরীরের চিনি ভীষণ কমে গিয়েছিল। আর তিনি প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ছিলেন, মনে পড়েছিল অধ্যাপক হেনডারসেনের কথা, 'রক্তে চিনি কমে গেলে, চিনি জলে গুলে খেয়ে নিয়ো।' ডাঃ জো তাই করেছিলেন এবং প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন।

মানুষ ডায়েবিটিস রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এইভাবে জয়লাভ করেছিল। এই সংগ্রামে তিনজন সৈনিক—ব্যানটিং, তার সহকারী ছাত্র বেস্‌ট

আর মানুষ গিনিপিগ ডাঃ জো। শহীদ কয়েক ডজন নিরপরাধ কুকুর, তাদের মধ্যে প্রথমটির নাম 'ল্যাজরাস,' অন্যদের নাম জানা নেই। এই যুদ্ধে ভাগ্য বিরূপ হয়েছে আবার ভাগ্য সহায়ক হয়েছে। হতাশা এসেছিল, কিন্তু হাল ছেড়ে দেন নি। সাহসের সঙ্গে সংগ্রাম করেছিলেন বলে তাঁরা সফল হতে পেরেছিলেন।

ব্যানটিং শেষ পর্যন্ত তাঁর কাজের স্বীকৃতি পেয়েছিলেন ; ১৯২৩ খ্রীঃ তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়, ইনস্যুলিন আবিষ্কারের জন্যে। আর সহযোগী প্রাপক ছিলেন, না, বেস্‌ট নয় ; অধ্যাপক ম্যাকলিয়ড। বেস্‌ট ছাত্র বলে তাকে পুরস্কার দেওয়া হয় নি। এটাকে পরিহাস বলব না বিচারের প্রহসন বলব তা জানি না।

ডাঃ ব্যানটিং স্যার উপাধিতে ভূষিত হলেন ১৯৩৪ খ্রী, আর এই মূল্যবান জীবনের অবসান হয় ১৯৪১ খ্রী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এক বিমান দুর্ঘটনায়। প্রথম মহাযুদ্ধে যিনি হাতে আঘাত পেয়ে শল্যচিকিৎসা ছেড়ে বিজ্ঞানী হলেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আর এক দুর্ঘটনায় তাঁর কর্মময় জীবনের সমাপ্তি।

ডাঃ অধ্যাপক চার্লস বেস্‌ট আজ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফিজিওলজি বই এর স্রষ্টা, সেদিনের সেই অবজ্ঞাত, ছাত্র বিজ্ঞানী। তিনি পরে ব্যানটিং-বেস্‌ট রিসার্চ ইনস্‌টিটিউটের ডিরেকটর হয়েছিলেন। সেদিন নোবেল প্রাইজ তিনি পান নি বটে,কিন্তু ইনস্যুলিন আবিষ্কারের নাম করতে হলে সকলেই বলেন, 'ব্যানটিং ও বেসট' ; একে বোধ হয় অন্যের পরিপূরক।

চিকিৎসা বিজ্ঞানীর বিশেষ অবদান আছে ; যা তাঁকে এনে দিয়েছিল বিশ্ব-জোড়া খ্যাতি। যদিও কিছু ইউরোপীয় ও বৃটিশ বিজ্ঞানী তাঁর বড় আবিষ্কারকে ছোট করে দেখেছিল সেদিন এবং তাঁকে প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত করেছিল। এই বাঙ্গালী বিজ্ঞানীর নাম ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

উপেন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুন বিহার প্রদেশের মুঙ্গের জেলার জামালপুরে। বাবা নীলমণি ব্রহ্মচারীও ডাক্তার ছিলেন, চাকরি করতেন সেই সময়ের ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়েতে। ডাঃ নীলমণি ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গুরু কেশবভারতীর দাদা শ্রীগোপাল মুখোপাধ্যায়ের অষ্টম অধঃস্তন পুরুষ। তিনি দীক্ষা নেওয়ার পরে 'মুখোপাধ্যায়' পদবী পরিত্যাগ করে গোপাল ভারতী ব্রহ্মচারী ঠাকুর রূপে পরিচিতি লাভ করেন।

উপেন্দ্রনাথ জামালপুরে রেলওয়ে স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে এনট্রান্স পরীক্ষা পাশ করার পরে এফ, এ, পাশ করার পরে হুগলী কলেজ থেকে ১৮৯৩ খ্রীঃ বি, এ, পাস করেন। এই পরীক্ষায় তিনি অঙ্ক ও রসায়নে এক সঙ্গে অনার্স ও থয়েট্স পদক পেয়েছিলেন। তারপরে চিন্তায় পড়লেন ভবিষ্যৎ পড়া নিয়ে ; অঙ্ক অথবা রসায়ন না বাবার মত চিকিৎসক হবেন। আমাদের সৌভাগ্য যে তিনি ডাক্তারী পড়ার জন্য মেডিকেল কলেজে ও রসায়ন পড়ার জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। ১৮৯৪খ্রীঃ রসায়নে প্রথম শ্রেণীতে পাস করে বিশ্ববিদ্যালয় পদক পান। মেডিকেল কলেজ থেকে ১৮৯৯ খ্রীঃ এল, এম, এস, পাস করে পরের বছর এম, বি, পাস করেন। এই পরীক্ষায় তিনি মেডিসিন ও সার্জারীতে প্রথম স্থান লাভ করে গুড্ইভ ও ম্যাকলিয়ড পদক পান। এর মাত্র দু'বছর পরেই তিনি এম, ডি, ডিগ্রী পেলেন। আরও দু'বছর পরে তিনি রক্তের লাল কণিকা বিষয়ে গবেষণা করে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি, এইচ-ডি, ডিগ্রী পান। এত তাড়াতাড়ি এতগুলি ডিগ্রী পেয়ে তিনি সেদিন সকলকে বিস্মিত করেছিলেন।

১৮৯৯ খ্রীঃ এম, বি, পাস করার আগেই তিনি প্রাদেশিক মেডিকেল সার্ভিসে যোগ দেন। দু'বছর পরে তিনি ঢাকা মেডিকেল স্কুলে ফার্মাকোলজির শিক্ষক হিসেবে বদলি হলেন। ১৯০৫ খ্রীঃ তিনি ক্যাম্বেল



উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

মেডিকেল স্কুলে* প্রথম চিকিৎসক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন এবং ঐ পদে আঠারো বছর কাজ করেছিলেন। ছাত্র অবস্থা থেকেই একটা বড় কিছু আবিষ্কার করার ইচ্ছে গড়ে উঠেছিল। পরবর্তী কালে হাসপাতালে কাজ করার সময়ে তিনি দেখলেন আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরে বহু লোক মারা যাচ্ছে। তিনি মনস্থির করলেন, এই রোগ নিরাময় করার কাজে নিজেকে নিয়োগ করবেন। কি ধরনের ওষুধ নিয়ে কাজ করবেন তিনি? ভাবতে লাগলেন। খবর পেলেন জার্মানীতে এর্লিক 'ম্যাজিক

* আজ এই হাসপাতাল স্যার নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল নামে পরিচিত।

যায়। সুতরাং মশাকে সন্দেহ করা খুবই স্বাভাবিক। তাছাড়া আসামে ও আমাদের দেশে যে সব জায়গায় কালাজ্বর হয়, সেখানে মশাও দেখা যায় খুব বেশী। কিন্তু আসামের চা-বাগান কুলী লাইনে এক অংশে ঘরে ঘরে কালাজ্বর, কিন্তু মাত্র ৩০০ গজ দূরের লাইনে কালাজ্বর, নেই। মশা যদি রোগ ছড়াত, তাহলে কি ৩০০ গজ দূরের লোকেরা রেহাই পেত? মশা খালাস পেয়ে গেল। তার পরে বহু গবেষক ছারপোকা, উকুন, ডানাহীন নীল মাছি, বেলে মাছি, সাধারণ মাছি প্রভৃতি নানা জাতের কীটপতঙ্গ নিয়ে কাজ শুরু করেন। কাউকে দোষী করা গেল না। সকলেই বেকসুর খালাস পেয়ে গেল। কালাজ্বরের জন্য কাউকে দোষী করা গেল না। মাদ্রাজে প্যাটন লক্ষ্য করলেন যে কালাজ্বর রোগীর রক্ত খাওয়ার পরে ছারপোকার পেটে কালাজ্বর পরজীবী যায়, পরে তারা বাড়ে, তাদের শুঁড় গজায়। ডাঃ (মিসেস) এডি নামে এক বিজ্ঞানী দাবি করলেন, তিনি ছারপোকার লালাগ্রন্থিতে কালাজ্বর পরজীবী দেখেছেন। তিনি মনে করলেন—একজন রোগী থেকে কিভাবে সুস্থ লোকের শরীরে কালাজ্বর পরজীবী প্রবেশ করে সেই সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। কিন্তু ডাঃ এডির দাবির সমর্থন অন্যের কাজে পাওয়া গেল না। তাছাড়া পরীক্ষার আগে মরা ছারপোকা রাখা হোত নুনজলে। ডাঃ এডি লালাগ্রন্থিতে যা দেখেছেন সেগুলো বোধ হয় অন্য কোন জিনিস, পরজীবী মোটেই নয়। তবে ছারপোকার পেটে পরজীবী যে বাড়ে সেকথাও ঠিক। যেমন গবেষণাগারের টেস্ট টিউবে জীবাণু বাড়ে।

এর পরে ডানাহীন মাছি, নীল মাছি, সাধারণ মাছি নিয়ে পরীক্ষা হোল। ভূমধ্যসাগর তীরে যেখানে কালাজ্বর হয়, সেখানে নানা ধরনের মাছিদের আসামী সন্দেহ করে তন্নতন্ন করে দেখা হোল। তারাও বেকসুর খালাস পেয়ে গেল।

তারপরে এল মশার পালা। দেখা গেল তাদের পেটেও কালাজ্বর পরজীবী বেশ বাড়ে এবং তাদের শুঁড়ও গজায়। বোঝা গেল, রক্ত তরল অবস্থায় থাকলে বহু কীট-পতঙ্গের পরজীবী বাড়তে পারে।

এবার এল বেলে মাছির পালা। এর আগে একবার বেলে মাছি

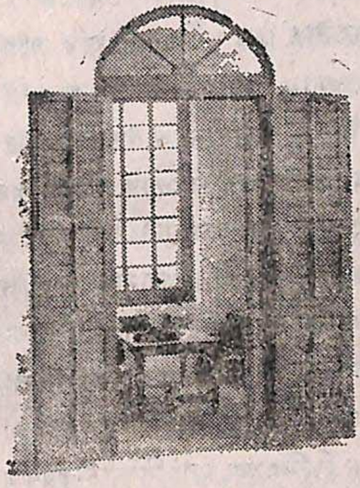
পরীক্ষায় ছাড়া পেয়েছিল। কিন্তু কলকাতা ট্রপিক্যাল স্কুলের ডাঃ নোলস্ বললেন—বেলে মাছিদের আবার বিচার করতে হবে। নোলস্ ও তাঁর সহকারীরা কলকাতা শহরকে দু'ভাগে ভাগ করলেন। এক অংশে যেখানে সারা বছর নতুন কালাজ্বর রোগী হয়, অপর অংশে গ্রাম থেকে আসা রোগী দেখা যায় বটে, কিন্তু স্থানীয় লোকদের কালাজ্বর হতে দেখা যায় না। যেমন উত্তর কলকাতা। তার পরে কলকাতায় কোন্ এলাকায় বেলে মাছি আছে আর কোন্ এলাকায় নেই, সেইভাবে ভাগ করা হোল। দেখা গেল, যে এলাকায় বেলে মাছি আছে, সেই এলাকাতেই নতুন কালাজ্বর রোগী দেখা যায়। তাহলে বেলে মাছিকে সন্দেহ করার কারণ আছে বৈকি।

এবারে ভাগ্য হোল সহায়ক। বেলেমাছি কালাজ্বর রোগীর রক্ত খাওয়ার তিন থেকে পাঁচ দিন পরে মাছির অন্ত্রে ছোট আঁচিল হতে দেখা গেল। তাহলে কি এরাই কালাজ্বরের পরজীবী? বেলে মাছিদের দিয়ে সুস্থ লোকের রক্ত খাওয়ান হল। তাদের পেটে আঁচিল দেখা গেল না। গবেষণা কাজে একবারে সিদ্ধান্ত নিতে নেই। নোলস্ আবার দেখলেন। এবার আঁচিল থেকে 'এল-ডি বডি' অর্থাৎ কালাজ্বর পরজীবী পাওয়া গেল। এর পর বসল কালাজ্বর কমিশন। তাঁরা এবং কলকাতার নোলস্ ও তাঁর সহকারীরা দ্ব্যর্থহীন ভাবে ঘোষণা করলেন, এই বেলে মাছি হোল সেই আসামী যারা কালাজ্বর পরজীবী রোগীর থেকে সুস্থ লোকের শরীরে নিয়ে যায়। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা এসব। গবেষণায় সফল হওয়ার পরে নোলস্ বলেছেন—'দীর্ঘ কুড়ি বছরে প্রতিটি কর্মীর ব্যর্থ পরিশ্রমের ইতিহাস। উঁচু আশা, ভুল পথ, ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত, অবশেষে হতাশায় তার সমাপ্তি। এককভাবে সব কর্মীর প্রচেষ্টা ব্যথ হয়েছিল শুধু সমন্বয়ের অভাবে। পরে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এলো সাফল্য।' আর উনিশ বছর পরে মাদ্রাজে স্বামীনাথন, শর্ট ও এণ্ডারসন কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবীকে বেলে মাছির কামড়ে কালাজ্বর সৃষ্টি করে সবরকম সন্দেহ, বাদানুবাদের নিরসন করেন।

কালাজ্বরের বাহককে খুঁজে পাওয়ার আগেই তার ওষুধ আবিষ্কারের চেষ্টা আরম্ভ হয়েছিল। এই ওষুধ আবিষ্কারের ব্যাপারে একজন বাঙ্গালী

বুলেট’ দিয়ে বিশেষ রোগ সারাতে পেরেছেন। ইউরোপে তখন বহু বিজ্ঞানী এর্লিকের গবেষণাকে গুরুত্ব দেন নি, কেউ কেউ বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু ডাঃ ব্রহ্মচারী এই আবিষ্কারের মধ্যে তাঁর পথের নিশানা পেলেন। ম্যালেরিয়া তো কিছুটা কব্‌জায় এসেছে, কুইনাইন দিয়ে রোগ ভাল হচ্ছে, রোগী সুস্থ হয়ে, আশীর্বাদ করে বাড়ি ফিরছে। কিন্তু কালাজ্বরে যে নিশ্চিত মৃত্যু ; অসহায় দর্শক হয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করবার নেই। তাঁর মনের ভিতর যেন গুমরে উঠছে। আমি এতো বড় ডাক্তার, এতো ডিগ্রী আমার, কিন্তু কি করতে পারছি ? একটাও কালাজ্বর রোগীকে তো বাঁচাতে পারছি না। দুঃসহ অবস্থায় তিনি যেন নিজেই রোগী হয়ে উঠেছেন। এর্লিকের কাজ সম্বন্ধে তিনি আরও খোঁজখবর করলেন। পরে ১৯১৩ খ্রীঃ আর একটি খবর তাঁর নজরে এল। দক্ষিণ আমেরিকার কোন একজন ডাঃ ভায়ান্না ‘টার্টার এমিটিক্’ শিরায় ইনজেকশন দিয়ে কালাজ্বর জাতীয় রোগ সারিয়ে তুলেছেন। ডাঃ ব্রহ্মচারী ভাবতে লাগলেন, এই ‘টার্টার এমিটিক্’ নিয়ে কাজ করবেন কি না। এর মধ্যে আর একটা খবর এলো ইতালী থেকে ; ভূমধ্যসাগরের ধারে শিশুদের কালাজ্বরে ডাঃ ক্রিসটিনা ও ডাঃ করটিনা ‘টার্টার এমিটিক’ ইনজেকশন দিয়ে সুফল পেয়েছেন। কলকাতা ট্রপিকাল স্কুল থেকে ডাঃ রোজার্স ‘টার্টার এমিটিক্’ দিয়ে ভাল ফল পাওয়ার কথা জানালেন সকলকে। কিছু দিন পরে দেখা গেল, ঐ ওষুধ বেশীদিন ব্যবহারে শরীরের দারুণ ক্ষতি করে।

ব্রহ্মচারী স্থির করলেন এই ‘টার্টার এমিটিকে’র থেকে উন্নততর জিনিস তৈরী করতে হবে। তাঁর সুবিধাও ছিল, কারণ তাঁর রসায়ন বিজ্ঞানে ভাল অভিজ্ঞতা ছিল। ‘টার্টার এমিটিক্’ জিনিসটি হল এন্টিমনি টার্টারের পটাসিয়াম সল্ট। তিনি ঠিক করলেন, পটাসিয়াম সরিয়ে সেখানে সোডিয়ামকে বসাবেন ; তার দ্বারা পটাসিয়াম-এর জন্য যে অবসন্ন ভাব হয় তা কমান সম্ভব হবে। তিনি এই পরিবর্তনে ভাল ফল পেলেন। কিছুদিন ব্যবহার করে অবশেষে তিনি দেখলেন সোডিয়াম সল্ট-ও দোষমুক্ত নয় এবং নিরাপদ নয়। তাহলে তো সোডিয়ামকেও বাদ দিতে হয়।



ক্যামবেল্স স্কুলের ল্যাবরেটারী ঘর, যেখানে
ইউরিয়া স্টিবামাইন আবিষ্কার হয়েছিল

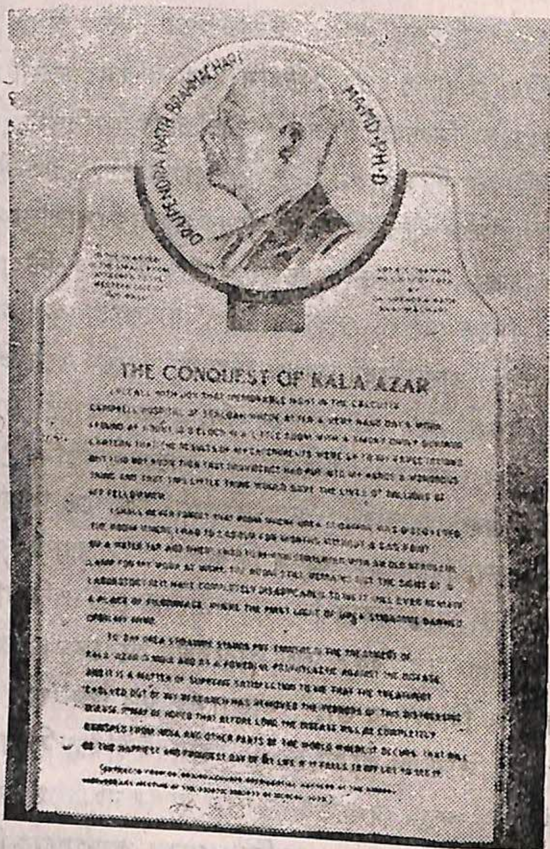
কিন্তু বাদ দিলেই তো সমস্যার সমাধান হবে না। এন্টিমনি কিভাবে দিলে রোগ নিরাময় হবে অথচ শরীরে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে না, তার পথ খুঁজে বার করতে হবে। তখন তিনি এন্টিমনিকে খুব সূক্ষ্ম অণুতে বিভাজন করে রোগীর ওপর ব্যবহার করলেন। ফল খুব আশাপ্রদ হোল না। পরের বছর কোলয়ডল এন্টিমনি তৈরি করে ইনজেকশন দিলেন। ভাল ফল পাওয়া গেল এবার; কিন্তু অসুবিধে ছিল খুব বেশী। যেমন ওষুধ তৈরির পরে অল্পদিনেই নষ্ট হয়ে যায়, সেই জন্য তৈরি করার সঙ্গে সঙ্গে দিতে হবে। এটা তো সব ক্ষেত্রে সম্ভব নয়, আর তিনি সর্বস্থানে গিয়ে রোগীর চিকিৎসা করবেন, তাও সম্ভব নয়। তার ওপর এই ওষুধ প্রস্তুত করার পদ্ধতি ছিল খুবই জটিল ও পরিশ্রমসাপেক্ষ। শিরায় ঐ ওষুধ ইনজেকশন দেওয়ারও কিছু অসুবিধা ছিল।

এটক্সিল নামে 'ঘুম রোগের' যে ওষুধ এর্লিক আবিষ্কার করেছিলেন সেই ফর্মূলা ধরে তাঁর গবেষণার পরবর্তী অধ্যায়ের আরম্ভ। এটক্সিল হোল প্যারা-আর্সেনিলিক এসিডের সোডিয়াম সল্ট, খুবই জটিল ফর্মূলা।

যাঁরা রসায়ন বিজ্ঞান চর্চা করেন, তাঁরা ছাড়া অন্যেরা হয়ত বুঝতে পারবেন না। আর্সেনিক এন্টিমনি রাসায়নিক শ্রেণীতে সমগোত্রীয়। এন্টিমনি কালাজ্বরে ফলপ্রদ, সেটাও ঠিক। এবার যদি এটক্সিল থেকে আর্সেনিক সরিয়ে এন্টিমনিকে বসান হয়, কেমন হয়? এই চিন্তা তখন শুধু তাঁর মাথায় ঘুরছে না; ইংলণ্ড, জার্মানী ও ইতালীর বড় বড় বিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রীয় সাহায্য ও বড় ঔষধ প্রস্তুতকারী সংস্থার সহযোগিতায় গবেষণা করছেন। সেই জায়গায় আমাদের ডাঃ ব্রহ্মচারী ক্যামবেল হাসপাতালের এঁদো পুকুরের ধারে, জলের কল নেই, গ্যাস বার্নার নেই, এমন একটি ঘরে হ্যারিকেনের আলোয় তাঁর গবেষণা করেছেন। সহকারী হোল বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য এম, এস, সি পাস করা তিন বিজ্ঞানী, শ্রীপরিমল বিকাশ সেন, শ্রীসারদা চরণ চৌধুরী ও শ্রীযুধিষ্ঠির দাস। আর ক্যামবেল স্কুল থেকে পাশ করা দু'জন চিকিৎসক, ডাঃ বিভূতি ভূষণ মাইতি ও ডাঃ শ্রীশচন্দ্র ব্যানার্জী। প্রতিযোগিতা সমানে সমানে তো নয়ই; দারুণ অসম প্রতিযোগিতা। পরে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ফাণ্ড অ্যাসোসিয়েশন তাঁর কাজে আশার আলো দেখে এই কাজের জন্য কিছু অর্থ সাহায্য করেন। কিছুদিন পরেই আমরা ডাঃ ব্রহ্মচারীর কাছ থেকে পেলাম কালাজ্বরের ফলপ্রদ অথচ নিরাপদ ওষুধ, যার রাসায়নিক নাম প্যারা-এমাইনোফেলিন স্টিবিনিক এসিড। কিন্তু তিনি তখনও চিন্তা করেছেন, এর চেয়ে উন্নত ধরনের স্টিবিনিক এসিড করা সম্ভব কিনা? এই ভাবনা তাঁকে পেয়ে বসল; দিনে রাতে ল্যাবরেটারীতেই কাটছে বেশী সময়, সব কাজে ভুল হচ্ছে, রাতে ভাল ঘুম আসে না। এমনি এক ভোরে আধজাগা-আধঘুমন্ত অবস্থায় তিনি যেন স্বপ্ন দেখলেন এন্টিমনি সলিউশনের সঙ্গে ফোঁটা ফোঁটা ইউরিয়া সলিউশন মেশাচ্ছেন। সেই দিনেই সোডিয়াম সরিয়ে সেখানে ইউরিয়া যোগ করা হোল। গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করতে হল; সেই রাত্রেই তিনি পেলেন তাঁর আকাঙ্খিত বস্তু, যার নাম তিনি দিলেন 'ইউরিয়া স্টিবামাইন'। এই ফর্মূলায় তৈরি করা ওষুধ অনেক বেশী স্থায়ী এবং এর বিষক্রিয়া অনেক কম। ইউরিয়া মেশানোর চিন্তা কেন এসেছিল তাঁর মাথায়? তিনি কালাজ্বরের এমন ওষুধের কথা

ভাবছিলেন যা শিরায় না দিয়ে পেশীতে দেওয়া সম্ভব। মনে এসেছিল ইউরিয়ার কথা, যা বিশেষ স্থানে ইনজেকশন দিলে অসাড় করে দিতে পারে। ইউরিয়া মেশালে হয়ত এন্টিমনি ইনজেকশনের জ্বালা বুঝতে দেবে না, অন্তত কমাতে নিশ্চয়ই পারবে। এইভাবে আবিষ্কার হোল কালা-জ্বরের ওষুধ ইউরিয়া-স্টিবামাইন। ১৯১৫ থেকে ১৯২১ খ্রীঃ দীর্ঘ ছয় বছর ধরে শতাধিক পরীক্ষার পরে তাঁর পরিশ্রমের পুরস্কার পেয়েছিলেন।

কিন্তু এত পরিশ্রমের পরেও ব্রহ্মচারীকে তাঁর ইউরিয়া-স্টিবামাইন নিয়ে নতুন পরীক্ষা দিতে হল। সেই আমলে কলকাতা স্কুল অব ট্রপিকাল মেডিসিন সাহেব ডাক্তারদের কব্জায় ছিল। তাঁদের মনে ভীষণ আঘাত লাগল ; তাঁরা চেষ্টা করে যা পারেন নি, একজন কালো ভারতীয় কিনা সেই কাজে সফল হোল! নিজেরা না পেরে জার্মানির তৈরি ওষুধের জন্য ওকালতি শুরু করলেন। ডাঃ রোজার্স বিলেতে বিজ্ঞান পত্রিকায় মিথ্যা ও বিকৃত তথ্য দিয়ে এক প্রবন্ধ লিখলেন। ব্রহ্মচারী কিন্তু ছাড়বার পাত্র ছিলেন না। তিনি জবাব লিখে পাঠালেন সেই পত্রিকায় ; দেখিয়ে দিলেন রোজার্স কিভাবে বিকৃত তথ্য পরিবেশন করেছেন। তারপরে সেই পত্রিকা সম্পাদকীয় লিখল যে ডাঃ রোজার্সের এর জন্য দুঃখ প্রকাশ করা উচিত। অবশ্য তিনি তা করেন নি। তিনি ইউরিয়া-স্টিবামাইন হাস-পাতালে পরীক্ষা করে দেখতেও রাজী হলেন না। তখন ব্রহ্মচারীকে ওষুধের গুণ পরীক্ষার জন্য অন্য পথ নিতে হোল কলকাতার বিভিন্ন হাস-পাতাল এবং শিলং-এর পাস্তুর ইন্সটিটিউটের মাধ্যমে। তখন আসামে কালাজ্বর খুব বেড়ে চলেছে। সরকারী ও বেসরকারী চিকিৎসকরা কালা-জ্বরে ইউরিয়া-স্টিবামাইন ব্যবহার করে চমৎকার ফল পেলেন। অবশেষে ১৯২৪ খ্রীঃ অক্টোবরে কালাজ্বর কমিশনের ডাইরেক্টর কর্নেল স্কট, ডাঃ পি. সেন জানালেন, 'আমাদের মতে কালাজ্বরে ইউরিয়া-স্টিবামাইন বিশেষ ফলপ্রদ। এই সিদ্ধান্তে আমরা এসেছি বহু রোগীর চিকিৎসার অভিজ্ঞতা থেকে এবং 'ইউরিয়া-স্টিবামাইন' ইংলণ্ড ও জার্মানির সমগোত্রীয় ওষুধের চেয়ে নিম্নমানের নয়।' ১৯৩৫ খ্রীঃ আসাম সরকার জার্মানির 'নিও-স্টিবোসান'-এর বদলে একমাত্র 'ইউরিয়া-স্টিবামাইন' ব্যবহার প্রচলন



গবেষণা কাজের স্বীকৃতিফলক

করেন। আসামের গভর্নর স্যার জন কার আসাম বিধানসভায় বিদায়ী ভাষণে বলেছিলেন, 'ডাঃ ব্রহ্মচারীর আবিষ্কারের ফলে গত দশ বছরে আসামে প্রায় তিন লক্ষ লোক নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।'

অবশেষে ইউরিয়া-স্টিবামাইন ভারতের গণ্ডী ছাড়িয়ে চীন, গ্রীস, মিশর ইতালী, সিসিলি, আফ্রিকার নানা দেশ ও ফ্রান্স ইত্যাদি দেশে ব্যবহার হতে থাকে।

এর পরে ডাঃ ব্রহ্মচারী, যেসব রোগীর কালাজ্বরের চিকিৎসা হয়েছে, তাদের কয়েকজনের চামড়ায় এক ধরনের গুটি হতে লক্ষ্য করেন। কখনও

আবার সেগুলো ফেটে যেতে দেখা গেল। তিনি ১৯২২ খ্রীঃ এপ্রিলে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেটে এই ধরনের প্রথম রোগীটির বিবরণ দেন। এই রোগের নাম দিলেন তিনি 'ডারম্যাল লিশম্যানয়েড,' অনেকে একে 'ব্রহ্মচারী রোগ' আখ্যা দিয়েছিলেন। ডাঃ ব্রহ্মচারী এই রোগের বিষয়ে বহু বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং রোগের কারণ বর্ণনা করেছিলেন। তিনি ছাড়া ডাঃ বিরজামোহন দাশগুপ্ত এবং পরে ডাঃ পি. সি. সেনগুপ্ত ও ডাঃ ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য এই রোগ সম্বন্ধে গবেষণা করে কিছু নতুন তথ্য যোগ করেছিলেন। তাঁরা জানিয়েছেন কালাজ্বরে কি ধরনের অপুষ্টি দেখা যায়, রক্তাল্পতার কারণ কি তাঁরা দেখিয়েছিলেন কালাজ্বরে চামড়া কালো না হয়ে সাদা হতেও পারে। ডাঃ ব্রহ্মচারীর আর একটি আবিষ্কার হল ল্যাবরেটারীতে রক্ত থেকে সঠিক ভাবে কালাজ্বর রোগ নির্ণয়ের পদ্ধতি ; যা এখন 'ব্রহ্মচারী টেস্ট' নামে পরিচিত।

শুধুমাত্র ইউরিয়া-স্টিবামাইন আবিষ্কার করেই ডাঃ ব্রহ্মচারী ক্ষান্ত হন নি। কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রিটে* নিজের বাড়িতে গবেষণার সুবিধার জন্য একটি ল্যাবরেটারী করেন। ১৯২৪ খ্রীঃ সেখানে ব্রহ্মচারী রিসার্চ ইন্সটিটিউট নামে এক ঔষধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। সেখানে শুধু ইউরিয়া স্টিবামাইন নয়, অন্যান্য বহু ওষুধ তৈরি হোত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালীর গর্বের এই প্রতিষ্ঠান ১৯৬৩ খ্রীঃ বন্ধ হয়ে যায়।

ডাঃ ব্রহ্মচারী ক্যামবেল স্কুল ছেড়ে ১৯২৩ খ্রীঃ মেডিকেল কলেজে, পরে কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে (বর্তমানে যার নাম আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ) অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে বায়োকেমিষ্ট্রির অধ্যাপক পদে কিছুদিন কাজ করেছিলেন। কোনদিন বিদেশে লেখাপড়া না করে, যে আবিষ্কার তিনি করেছিলেন, তা বিশ্বে শুধু বাঙ্গালীর নয় সমস্ত ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করেছে। তাঁর মত বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন বিজ্ঞানী পৃথিবীতে খুব অল্পই দেখা যায়।

---

* এখন এ রাস্তার নাম বিধান সরণী।

দারুণ পরিশ্রম, অনিয়মিত খাওয়া ও বিশ্রামের অভাবের জন্য তাঁর শরীর ভেঙ্গে যাচ্ছিল। তার ওপর দেখা দিল আন্ত্রিক ক্ষত। সবশেষে ডায়েবিটিস তাঁকে আক্রমণ করে। তা সত্ত্বেও তাঁর কাজের বিরাম ছিল না। অবশেষে ১৯৪৬ খ্রীঃ ৬ই ফেব্রুয়ারী সরস্বতীর বরপুত্র এই বিজ্ঞান-সাধক সরস্বতী পূজার দিন ভোর ৪টায় দেহত্যাগ করেন।

এর পরে কত বছর কেটে গেল, ভারত স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন একজন বিজ্ঞানী এদেশে হল না যাঁর কাজ ও খ্যাতি আমাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে পারে ; যাঁকে নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি।

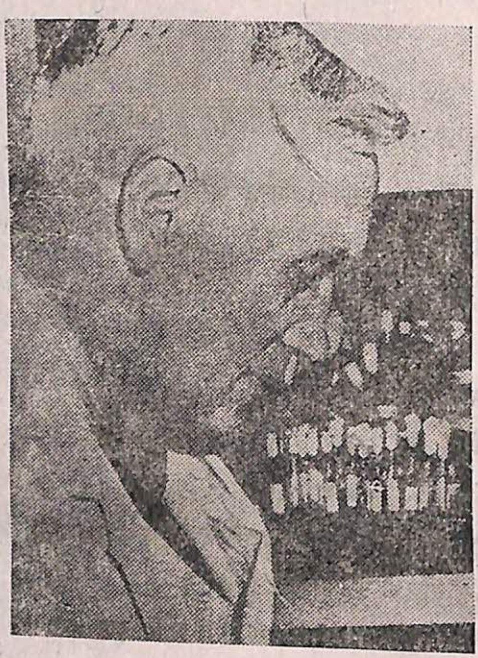
ফ্লেমিং ঃ চেইন ঃ ফ্লোরে

'পেনিসিলিন' এমন একটি নাম যা সারা বিশ্বের অল্পশিক্ষিত লোকের কাছেও আজ অপরিচিত নয়। কিন্তু পেনিসিলিন যাঁরা আবিষ্কার করে-ছিলেন, তাঁদের নাম, তাঁদের সাধনার কাহিনী বহু লোকের কাছে আজও অজানা।

পেনিসিলিন আমরা ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছি গত মহাযুদ্ধের সময় অথচ পেনিসিলিন আবিষ্কার হয়েছিল আরও বারো বছর আগে। কিন্তু এই বিস্ময়কর ওষুধ যিনি আবিষ্কার করেছিলেন, সেই আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং-এর বিরূপ ভাগ্যের জন্য বহু হতভাগ্য রোগী সেদিন পেনিসিলিন ব্যবহারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল।

ফ্লেমিং ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের এক চাষীর বৃদ্ধ বয়সের সন্তান। জন্ম ১৮৮১ খৃঃ। ফ্লেমিং-এর যখন সাত বছর বয়স, সেই সময়ে তাঁর বাবা মারা যান। আর তের বছর বয়সে তিনি লণ্ডনে তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই ডাঃ টমাসের বাড়িতে এসে উঠলেন। টমাস সেখানে একজন সাধারণ চিকিৎসক হিসাবে কাজ করছিলেন। সেখানে টমাসের আরও দুই ভাই থাকতেন। তাঁরা কাজ করতেন চশমার কাঁচ তৈরির একটি কার-খানায়, আর সংসার দেখতেন তাঁদের এক বোন।

লণ্ডনে এসে আলেকজাণ্ডার একটি পলিটেকনিক স্কুলে ভর্তি হলেন। পরে তিনি জাহাজ কারখানায় ঘণ্টায় আড়াই পেন্স মজুরিতে এক চাকরি পেলেন। মাত্র উনিশ বছর বয়সে তিনি ও তাঁর অপর দুই ভাই সাময়িক ভাবে সৈন্যদলে যোগ দেন। এক বছর বাদে সৈন্যদল থেকে মুক্তি পাওয়ার পরে ফ্লেমিং-এর ভবিষ্যৎ জীবন কোন পথে যাবে সেটা ছিল অনিশ্চিত। কিন্তু নিয়তি যাঁর হাত দিয়ে পেলিসিলিন আবিষ্কার করাবেন ঠিক করেছেন, তাঁর জীবন এভাবে ব্যর্থ হতে পারে না। সৈন্যদল থেকে যখন তিনি ছাড়া পান, সেই সময় তাঁর এক আত্মীয় মারা যান এবং এক উইলে



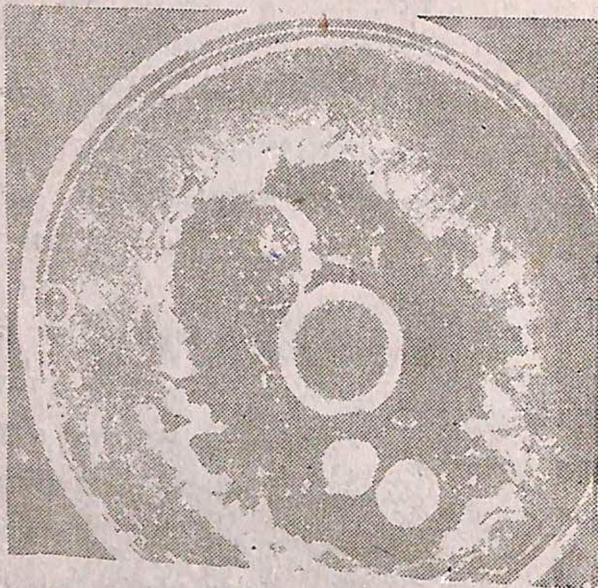
ডাঃ আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং

তাঁকে ২০০ পাউণ্ড দান করেন। দাদা টমাস তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ডাক্তারী পড়াতে পাঠান। আলেকজাণ্ডার ছাত্র হিসাবে ছিলেন দারুণ মেধাবী এবং ছাত্রজীবনে প্রায় সব পুরস্কার তাঁর ঝুলিতে পড়েছিল। পাস করার পরেই 'সেণ্ট মেরী হাসপাতালে' স্যার এলমথ রাইট-এর গবেষণাগারে সহকারী হিসেবে যোগ দিলেন।

গবেষণাগারে তাঁকে অধ্যক্ষের নির্দেশমত কাজ করতে হোত। কিন্তু এই কাজে তাঁর মন ভরত না, তিনি সব সময়ে একটা বড় কিছু করার স্বপ্ন দেখতেন। প্রতিদিনের কাজের মধ্যে কত না রোগী আসে, যাদের সামান্য কাটা বা ক্ষত বিষাক্ত হয়ে রোগীকে মৃত্যুর অন্ধকারে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, এদের কি বাঁচানো যায় না? ডাঃ এর্লিকের 'সালভারসন' -এর মত কোন ওষুধ কি আবিষ্কৃত হবে না? মনে রাখা দরকার তখনও ডোমেকের 'প্রন্টোসিল' আবিষ্কার হয় নি। ফ্লেমিং স্বপ্ন দেখেন, ঐ রকম

কোন নতুন ওষুধ পাওয়া যাবে, যা রোগজীবাণু মারতে পারবে অথচ শরীরের কোন ক্ষতি হবে না। তাঁর অধ্যক্ষ এলমথ রাইট কিন্তু রোগজীবাণু মারবার জন্য কোন ওষুধ বা রাসায়নিক বিষ ব্যবহারের দারুণ বিরোধী ছিলেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, টীকা দিয়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দিতে পারলে রোগ নিরাময় সম্ভব হবে। ফ্লেমিং নিজে এই মতবাদের বিরোধী ছিলেন না, তবে তিনি এই ধারণাও পোষণ করতেন যে রোগ নিরাময়ের জন্য ওষুধেরও দরকার আছে। মনে যাই থাক, তাঁকে যে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তা তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে থাকেন। এখানে কাজ করার সময় তিনি পাঁচ বছরে পাঁচটি মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেন। বিষয় ছিল – চোখের জল ও নাকের শ্লেষ্মা রোগজীবাণু ধ্বংস করতে পারে কি না। তিনি প্রমাণ করেছিলেন—'হ্যাঁ, তারা পারে'। কিন্তু দেশে বিজ্ঞানী সমাজে, এমন কি তাঁর সহকর্মীদের কাছেও এই নিবন্ধগুলি কোনও আগ্রহ জাগাতে পারে নি। এতে তিনি কিছুটা দুঃখ পেয়েছিলেন বটে কিন্তু হতাশ হন নি। তাঁর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করলে কখনও ব্যর্থতা আসে না।

১৯২৮ খৃঃ ইংলণ্ডের মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল রোগজীবাণু সম্বন্ধে একটি বই সম্পাদনা করছিলেন। ফ্লেমিংকে ভার দেওয়া হয়েছিল স্টাফাইলোকক্কাস জীবাণু বিষয়ে একটি অধ্যায় লেখার জন্য। তিনি স্থির করলেন কালচার প্লেটে ঐ জীবাণু চাষ করে তাদের আকৃতি প্রকৃতি নিজের চোখে দেখে এই বিষয়ে লেখা স্নুরু করবেন। সেইজন্য কালচার প্লেটে তিনি ঐ জীবাণু চাষ করতে আরম্ভ করলেন। স্টাফাইলোকক্কাস জীবাণুরা ঠাণ্ডা মোটেই পছন্দ করে না। সেইজন্য ফ্লেমিং তাঁর ল্যাবরেটারির জানালা বেশির ভাগ সময় বন্ধ করে রাখতেন। তাঁর একটি অভ্যাস ছিল পুরানো কালচার প্লেট ফেলে না দিয়ে টেবিলের ওপর রেখে দেওয়া এবং মাঝে মাঝে প্লেটের ঢাকনা খুলে দেখা। খুব গুমোট হলে তিনি জানালা খুলে বসতেন। এমনি একদিন তাঁর এক বন্ধু এলেন দেখা করতে। ফ্লেমিং তাঁকে কালচার প্লেট খুলে দেখাচ্ছেন। হঠাৎ একটি প্লেটে সবুজ-নীল শিশিরবিন্দুর মত ছত্রাক ফাংগাস তাঁদের নজরে এলো।



কালচার প্লেটে পেনিসিলিন ছত্রাকের চারপাশে রোগজীবাণু
জন্মাতে পারে নি

আর সেই ছত্রাকের চার পাশে হলুদ রং স্টাফালোকক্কাস কলোনী দেখা যাচ্ছে না। এ কী অদ্ভুত ব্যাপার !

বন্ধুটি চলে গেলেন। কিন্তু ফ্লেমিং-এর আর কোন কাজ নেই ; শুধু ভাবছেন, কি করে এমন হোল। স্টাফালোকক্কাস কেন মরে গেল। ফ্লেমিং বরাবর স্বপ্ন দেখতেন, তিনি একটা বড় কিছু আবিষ্কার করবেন একদিন। বাতাসে উড়ে আসা কোন জীবাণু তাঁর কালচার প্লেটের ওপর পড়ে তাঁকে একটা বড় কিছু আবিষ্কারের পথ দেখাবে। এই ছত্রাক কি তাহলে জীবাণু ধ্বংস করতে পারবে ? তখন ফ্লেমিং করলেন কি, সেই ছত্রাক একটু তুলে জীবাণু চাষ করার বিশেষ কালচার টিউবের (কালচার টিউব) মধ্যে দিলেন এবং সেই কালচার প্লেটটিকে যত্ন করে রেখে দিলেন।

এত বড় আবিষ্কার কিন্তু হঠাৎ ঘটে গেল। কারণ ফ্লেমিং কোন ওষুধ নিয়ে তখন কাজ করছিলেন না। অন্য কাজ করতে গিয়ে এটা হঠাৎ তাঁর নজরে পড়েছিল। তবে ফ্লেমিং-এর চোখ ও মন এই ঘটনার গুরুত্ব

অনুধাবন করবার জন্য তৈরি ছিল। সেইজন্য এই আপাতঃক্ষুদ্র কিন্তু যুগান্ত-কারী আবিষ্কার তাঁর নজর এড়াতে পারে নি। যাই হোক, তিনি এই ছত্রাকের প্রকৃতি ও গুণাগুণ লক্ষ্য করার জন্য কালচার টিউবে ছত্রাক চাষ করতে দিলেন। পরে সেই ছত্রাক নিয়ে অনেকগুলি কালচার প্লেটের মাঝখানে রেখে তার পাশ থেকে গোল করে ভিন্ন ভিন্ন প্লেটে বিভিন্ন ধরনের জীবাণু চাষ করতে দিলেন। ফ্লেমিং দেখলেন, কতকগুলি প্লেটে ছত্রাকের পাশে কোন জীবাণু জন্মায় নি, অথবা মরে গেছে। আবার কতকগুলি প্লেটে ছত্রাককে গ্রাহ্য না করে জীবাণুরা বেড়ে যেতে থাকল। ফ্লেমিং বুঝলেন এই ছত্রাক কয়েক প্রকার জীবাণু ধ্বংস করতে পারে এবং অন্য কয়েক শ্রেণীর জীবাণুর কোন ক্ষতি করতে পারে না।

এবার ফ্লেমিং ঠিক করলেন যে, জানতে হবে এই ছত্রাক কেমন দেখতে, তার প্রকৃতি কি? অনুবীক্ষণ যন্ত্রে তিনি লক্ষ্য করলেন, এটা দেখতে অনেকটা ছোট ঝাঁটার মত। তার পরে তিনি নানা বই ঘাঁটতে শুরু করলেন এবং এই সিদ্ধান্তে এলেন যে এটি 'পেনিসিলিয়াম' জাতের ছত্রাক। পরে তিনি এর নাম দিলেন 'পেনিসিলিয়াম নোটেটাম,'—যার বাংলা করলে দাঁড়ায় 'লক্ষ্য করবার মত ঝাঁটা'।

এর পর ফ্লেমিং ভাবতে লাগলেন, কিভাবে কালচার টিউবের তরল অংশ থেকে ছত্রাককে আলাদা করা যায়। তিনি কালচার টিউবের তরল খাদ্য ছেঁকে নিয়ে দেখলেন—সেই তরল পদার্থ নানা রকম জীবাণু ধ্বংস করতে পারে। এবার চিন্তা হোল এই তরল পদার্থ প্রাণীর শরীরে কোন ক্ষতি করে কি? যেই ভাবা, সেই কাজ; হাফ সি. সি. তরল পদার্থ ইঁদুরের শরীরে ইনজেকশন দিলেন। দেখা যাক, এতে কোন ক্ষতি হয় কি না। কোন ক্ষতি হল না। আচ্ছা, এবার শিরায় ইনজেকশন দিয়ে রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দেখা যাক। খরগোশের শিরায় ২০ সি. সি. ইনজেকশন দিলেন। উৎকণ্ঠায় কাটল কয়েক ঘণ্টা। না, এবারেও কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। পেনিসিলিয়াম জাতের ছত্রাক মেশানো এই তরল পদার্থের নাম দিলেন তিনি 'পেনিসিলিন'। এই শতাব্দীতে বিস্ময়কর ওষুধ, বিশ্বের প্রথম অ্যান্টিবায়োটিক।

ফ্লেমিং পেনিসিলিন আবিষ্কার করলেন বটে, কিন্তু তাকে বিশুদ্ধ অবস্থায় পৃথক করতে পারলেন না। তবে কালচার টিউবের তরল অংশ ছেঁকে নিয়ে মানুষের চোখে ক্ষতের ওপর ফোঁটা হিসাবে দিয়ে পরীক্ষা করলেন। কোন ক্ষতি তো হলই না, বরং ক্ষত খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে গেল। এর পরে তিনি পেনিসিলিন ব্যবহার করেন তাঁরই এক সহকারীর ওপর। তাঁর সহকারী ক্রাডক, নাকের পাশের সাইনাসের রোগে ভুগছিলেন। পরীক্ষা করে দেখা গেল সাইনাসের পুঁজের মধ্যে স্টাফাইলোকক্কাস ভর্তি। ৯ই জানুয়ারী' ১৯২৯ খ্রীঃ পেনিসিলিনের জল দিয়ে সাইনাস ধুয়ে দিলেন। ঘন্টা তিন পরীক্ষা করে দেখা গেল সাইনাসের প্রায় সব জীবাণু মরে গেছে।



ডাঃ হাওয়ার্ড ফ্লোরে

এই ব্যাপার খুবই উৎসাহজনক সত্য, কিন্তু মানুষের শরীরে ইনজেকশন দিতে হলে ঐ তরল পদার্থ থেকে বিশুদ্ধ পেনিসিলিন আলাদা করতে হবে। ফ্লেমিং নিজে জীবাণু বিজ্ঞানী। এ কাজ তিনি পারবেন না। অন্যের সাহায্য চাই। যাকেই সহকারী হিসাবে কাজ দেন, সে কিছুদিন কাজ করে ব্যর্থ হয়ে কাজ ছেড়ে দেয়। একজন বিয়ে করে বেশি টাকা রোজ-গারের চেষ্টায় চলে গেল, কেউ হয়ত গবেষণার কাজে টাকা কম বলে চোখের ডাক্তার হয়ে গেল। আর একজন তো মরেই গেল। ভীষণ দমে গেলেন ফ্লেমিং, এরা কেউ তাঁর কাজে বিশ্বাস করছে না। এরই মধ্যে ১৯২৯ খ্রীঃ বিজ্ঞানীদের এক সভায় ফ্লেমিং পেনিসিলিন সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বললেন। কিন্তু শ্রোতারা কেউ তাঁর আবিষ্কারকে গুরুত্ব দিলেন না, অনেকে সভা ছেড়ে চলে গেলেন। এদিকে অধ্যক্ষ স্যার রাইট তাঁকে যে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সেই কাজ ছাড়া অন্য কাজ করার জন্য ধমক দিলেন। তা ছাড়া টাকার অভাব গবেষণা কাজে বাধা হয়ে দাঁড়াল। এইভাবে প্রতি পদে বাধা পেয়ে তিনি ভীষণ ভাবে নিরুৎসাহিত হলেন। মনে আঘাত পেলেন। কারণ কেউ তাঁকে বুঝতে পারছে না। তবু তিনি ১৯২৯ খ্রীঃ ইংল্যাণ্ডে চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক পত্রিকার জন্য একটি প্রবন্ধ লিখলেন। সেটি প্রকাশের আগে গবেষণাগারের যিনি অধ্যক্ষ তাঁকে দেখিয়ে, তাঁর অনুমতি নিয়ে তবে প্রকাশের জন্য দেওয়াই হচ্ছে নিয়ম। তিনি সেইজন্য প্রবন্ধটি পেশ করলেন স্যার রাইট-এর কাছে। প্রথমে তিনি অনুমতি দিতে রাজী হলেন না। কিন্তু ফ্লেমিং এবারে নাছোড়-বান্দা ; তিনি এই নির্দেশ মানতে রাজী হলেন না। তখন রাইট বললেন শেষের কয়েকটা লাইন বাদ দিতে, যেখানে লেখা ছিল 'পেনিসিলিন ইনজেকশন হিসাবে বা ক্ষতস্থানের ওপর লাগালে রোগজীবাণু ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে।' ফ্লেমিং জেদ ধরলেন, না একথাও থাকবে। অবশেষে রাইট নতি স্বীকার করে প্রবন্ধটি অপরিবর্তিত অবস্থায় প্রকাশের অনুমতি দিলেন এবং শেষ পর্যন্ত লেখাটি প্রকাশিত হল ঐ বছরেই জুন মাসে।

এর পরে (১৯৩৫ খ্রীঃ) ডোমেকের প্রণ্টোসিল আবিষ্কারের খবর সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল। ফ্লেমিং বলতেন পেনিসিলিন, সালভারসন ও

প্রণ্টোসিলের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ; কিন্তু ভাগ্যের বিরূপতায় তিনি পেনিসিলিন বিশুদ্ধ অবস্থায় পৃথক করার পদ্ধতি আবিষ্কারে ব্যর্থ হয়েছেন। এবার তিনি সেণ্ট মেরী মেডিকেল স্কুল-এর ফার্মাকোলজির অধ্যাপককে অনুরোধ জানালেন, পেনিসিলিন পৃথক করার উপায় আবিষ্কারের জন্য। একথা অধ্যক্ষ রাইট-এর কানে যেতে আবার ধমক খেলেন ফ্লেমিং ; ওষুধ দিয়ে শরীরের ক্ষতি না করে, রোগজীবাণু ধ্বংস করা যে সম্ভব, এ তথ্য রাইট কিছুতেই মানতে রাজী ছিলেন না।

১৯৩৬ খ্রীঃ আন্তর্জাতিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের এক সভায় ফ্লেমিং দেখালেন যে পেনিসিলিন-এর জীবাণু ধ্বংসের ক্ষমতা কত বেশী ; কিন্তু শ্রোতারা কেউই তাঁর বক্তৃতায় খুব একটা গুরুত্ব দিলেন না বা আগ্রহ প্রকাশ করলেন না।

নিজের দেশে, নিজের গবেষণাগারে প্রতি পদে বাধা পেয়ে পেনিসিলিন পৃথকীকরণ ও উৎপাদনের প্রচেষ্টা পিছিয়ে গেল আর ফ্লেমিং নিজেও তখন হাল ছেড়ে দিয়েছেন। তবে আমেরিকায় তৃতীয় আন্তর্জাতিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের সভায় যোগ দিয়ে তিনি এই সান্ত্বনা পেলেন যে সে দেশের খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানীরা লাইসোজাইম ও পেনিসিলিন-এর কাজ কতটা অগ্রসর হয়েছে তা জানতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। ফ্লেমিং কিন্তু অকপটে সেখানে প্রার ব্যর্থতার কথা স্বীকার করেন।

এসব হোল পেনিসিলিন আবিষ্কারের প্রথম দিকের সাফল্য ও ব্যর্থতার কাহিনী। এদিকে গ্রেট বৃটেনের অক্সফোর্ড শহরে স্যার উইলিয়াম ডুন স্কুল অব প্যাথোলোজি-তে ডাঃ হাওয়ার্ড ফ্লোরে, প্রণ্টোসিল-এর সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে, রোগজীবাণু ধ্বংস করতে সক্ষম এমন কোন ওষুধ নিয়ে গবেষণা করতে মনস্থির করলেন। তিনি তাঁর এক সহকারী ডাঃ চেইনকে তথ্য সংগ্রহের জন্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিভিন্ন পত্রিকা খুঁজে দেখতে নির্দেশ দিলেন। চেইন নিজে কিন্তু বৃটিশ নন ; তিনি ছিলেন এক জার্মান ইহুদী ; তাঁর বাবা ছিলেন রাশিয়ান আর মা জার্মান। ১৯৩৩ খ্রীঃ ৩০ শে জানুয়ারী অর্থাৎ যেদিন হিটলার জার্মানীর শাসন ক্ষমতা দখল করেন, সেই দিনই চেইন নাৎসী অত্যাচারের ভয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে



ডাঃ ই. চেইন

যান। তিনি ছিলেন বায়ো কেমিষ্ট্রিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী ; ইংলণ্ডে পৌঁছে তিনি খ্যাতনামা বিজ্ঞানী অধ্যাপক জে, বি, এস, হলডেনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন, উদ্দেশ্য ছিল যে কোন কাজ নিয়ে অষ্ট্রেলিয়া বা কানাডা যেখানে হোক চলে যাওয়া। কিন্তু ভাগ্য তাঁকে অক্সফোর্ড-এ ডাঃ ফ্লোরের গবেষণাগারে স্থায়ী কাজের সুযোগ করে দিয়েছিল। দায়িত্ব নিয়ে চেইন চিকিৎসাবিজ্ঞানের পত্রিকা খুঁজতে শুরু করলেন এবং তাঁর নজরে পড়ল ১৯২৯ খ্রীঃ পেনিসিলিন বিষয়ে লেখা ডাঃ ফ্লেমিং-এর সেই প্রবন্ধটি। লেখা পড়ে তিনি জানলেন যে পেনিসিলিন পরিশোধন করা বা বেশি পরিমাণে তৈরি করার প্রচেষ্টা সফল হয়নি। চেইন ফ্লোরেকে প্রবন্ধটি দেখালেন। তাঁরা দুজনে তখন রকফেলর ফাউনডেসান-এর শরণাপন্ন

হলেন, কিছু অর্থ সাহায্যের জন্য। তাঁদের ভাগ্য ছিল ভাল ; আবেদনে সাড়া পাওয়া গেল। প্রতি বছর ৫০০০ ডলার হিসাবে পাঁচ বছরে ২৫০০০ ডলার মঞ্জুর হোল। কাজ শুরু হোল ১৯৩৮ খ্রীঃ। চেইন ফ্লেমিং-এর পদ্ধতিতে অশোধিত পেনিসিলিন তৈরি করার পর তাকে কালচার টিউবের অন্যান্য উপাদান থেকে পৃথক করতে সক্ষম হলেন। যোগ্য সহকারীর অভাবে ফ্লেমিং গবেষণা কাজের এই অবস্থায় থেমে গিয়েছিলেন। ডাঃ ফ্লোরে এবার সেই পরিশোধিত পেনিসিলিনের গুণাগুণ পরীক্ষা করলেন। তিন দফায় ইঁদুরের ওপর পরীক্ষা করে তাঁরা পেনিসিলিনের কার্যকারিতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবার পরে ১৯৪০ খৃঃ ২৪ অগস্ট ইংলণ্ডের চিকিৎসা বিষয়ক বিখ্যাত সাময়িকী ল্যানসেট পত্রিকায় তাঁদের অভিজ্ঞতার বিবরণ প্রকাশ করলেন। ফ্লেমিং এই লেখাটি পড়লেন, আর ছুটলেন অক্সফোর্ডে ; আবিষ্কারের কৃতিত্বের দাবি জানাতে নয়, সফল বিজ্ঞানীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাতে। চেইন-এর জীবনের পরম বিস্ময় অপেক্ষা করছিল সেদিন। ফ্লেমিংকে দেখে তিনি অবাক্ ; কারণ তাঁর ধারণা ছিল ফ্লেমিং বোধহয় মারা গিয়েছেন। তা না হলে এত বড় আবিষ্কারের পরে তিনি গবেষণা শেষ করেন নি কেন ? চেইন বললেন, 'স্যার, আপনি জীবিত জানলে আপনার কাছে আগেই উপদেশ নিতে যেতাম ; কিন্তু আপনি কাজ অসম্পূর্ণ রেখেছিলেন কেন ?'

ফ্লেমিং স্বীকার করলেন, 'যোগ্য সহকারীর অভাব, অর্থের অভাব ও অধ্যক্ষের বিরূপ মনোভাব আমায় কাজ বন্ধ করতে বাধ্য করেছিল।'

এর পরে ফ্লোরে বৃটেনের রসায়নীক শিল্পপতিদের দরজায় দরজায় ঘুরলেন। কিন্তু বৃটেন তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে ; কেউই সাহায্য করতে সম্মত হোল না। ফ্লোরে চিন্তিত, কি করা যায় ? এমন সম্ভাবনাপূর্ণ ফলপ্রদ ওষুধ কি মানুষের কল্যাণ কাজে লাগানো যাবে না ?

ফ্লোরে কিন্তু হার মানতে রাজী নন। তিনি কিছু পেনিসিলিনের নমুনা নিয়ে আমেরিকার দিকে যাত্রা করলেন ; যদি সেদেশে সাহায্য পাওয়া যায়। তখন যুদ্ধের সময়, দারুণ বিপদসংকুল সমুদ্রযাত্রার ঝুঁকি নিয়ে তিনি আমেরিকা পৌঁছোলেন। যাত্রাপথ খুব উৎকণ্ঠায় কেটেছিল। শুধু

পথের বিপদ নয়, যদি পেনিসিলিয়াম ছত্রাক মরে যায় তবে যাওয়াটাই ব্যর্থ হবে।

ডাঃ ফ্লোরে সেদেশে বিজ্ঞানী ও শিল্পপতিদের পেনিসিলিনের দারুণ সম্ভাবনা শক্তি বিষয়ে বিশ্বাস উৎপাদন করতে পেরেছিলেন। তাঁদের সামনে তখন সমস্যা ছিল কি উপায়ে বেশি পরিমাণে পেনিসিলিন ছত্রাক উৎপাদন করা যায়। সামরিক বাহিনীর লোকদের নির্দেশ দেওয়া হল বিভিন্ন জিনিষের নমুনা সংগ্রহ করবার জন্য, যাতে বেশী পরিমাণে ছত্রাক উৎপাদন করা সম্ভব হয়। কিন্তু কোন নমুনা ফ্লেমিং-এর নমুনার চেয়ে উন্নততর হতে দেখা গেল না। ফ্লোরে অবশেষে এক মহিলাকে নিয়োগ করলেন বাজার থেকে পচা, ছাতাপড়া ফল, তরকারি কিনে আনবার জন্য। তার নাম মেরী, কিন্তু বাজারের লোকেরা তাকে বলত 'ছাতাপড়া মেরী'। একদিন মেরী বাজার থেকে নিয়ে এল ছাতাপড়া, পচা তরমুজ। সেই ছত্রাককে কাল্চার টিউবে বাড়তে দেওয়া হল। এই তরমুজের ছত্রাক থেকে পাওয়া গেল প্রচুর পরিমাণে উচ্চমানের পেনিসিলিন। আজ বিশ্বের বেশীর ভাগ পেনিসিলিন এই নমুনা থেকে তৈরী হয়।

১৯৪২ খ্রীঃ রোগ নিরাময়ের জন্য পেনিসিলিন ব্যবহার আরম্ভ হোল। প্রথমে যুদ্ধে আহত সৈন্যদের ওপর ও অল্প কয়েকপ্রকার রোগীর ওপর পরীক্ষামূলক ভাবে পেনিসিলিন ব্যবহার করে বিস্ময়কর ফল পাওয়া গেল। লণ্ডনের বিখ্যাত 'টাইমস' পত্রিকা ১৯৪২ খ্রীঃ ২৭শে আগস্ট পেনিসিলিনের বিস্ময়কর কার্যকারিতা সম্বন্ধে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করে। সেই প্রবন্ধে একথাও বলা হয়েছিল যে নতুন ওষুধ পেনিসিলিন, প্রণ্টোসিল জাতীয় সালফোনামাইডের চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী। কিন্তু ঐ নিবন্ধে ফ্লেমিং বা অক্সফোর্ডের বিজ্ঞানীদের অবদান সম্বন্ধে কোন উল্লেখ ছিল না। এই প্রবন্ধ প্রকাশের পরে স্যার এলমথ রাইট ৩১শে আগস্ট 'টাইমস্' পত্রিকার সম্পাদককে এক পত্র লেখেন। সেই পত্রে তিনি প্রস্তাব করেছিলেন 'যদি পেনিসিলিন আবিষ্কারের জন্য কাউকে জয়মাল্য দিতে হয় তবে সেই মালা পাওয়া উচিত আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং-এর'। স্যার রাইট পেনিসিলিন আবিষ্কারের কাজে যে বাধা সৃষ্টি করেছিলেন, নিজের এই

দোষ স্বীকার করে তার কিছুটা স্খালন করার চেষ্টা করেন।

১৯৪৪ খ্রীঃ ডাঃ ফ্লেমিং ও ডাঃ ফ্লোরেকে বৃটিশ সরকার 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত করেন। পরের বছর ফ্লেমিং, চেইন ও ফ্লোরে পেনিসিলিন আবিষ্কারে তাঁদের মিলিত অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে যৌথভাবে 'নোবেল পুরস্কার' পান।

স্যার ফ্লেমিং ১৯৫৫ খ্রীঃ পরলোকগমন করেন। তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন নিজেকে গবেষণার কাজে নিয়োজিত রেখেছিলেন এবং কি করে গবেষণা করতে হয় ছাত্রদের ও গবেষকদের সেই বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। আর স্যার হাওয়ার্ড ফ্লোরে পরে চলে যান অস্ট্রেলিয়ায় এবং বাকী জীবন সেখানে গবেষণার কাজ করেন। ডাঃ চেইন ১৯৪৮খ্রীঃ পর্যন্ত অক্সফোর্ডে কাজ করেন। কিন্তু উচ্চমানের যন্ত্রপাতির অভাব, অপ্রতুল অর্থ তাঁর গবেষণা কাজে ব্যাঘাত ঘটায় এবং তিনি অক্সফোর্ড ছেড়ে চলে যান রোমে। পরে ১৯৬১ খ্রীঃ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে অধ্যাপক পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করে এবং তিনি সেই পদ গ্রহণ করেন, শেষে ১৯৭১ খ্রীঃ অবসর নিলেন।

ফ্লেমিং-এর এই আবিষ্কার চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক নতুন পথনির্দেশ। এর পরে আবিষ্কার হল একের পর এক জীবনরক্ষাকারী অ্যান্টিবায়োটিক, যার দ্বারা জীবাণু ঘটিত রোগ চিকিৎসা করতে চিকিৎসকদের আজ খুব সুবিধা হয়েছে। এমন বহু রোগ আছে, যে রোগে মানুষ অকালে প্রাণ হারাত, সেই সব ভীষণ রোগ আজ মানুষের কাছে হার মেনেছে।

সেলম্যান ওয়াকস্‌ম্যান

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ। ২রা নভেম্বর আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া বন্দরে জাহাজ থেকে নেমে এলেন বাইশ বছরের এক রুশ যুবক, যার নাম সেলম্যান এ ওয়াকস্‌ম্যান। কারো বিশেষ নজরে পড়ার ব্যাপার নয়, মনে রাখবার মত কথাও নয়। তখন এমন কত লোকই তো রাশিয়া ছেড়ে অন্য দেশে চলে যাচ্ছিল। সেলম্যানের জ্ঞাতি ভাইয়েরা আরও আগেই রাশিয়া ছেড়ে আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছিল। কিন্তু সেলম্যান ওয়াকস্‌ম্যানের আমেরিকা আসার দিনটি স্মরণীয় হয়ে আছে কেন? কারণ তাঁর হাত দিয়ে আমরা পেলাম এমন একটি ওষুধ, যা সারা বিশ্বের ক্ষয়রোগীদের হতাশ মনে নিয়ে এলো আশার বাণী। মনের অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে অসময়ে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছিল যাদের, নতুন করে বেঁচে ওঠার আশা সঞ্জীবিত হল তাদের মনে। সেলম্যান ওয়াকস্‌ম্যানের জন্ম হয়েছিল রাশিয়ার ইউক্রেন প্রদেশের খুব ছোট শহর প্রিলুকাতে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ৮ই জুলাই। সেদিন সেখানের লোকদের দারিদ্র ছিল আমাদের কল্পনার বাইরে।

ছাত্র হিসেবে সেলম্যান ছিলেন দারুণ মেধাবী। খুব সহজেই তিনি পাঠ্য বিষয় বুঝে নিতেন। মা নিজেও তাঁকে সময় পেলেই পড়াতেন। মাত্র তের বছর বয়সে মায়ের নির্দেশমত বাড়িতে লাইসেন্সবিহীন ছোট্ট স্কুল করে শহরের গরীব ছেলেমেয়েদের পড়াতে শুরু করেন। তারা যেহেতু গরীব, স্কুলে লেখাপড়া শেখার সুযোগ তাদের ছিল না। কাজেই যেটুকু শেখানো যায় তাই ভাল। আর এতে সেলম্যানের নিজেরও শিক্ষকতা বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছিল।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ। তাঁর বিদ্যালয় শিক্ষাক্রম প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এই সময় তাঁর মায়ের 'আন্ত্রিক অবরোধ' রোগ হয়। জরুরি অস্ত্রোপচার করতে হবে, না হলে জীবন সংশয়। কিন্তু সে তো ছোট শহর প্রিলুকাতে

সম্ভব নয়। অগত্যা ট্রেনে এক রাতের পথ দুইশত মাইল দূরে কিয়েভ শহরে বড় হাসপাতালে এনে ভর্তি করা হল সেলম্যানের মাকে, কিন্তু তখন তাঁর যা অবস্থা তখন অস্ত্রোপচার-সম্ভব ছিল না। দু সপ্তাহ যমে-মানুষে চলল টানাটানি। মায়ের শয্যাপাশে সেলম্যান অতন্দ্র প্রহরী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠুর মৃত্যু এসে মাকে ছেলের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।



গবেষণাগারে ডাঃ সেলম্যান ওয়াকস্‌ম্যান—সামনে কালচার প্লেট ও কালচার টিউব

এই ঘটনা সেলম্যানের মনের গভীরে যে ক্ষত সৃষ্টি করেছিল, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। তিনি স্থির করলেন, রাশিয়া ছেড়ে অন্য কোন দেশে চলে যাবেন।

প্রথমে সেলম্যান আমেরিকাতে তাঁর খুড়তুতো ভাই মেনডেল কর্ণব্লাটের খামার-বাড়িতে উঠলেন। এই খামারটি ছিল নিউ জার্সি রাজ্যের মেটাচেন গ্রামে। এর কয়েক মাইল দূরেই ছিল নিউব্রানসউইক ও রাটজার্স কলেজ, যেখানে সেলম্যানের দ্বিতীয় পর্যায়ের শিক্ষা আরম্ভ হয়। তবে তিনি যখন সেদেশে এলেন তখন কলেজে ভর্তি হবার সময় পার হয়ে গেছে। সময় নষ্ট না করে তিনি কয়েক মাস তাঁর ভাইয়ের খামারবাড়িতে কাজ করলেন। সেখানে তিনি বুঝলেন খামার চালাবার সমস্যা কি, বীজ চেনা, নানা ধরনের বীজে কি তফাত, সার কিভাবে তৈরি করা যায়, মুরগী পালন ইত্যাদি নানা বিষয়ে হাতে কলমে শিখলেন। এই শিক্ষা তাঁর পরবর্তী জীবনে খুব কাজ দিয়েছিল।

তার পরের বছর রাটজার্স কলেজে ভর্তির সময় এসে গেল। সেলম্যান একদিন কলেজে জীবাণু বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ডাক্তার জেকব লিপ-ম্যানের কাছে তাঁর মনের কথা বললেন। ডাঃ লিপম্যান নিজেও ছিলেন

দেশত্যাগী রাশিয়ান ; তিনি তাঁকে কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ে পড়তে পরামর্শ দিলেন এবং নিউব্রানস্‌উইক রাজ্যের আগামী বৃত্তি পরীক্ষা দিতে বললেন। সেলম্যান সেইমত পরীক্ষা দিলেন, সফল হলেন এবং ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে রাটজার্স কলেজে কৃষি বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে ভর্তি হলেন। প্রথম দিকে একটু অসুবিধা হয়েছিল। কারণ সে দেশের ভাষা, আচার-ব্যবহার সামাজিকতা ছিল তাঁর কাছে অপরিচিত। তা ছাড়া আমেরিকান ছাত্ররা তাঁর উচ্চারণ ও ভাষার ব্যাপারে প্রায়ই তাঁকে উপহাস করত। কিন্তু সেলম্যান সব অপমান উপহাস উপেক্ষা করে এগিয়ে যেতে লাগলেন। তিনি স্থিরসংকল্প নিয়েছিলেন যে কিছুতেই পরাজয় স্বীকার করবেন না।

দু' বছর পড়ার পরে সেলম্যান কলেজের খামারবাড়িতে ঘণ্টায় এক সেণ্ট পারিশ্রমিকে একটি কাজ নিলেন। এতে তাঁর অর্থ সমস্যার কিছু সুরাহা হল এবং তিনি কলেজের কাছে একটি ঘর ভাড়া নিলেন। কলেজের খামারে প্রতিমাসে তিনি পরিখা খনন করতেন, মাটির ওপরে বিভিন্ন ধরনের জীবাণুর আকৃতি প্রকৃতি লক্ষ্য করে লিখে রাখতেন। তিনি আরও লক্ষ্য করলেন যে বিভিন্ন স্তরের মাটির প্রকৃতিএকে অন্য থেকে আলাদা। জানতে ইচ্ছে হল তার যে মাটির বিভিন্ন স্তরের জীবাণু কেমন হতে পারে। নির্বীজন পদ্ধতিতে (এসেপটিক) মাটির নমুনা নিয়ে বিশেষভাবে তৈরি করা কালচার প্লেটে তিনি জীবাণু চাষ করতে শুরু করলেন। তিনি দেখলেন নানা ধরনের জীবাণু, কিন্তু তাদের সঙ্গে ছত্রাক জাতীয় প্রাণীও সহাবস্থান করে। কয়েক জায়গায় অনেক ছত্রাক কলোনী তৈরি করে, খালি চোখে দেখলে তাদের জীবাণু বলে মনে হবে, কিন্তু অনুবীক্ষণ যন্ত্রে তাদের প্রকৃত রূপ ধরা পড়ে। তাঁর শিক্ষকরা এ বিষয়ে বিশেষ কিছু জানতেন না। ছাত্র জীবনেই এক নতুন তথ্য আবিষ্কার করলেন সেলম্যান। বহু বছর পরে জানা গেল এই ছত্রাক 'একটিনোমাইসেটিস' জাতির এক উচ্চ পর্যায়ের জীবাণু এবং এরা গৃহপালিত পশু ও মানুষের এক প্রকার রোগ সৃষ্টি করে। অপর এক শ্রেণীর ছত্রাক থেকে পাওয়া পেনিসিলিন, সেই রোগ নিরাময় করতে পারে।

১৯১৫ সালে সেলম্যান স্নাতক হলেন। মেধাবী ছাত্রকে সকলেই নিজের কাছে পেতে চায় সহকারী বা সহকর্মী হিসেবে। কলেজের উদ্ভিদ বিজ্ঞানের অধ্যাপক হ্যালস্টেড, সেলম্যানকে তাঁর গবেষণাগারে কাজ করতে আমন্ত্রণ করলেন। কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই সেলম্যান মাটিকে ভালবেসেছেন, তার সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী ছিলেন। মাটিকে তিনি শুধু মাটি হিসেবে দেখতেন না। মাটির মধ্যে তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল কোটি কোটি জীবাণুর সজীব জগৎ। মাটি বোধ হয় তাঁকে জাদু করেছিল। চাষী লাঙল দিয়ে চাষ করার পরে মাটি শুঁকে দেখতেন। দেখতেন মাটির নিচে কত বিভিন্ন রকমের পোকা, জীবাণু। ছোট বয়সে তিনি মায়ের কাছে বাইবেল শুনতেন। এই ধর্মগ্রন্থের একটি উপদেশ তাঁর মনের গভীরে রেখাপাত করেছিল। 'ঈশ্বর মাটি থেকে ঔষধ সৃষ্টি করেছেন এবং যে জ্ঞানী সে মাটিকে অবহেলা করবে না, ঘৃণা করবে না।'

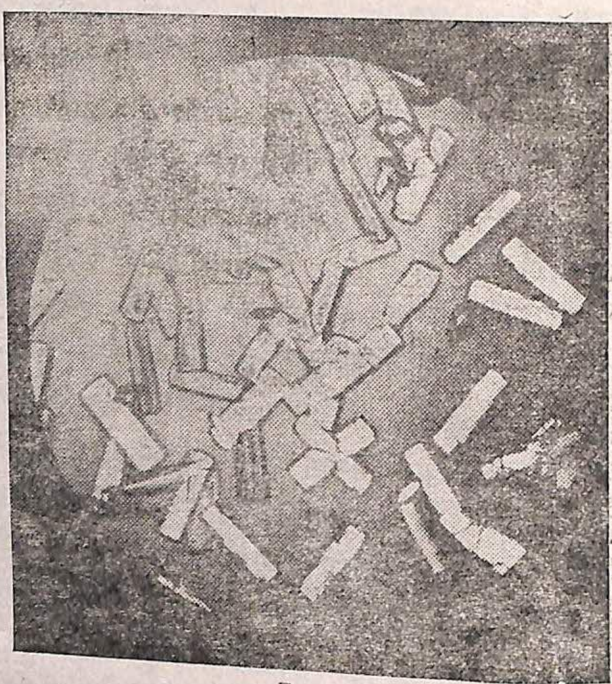
সেলম্যান মাটিকে ঘৃণা করেন নি, বরং মাটি সম্বন্ধে তাঁর আরও কিছু জানবার আগ্রহ বেড়ে গিয়েছিল। তিনি সবিনয়ে অধ্যাপক হ্যালস্টেডের আমন্ত্রণ প্রত্যাখান করে, নিউজার্সি কৃষি বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানে কাজ নিলেন বিজ্ঞানী হিসেবে এবং সেখানেই তাঁর জীবনের বেশি সময় কেটেছিল গবেষক রূপে।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর বিয়ে হল প্রিলুকার মেয়ে শ্রীমতী ডেবোরা মিটনিকের সঙ্গে। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে জৈব রসায়ন নিয়ে কাজ করার প্রস্তাব দিয়েছিল ইতিপূর্বে। তিনি সেই প্রস্তাব গ্রহণ করে-ছিলেন এবং বিবাহের পরদিনই দুটি স্যুটকেস নিয়ে দুইজনে চললেন ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলিতে। সেখানে মৌলিক গবেষণা করে স্নাতকোত্তর পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি পেলেন। এই গবেষণা ছিল বিজ্ঞানে এক নতুন অধ্যায়ের সংযোজন—যা পরে সয়েল মাইক্রোবায়োলজি নামে পরিচিত হয়েছে। এই গবেষণায় তিনি দেখালেন যে মাটির যত গভীরে যাওয়া যায় জীবাণু সংখ্যা ততই কমতে থাকে, কিন্তু ছত্রাক জাতীয় একটিনো-মাইসেটিস সেই অনুপাতে কমে না। এমন কি মাটির অনেক গভীর স্তরে তিনি ছত্রাকের উপস্থিতি প্রমাণ করলেন। তিনি আরও প্রমাণ

করলেন যে, জীবাণুদেরও গোষ্ঠী আছে। কখনও একদল জীবাণু অপর দলকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে, আবার কখনও হয়ত অপর দলের সঙ্গে যুদ্ধ করে হয় তাদের মেরে ফেলে, না হয় নিজেরা মরে যায়। আরও এক আশ্চর্য তথ্য তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল, সেটি হল মাটিতে রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু বেশি দেখা যায় না। কেন? রোগীর মল, মূত্র বা রোগে মরে যাওয়া প্রাণী তো মাটিতেই থাকে, সেই রোগজীবাণু কোথায় যায়? মাটিতে তাদের পাওয়া যায় না কেন? এই 'কেন'র উত্তর খুঁজতে গিয়ে তিনি বুঝতে পারলেন, মাটিতে যে জীবাণুরা থাকে, তারাই রোগজীবাণুকে ধ্বংস করে। এইবার তিনি চিন্তা করলেন যে, মাটিতে পাওয়া জীবাণু বা তাদের তৈরি কোন জৈব রসায়ন দিয়ে মানুষের ক্ষতিকারক রোগজীবাণু ধ্বংস করা সম্ভব হতে পারে কি না।

বার্কলিতে দুবছর কাজ করে ডাঃ ওয়াকস্ম্যান রাটজার্সে ফিরে এলেন। তাঁর মনে যে প্রশ্ন জেগেছিল তাতে ইন্ধন দিল জাতীয় গবেষণা সংস্থা ও আমেরিকার টি. বি. সংস্থা। তাঁরা ডাঃ ওয়াকস্‌ম্যানকে যক্ষ্মারোগ জীবাণু মাটির সংস্পর্শে এলে কি হয়, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করবার জন্য অনুরোধ করলেন। দেখা গেল, তারা বেশি দিন বাঁচে না। কেন, কে তাদের মেরে ফেলে? নিশ্চয়ই মাটির কোন জীবাণু বা ছত্রাক। ডাঃ ওয়াকস্‌ম্যান তাঁরই এক সুযোগ্য সহকারী ডাঃ রেনে জে ডুবোঁকে এই কাজের ভার দিলেন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে টাইরোথ্রিসিন নামে এক জীবাণু পৃথক করলেন ডাঃ ডুবোঁ, যা অনেক প্রকার রোগ জীবাণু মেরে ফেলতে পারে। কিন্তু টাইরোথ্রিসিন ভীষণ বিষাক্ত। মানুষ বা কোন প্রাণী তা সহ্য করতে পারবে না। এই আবিষ্কারকে কিন্তু বিফল বলা যাবে না। কারণ, এই আবিষ্কার এক সুদূরপ্রসারী ইঙ্গিত নিয়ে এল বিজ্ঞানী সমাজে। কারণ এর দ্বারা জানা গেল যে মাটি থেকে জীবাণুর সাহায্যে রোগ নিরাময় সম্ভব হতে পারে। এখন খুঁজতে হবে, কোথায় সেই জীবাণু?

ডাঃ ওয়াকস্‌ম্যান ও তাঁর সহকারীরা জীবাণু খুঁজে বার করার কাজে হাত দিলেন। কোথায় সেই জীবাণু, তা তো জানা নেই। তাঁরা খুঁজতে



স্ট্রেপটোমাইসিন স্ফটিক (অনুবীক্ষণে বড় করে দেখানো)

লাগলেন নানা জায়গায়। মাঠ, জঙ্গল, জলা, ডোবা, নদী সমুদ্র সারগাদা কোথাও বাদ দিলেন না তাঁরা। ক্ষ্যাপার মত খুঁজতে লাগলেন সেই পরশপাথর, যার ছোঁয়া লেগে মানুষের রোগ সারবে। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে একটিনোমাইসেটিস জাতীয় ছত্রাক থেকে পাওয়া গেল একটিনোমাইসিন ; কিন্তু সেটাও দেখা গেল ভীষণ বিষাক্ত। এদিকে কলেজ কর্তৃপক্ষ জানালেন যে, তাঁদের আর্থিক ক্ষমতা খুব ভাল নয় এবং এই ধরনের কাজে অর্থের প্রয়োজন এত বেশি যে, তাঁদের পক্ষে আর খরচ চালান সম্ভব নয়। ভাবনায় পড়লেন ডাঃ ওয়াকস্‌ম্যান। শেষে কি সাফল্যের দরজায় এসে তাঁকে থেমে যেতে হবে ? তিনি তখন আমেরিকার বিখ্যাত ঔষধ-প্রস্তুতকারক সংস্থা মার্ক শার্প অ্যাণ্ড ডোম কোম্পানীর শরণাপন্ন হলেন। তাঁরা ডাঃ ওয়াকস্‌ম্যানের গবেষণা সম্পর্কে কিছু কিছু খবর জানতেন, এক কথায় সব রকম সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। ব্যবসায়ীর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়

ও বিজ্ঞানীর এই মিলন ফলপ্রসূ হয়েছিল। ডাঃ ওয়াকস্‌ম্যান সেখানে কাজ করে খুব খুশি হয়েছিলেন এবং নিজেই বলেছেন যে, 'সেখানে গবেষণার সুন্দর পরিবেশ ছিল, ছিল মৌলিক গবেষণা করার অঢেল সুযোগ এবং তাঁরা গবেষণার গুরুত্ব ঠিকমত বুঝতেন ও সব ব্যাপারে সহযোগিতা করতেন।' ডাঃ ওয়াকস্‌ম্যানের সঙ্গে তাঁদের এই সহযোগিতা বহু বছর ধরে চলেছিল।

মার্ক কোম্পানীর নতুন গবেষণাগারে পুরাতন ও নতুন সহযোগীদের সাহায্যে একের পর এক অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার হল; কিন্তু কোনটাই কাজের নয়। কোনটা হয়ত ভীষণ বিষাক্ত, আবার কোন্‌টা কোন কাজের নয়। প্রায় দশ হাজার রকম মাটির নমুনা থেকে অগণিত শ্রেণীর জীবাণু পাওয়া গেল। কিন্তু এত পরিশ্রম নিয়ে এলো বিরাট ব্যর্থতা ও হতাশা। কিন্তু ডাঃ ওয়াকস্‌ম্যান কি পরাজয় স্বীকার করতে পারেন? না, ছেলেবেলা থেকেই তিনি সংগ্রামী। জয় কখনও তাঁর হাতে নিজে থেকে ধরা দেয় নি, তিনি পরিশ্রম করে জয়কে অর্জন করেছেন।

প্রায় এক বছর কাটল ব্যর্থতার মধ্যে। অবশেষে একদিন এক চাষী একটা মরা মোরগ নিয়ে হাজির হল তাঁর গবেষণাগারে। মোরগটির দ্বিতীয় পাকস্থলীতে পাওয়া গেল কিছু মাটি। সেই মাটি ফেলে দিলেন না ডাঃ ওয়াকস্‌ম্যান, কালচার প্লেটে ফেলে চাষ করে পাওয়া গেল স্ট্রেপটো-মাইসিস গ্রিসাস জাতের এক প্রকার ছত্রাক। সেই ছত্রাক বিভিন্ন জীবাণুর কালচার প্লেটে দিলেন ডাঃ ওয়াকস্‌ম্যান। সফলতার আশাও করেন নি তিনি। কিন্তু আশ্চর্য হবার সময় এলো যখন দেখা গেল যক্ষ্মারোগ জীবাণু এই ছত্রাকের ছোঁয়া পেয়ে মরে গেল। তবে এই কি সেই পরশপাথর, যার ছোঁয়া লেগে যক্ষ্মারোগ সারবে? কয়েকজন সহকারীর সঙ্গে তিনি গেলেন সেই চাষীর খামারে, কোথায় সেই সার-গাদা যেখানে লুকিয়ে আছে যক্ষ্মারোগ নিরাময়ের চাবিকাঠি। সব সার এনে তুললেন তাঁরা ল্যাবরেটারীতে। কেউ বা উপহাস করল পাগল বলে। গায়ে মাখলেন না তিনি,—উপহাস আর অবজ্ঞা উপেক্ষা করেই তো তিনি আজ ডাঃ ওয়াকস্‌ম্যান। তার পর শুরু হল তাঁদের অমানুষিক পরিশ্রম। বিশ্রাম

ভুলে গেছেন তাঁরা। রোগ নিরাময়ের পরশপাথর পাওয়া গেছে, বিশ্রামের সময় কোথায় ?

সুখবরটা কিন্তু চাপা থাকে নি। মুখে মুখে খবর ছড়িয়ে পড়েছে। আগে হলে হয়ত লোকে অবিশ্বাস করত। কিন্তু মাত্র গত বছর পেনিসিলিন আবিষ্কার হয়েছে। লোকে তখন আরও নতুন অ্যান্টিবায়োটিকের জন্য উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে। আমেরিকার বিখ্যাত হাসপাতাল থেকে এলেন দুজন ডাক্তার, ডব্লু. এইচ. ফেল্ডম্যান ও এইচ. সি. হিনশ। প্রার্থনা করলেন গিনিপিগ পরীক্ষার জন্য কিছু ওষুধ যার নাম দিয়েছিলেন ডাঃ ওয়াকস্‌ম্যান 'স্ট্রেপটোমাইসিন।' আরও নানা জায়গা থেকে আবেদন আসতে লাগল। মার্ক কোম্পানী সকলকে 'স্ট্রেপটোমাইসিন' সরবরাহ করলেন। তবে প্রত্যেককে অনুরোধ করলেন বিভিন্ন রোগে ব্যবহার করে কি ফল পাওয়া যায়, তা যেন যথাসময়ে জানানো হয়। নানা পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে উৎসাহজনক খবর আসতে থাকল। কেউ খবর দিল, প্লেগ রোগ সারাচ্ছে নতুন অ্যান্টিবায়োটিক। কেউ বলল —কলেরা, কেউ বা নিউমোনিয়া। মোট কথা, পেনিসিলিন যে রোগ সারাতে অক্ষম, তার অনেকগুলিই এই নতুন অ্যান্টিবায়োটিক স্ট্রেপটোমাইসিন সারাতে পারছে। কিন্তু সবচেয়ে আনন্দদায়ক খবর এল মেয়ো ক্লিনিকের ডাঃ ফেল্ডম্যান ও ডাঃ হিনশর-এর তরফ থেকে। তাঁরা গিনিপিগের শরীরে টি. বি. রোগ সৃষ্টি করে একদল গিনিপিগকে স্ট্রেপটোমাইসিন দিলেন, অপর দলকে দিলেন না। যাদের দেওয়া হোল না তারা সব মরে গেল, আর যাদের স্ট্রেপটোমাইসিন দেওয়া হোল, তাদের সব ক'টাই বেঁচে গেল। অবিশ্বাস্য সুখবর, এও কি সম্ভব ? টি. বি. রোগ সারাবার ওষুধ কি সত্যিই মানুষের হাতে এলো ? আবার পরীক্ষা করে দেখা যাক নতুন একদল গিনিপিগের ওপর একই পরীক্ষা হোল, একই ফল। আচ্ছা, আরও একবার পরীক্ষা হোক গিনিপিগের ওপর। কিন্তু না, তার আর দরকার হোল না। তৃতীয় পরীক্ষা শেষ পর্যন্ত মানুষের ওপরেই করতে হোল।

মেয়ো ক্লিনিকে একটি অল্পবয়সী মহিলা রোগীর চিকিৎসা হচ্ছিল ১৯৪৩

খ্রীঃ জুলাই মাস থেকে যক্ষ্মা রোগের জন্য। চিকিৎসা সত্বেও রোগ বেড়ে যেতে থাকল। পরের বছর অক্টোবর মাসে তার বুকের ডান দিকের পাঁজর অপারেশন করে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই অপারেশন দুই তিন পর্যায়ে করা হয়। প্রথম পর্যায়ে তিন, পরে আরও তিন বা চারটে পাঁজর বাদ দেওয়া হয়। নভেম্বর মাসে ১ তারিখে প্রথম অস্ত্রোপচার করা হয়, রোগীর বাঁদিকের ফুসফুসে তখন কোন রোগ নেই। অস্ত্রোপচারের ১৫ দিন পরে বুকের ছবি করে দেখা গেল বাঁদিকেও যক্ষ্মা রোগ আক্রমণ করেছে। মেয়েটির বাঁচবার আর কোন আশা নেই। কি করা যায়? গিনিপিগের ওপর পরীক্ষার জন্য যে স্টেপটোমাইসিন আনা হয়েছিল, তার থেকে ১ গ্রাম ধার নিয়ে রোগীকে দেওয়া শুরু হোল। মাত্রা জানা নেই, কি কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে তাও জানা নেই। সেই জন্য গ্রামের ১০ ভাগের ১ ভাগ দেওয়া হল রোগীনীটিকে ২০শে নভেম্বর থেকে। প্রসঙ্গক্রমে জানাই, এখন সাধারণভাবে দেওয়া হয় প্রতিদিন ১ গ্রাম করে। পরের বছর ১৩ই জানুয়ারী আবার এক্স-রে হোল; বাঁদিকের ফুসফুসে রোগের কোন পরিবর্তন হয়নি। বোর্ড বসল, অনেক মাথা পরামর্শ করে ওষুধের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে বললেন। অবশেষে ৯ই এপ্রিলের ছবিতে দেখা গেল বাঁদিকের ফুসফুস পরিষ্কার হয়েছে। স্ট্রেপটোমাইসিন চলতে থাকল; এদিকে পর্যায়ক্রমে অস্ত্রোপচার পর্ব শেষ হোল। রোগী সুস্থ হয়ে উঠল; কিন্তু তাকে ছাড়া হোল না। নজরে রাখতে হবে, প্রথম রোগী, কি হয় বলা যায় না। শেষে ১৯৪৭ খ্রীঃ জুলাই মাসে রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল। এই রোগীর পরে বিবাহ হয়, সংসারের সব কাজ করতে হোত তাকে, তিনটি সন্তান হয়েছিল। পৃথিবীর প্রথম যক্ষ্মারোগী, যার জীবন ডাঃ ওয়াকস্‌ম্যানের তৈরি স্ট্রেপটোমাইসিনের কল্যাণে অসময়ে ঝরে যায়নি; নতুন ওষুধের কল্যাণে হয়ত তার মনের ইচ্ছা পূর্ণতা পেয়েছিল।

স্ট্রেপটোমাইসিন আবিষ্কারের কয়েক সপ্তাহের মধ্যে রোগীর ওপর পরীক্ষা করার সুযোগ পেয়েছিলেন ডাঃ ওয়াকস্‌ম্যান; কিন্তু ফ্লেমিং-এর পেনিসিলিন আবিষ্কার, আর মানুষের কল্যাণে তার ব্যাপক ব্যবহারের

মধ্যে প্রায় দুই যুগ সময় কেটে গিয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষ মরে গিয়েছিল, যারা হয়ত পেনিসিলিন চিকিৎসার সুযোগ পেলে বেঁচে যেত। এই দেরির কারণ সম্বন্ধে ডাঃ ওয়াকস্‌ম্যান বলেছেন, 'ফ্লেমিং সময়ের আগে জন্মেছিলেন এবং তাঁর আবিষ্কারও সময়ের আগে হয়েছিল। এত বড় আবিষ্কারের জন্য তখন কেউ তৈরী ছিল না, চিন্তাও করে নি।' ১৯২৮ খ্রীঃ পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের ধারণার বাইরে ছিল যে কোন জীবাণুর দেহনিঃসৃত রসায়ন ও পদার্থ দিয়ে অন্য কোন রোগ জীবাণু ধ্বংস করা সম্ভব হতে পারে। তাছাড়া পেনিসিলিন আবিষ্কার হয়েছিল হঠাৎ, বিশ্বের বিজ্ঞানীরা তাঁর এত বড় আবিষ্কার বিশ্বাস করতে পারে নি। অপরদিকে স্ট্রেপটোমাইসিন আবিষ্কার একটি পরিকল্পিত পরিশ্রমের সুফল। পেনিসিলিন আবিষ্কারে উৎসাহিত বিজ্ঞানীরা ও ঔষধ প্রস্তুতকারক সংস্থা সকলে একযোগে আরও এন্টিবায়োটিক আবিষ্কারের চেষ্টায় নিজেদের নিয়োজিত করেছিল। শুধু ওয়াকস্‌ম্যান ও তাঁর সহকারীরা ১০,০০০ রকম মাটির নমুনা থেকে প্রায় ১,০০,০০০ জীবাণু কালচার প্লেটে চাষ করেছিলেন। তার মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল যক্ষ্মারোগীদের জীবনরক্ষাকারী স্ট্রেপটোমাইসিন। বাকি পরীক্ষাগুলো কি তাহলে ব্যর্থ হয়েছিল? না, ডুবোঁর ১৯৩৯ খ্রীঃ টাইরোথ্রিসিন আবিষ্কার, পরবর্তী বছরে একটিনোমাইসিন স্ট্রেপটোথ্রিসিন আবিষ্কার কোনটাই ব্যর্থ নয়। তারা ছিল স্ট্রেপটোমাইসিন আবিষ্কারের পথ-নির্দেশক। স্ট্রেপটোমাইসিন আবিষ্কারের পরে আরও বহু এন্টিবায়োটিক আবিষ্কৃত হয়েছে, এবং তা সম্ভব হয়েছে সেই 'ব্যর্থ' বিজ্ঞানীদের সফল আবিষ্কারে।

যাই হোক, স্ট্রেপটোমাইসিন ব্যবসায়িক ভিত্তিতে তৈরী করে মার্ক কোম্পানী তাকে যা লভ্যাংশ দিচ্ছিল তার থেকে তিনি কোটি কোটি টাকা অর্জন করতে পারতেন। কিন্তু ডাঃ ওয়াকস্‌ম্যানের প্রকৃতি ছিল অন্য রকম। তিনি মার্ক কোম্পানীকে অনুরোধ করলেন, 'স্ট্রেপটোমাইসিন তৈরির একচেটিয়া অধিকার তোমরা ছেড়ে দাও, সকলে তৈরি করুক, তাতেই মানুষের উপকার হবে।' এর জন্য তাঁকে রয়েলটি ছেড়ে দিতে হবে, তা হোক। তাঁর আবিষ্কারের সুফল যেন সকলে পায়। এর মধ্যে

মার্ক কোম্পানী থেকে যে লভ্যাংশ তিনি পেয়েছিলেন, তার প্রায় সবটাই তিনি দান করেছিলেন। প্রায় অর্ধেক দিয়েছিলেন রাটজার্স বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার জন্য ও অন্য দেশ থেকে আগত গরীব ছাত্রদের বৃত্তির জন্য। প্রায় সিকি অংশ তাঁর ২৫ জন সহকারীকে ভাগ করে দিয়েছিলেন নিজের জন্য সামান্য কিছু রেখে। এছাড়া প্রায় ২ কোটি টাকা ব্যয় করে ১৯৫৪ খৃঃ ৭ই জুন তিনি স্থাপন করেছিলেন 'ইনস্টিটিউট অফ মাইক্রোবায়োলোজি' যে বিজ্ঞান পথের তিনিই ছিলেন প্রথম পথিক। তাঁর এই বিরাট আবিষ্কারের জন্য ১৯৫২ খৃঃ বিজ্ঞানীদের আকাঙ্খিত 'নোবেল পুরস্কার' পেয়েছিলেন।

১৯৬২ খৃঃ সস্ত্রীক ডাঃ ওয়াকস্‌ম্যান এসেছিলেন আমাদের দেশে, আমাদের এই শহর কলকাতাতে। ২৪শে মার্চ তিনি কলকাতা স্কুল অব ট্রপিকাল মেডিসিনে এক সারগর্ভ বক্তৃতা দেন, যার বিষয় ছিল, 'এন্টিবায়োটিক ; পাস্ট-প্রেজেন্ট-ফিউচার' অর্থাৎ এন্টিবায়োটিকের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। পরের দিন তিনি 'বেঙ্গল টিউবারকলোসিস এসোসিয়েশন' ভবনে এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এই প্রবন্ধ লেখকের সেদিন মহাবিজ্ঞানী ডাঃ ওয়াকস্‌ম্যানের সঙ্গে কয়েকটি কথা বলার সৌভাগ্য হয়েছিল। অল্প সময় আলাপ করেও সেদিন তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। সরল, প্রাণখোলা এই বেঁটেখাটো বিজ্ঞানী যে আসলে কত বিরাট ছিলেন, তা যাঁরা তাঁকে দেখেছেন, তাঁরা সকলেই স্বীকার করবেন।

গবেষণা থেকে অবসর নেবার পর তিনি নিজের বাড়ির পিছনের বাগানে কাজ করতেন, আত্মজীবনী লিখতেন, আর মাঝে মাঝে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইনষ্টিটিউট অফ মাইক্রোবাইলোজিতে অন্য বিজ্ঞানীদের উপদেশ দিতেন, উৎসাহ দিতেন। বিজ্ঞানে নতুন অধ্যায় সৃষ্টিকারী এই বিজ্ঞানী ১৯৭৩ খৃঃ ১৬ই অগস্ট ৮৫ বছর বয়সে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে তার প্রিয় মাটির কোলে আশ্রয় নিলেন।

লর্ড লিস্টার

গত শতকের মাঝামাঝি সময়ে রোগীর ওপর অজ্ঞান করার পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে ; শল্যচিকিৎসকদের তাতে অনেক সুবিধা হয়েছে বটে, কিন্তু রোগীর বিশেষ লাভ হয়নি। অপারেশনের পরে ক্ষতস্থান দূষিত হয়ে পচে প্রায় সব রোগী মারা যেত। এই পরিবেশে ডাক্তারী পাশ করে শল্যবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ হবার পরে স্কটল্যাণ্ডের এক তরুণ চিকিৎক শল্য-চিকিৎসার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেন। তরুণ চিকিৎসকের নাম যোসেফ লিস্‌টার। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৮২৭ খৃঃ ইংলণ্ডের এসেক্স জেলার আপটন গ্রামে। বাবা জ্যাক্‌সন লিস্‌টার। ব্যবসা করতেন, তবে তিনি ছিলেন সুশিক্ষিত ও বিজ্ঞান অনুরাগী। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে কাজ করতে তিনি খুব ভালবাসতেন। যোসেফ বোধ হয় বাবার কাছ থেকে বিজ্ঞানকে ভালবাসার প্রেরণা পেয়েছিলেন। ১৮৫২ খৃঃ তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্নাতক হলেন। লিস্‌টারের মনে গোপন ইচ্ছা ছিল পাশ করে সারজারি করবেন। যখন তিনি কলা বিভাগের ছাত্র, সেই সময় তিনি ডাঃ লিস্‌টনকে এক রোগীকে অজ্ঞান করে অস্ত্রোপচার করতে দেখেছিলেন। সেই সময়েই সারজেন হবার বাসনা তাঁর মনে বাসা বেঁধে-ছিল। সে যুগে সার্‌জারি কিন্তু খুব লোভনীয় বিষয় ছিল না। হবে কি করে ? যদি অপারেশন করার পরে শতকরা একটি রোগী কোনক্রমে রক্ষা পায়, তাতে সেই সারজেনের সুনাম না হয়ে বদনামই বেশী হয়। এ সব জেনেও ডাঃ লিস্‌টার শল্যবিদ্যায় পারদর্শী হওয়ার জন্য রয়েল কলেজে স্নাতকোত্তর শিক্ষার জন্য ভর্তি হলেন এবং শেষে কৃতিত্বের সহিত এফ. আর. সি. এস. পাশ করেন।

পাশ করার পরে তিনি কিন্তু সারজারী না করে, গবেষণার কাজে হাত দিলেন ; তাও চোখের পেশী বা চামড়ার পেশী প্রভৃতি নিয়ে। কিছুদিন লণ্ডনে কাজ করার পরে, ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা লাভের জন্য লিস্‌টার



লর্ড লিস্‌টার

এডিনবরা যাওয়া মনস্থ করেন। সেখানে তাঁর পরিচয় হোল অধ্যাপক জেমস্‌ সাইম্‌স-এর সঙ্গে। দুজনের মধ্যে বয়সের পার্থক্য সত্ত্বেও গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। সাইম্‌স তরুণ লিস্‌টারের মধ্যে প্রতিভার ঝলক দেখে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এই সময় এডিনবরা কলেজ হাসপাতালে শল্যচিকিৎসা বিভাগে একটি পদ খালি হয়। অধ্যাপক সাইম্‌স লিস্‌টারকে ঐ পদের জন্য আবেদন করতে বলেন। লিস্‌টারও তাঁর উপদেশমত আবেদন পত্র পাঠালেন এবং চাকরীও পেলেন। দায়িত্বপূর্ণ কাজ পেয়ে তিনি খুব খুশী! কয়েক বছর খুব মন দিয়ে কাজ করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন। এর পরে ১৮৫৬ খ্রীঃ ডাঃ সাইম্‌স-এর বড় মেয়ে এগনেসের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হোল।

বিয়ের পর দুজনে বেরিয়ে পড়লেন ইউরোপ ভ্রমণে। নানা দেশে হাসপাতাল দেখা, সেই সব দেশে শল্যচিকিৎসার পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিয়ে দেশে ফিরে, লিস্‌টার আবার ডুবে গেলেন নিজের কাজে। হাসপাতাল, ছাত্রদের পড়ান ছাড়া নিজের গবেষণা কাজও চলতে থাকল। এই সময়ে তাঁর কাছে আমন্ত্রণ এলো গ্লাসগো মেডিকেল কলেজ থেকে, শল্যবিদ্যা অধ্যাপকের পদ গ্রহণের জন্য। লিস্‌টার এ সুযোগ ছাড়লেন না। এই গ্লাসগো হাসপাতালে কাজ করার সময়েই তিনি শল্যচিকিৎসায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিলেন।

হাসপাতালের ওয়ার্ডে রোগীদের পরীক্ষা করে দেখছেন লিস্‌টার। বেশীরভাগ রোগীর ক্ষত বিষিয়ে উঠেছে। পুঁজ, রক্তে দূষিত বিছানার দিকে তাকান যায় না ; দূর্গন্ধে যেন বমি উঠে আসে। এদিকে রোগী জ্বরে ধুঁকছে, দ্রুত এগিয়ে চলেছে মৃত্যুর কোলে,—যেখানে তাদের শান্তি, কষ্ট থেকে মুক্তি! লিস্‌টার ভাবেন কেন এমন হয়? এটা কি সম্ভব যে হাসপাতালের ওয়ার্ডে দূষিত পোকা ক্ষত বিষিয়ে দিচ্ছে? আচ্ছা, তাহলে দুই রোগীর মধ্যের ব্যবধান বাড়িয়ে দেখা যাক কি হয়। একই অবস্থা ; অপারেশনের পরে ক্ষত বিষাক্ত হোল এবং পরিণতি মৃত্যু। সুতরাং এটা কারণ নয়। আর হাসপাতালে না হয় জীবাণু আছে ; রোগীর বাড়ীতেও তো একই দৃশ্য। অপারেশনের পরে ক্ষতস্থান পচে যায়, জ্বর হয়, দারুণ ঘাম আর শেষে মৃত্যু।

সব সময়ে লিস্‌টার ভাবেন কিভাবে ক্ষতস্থান পচে যাওয়া, বিষিয়ে ওঠা বন্ধ করা যায়। এক বন্ধুর মুখে শুনলেন ফ্রান্সে লুই পাস্তুর নামে এক বিজ্ঞানী লিখেছেন বাতাসে পোকা উড়ে বেড়ায়। তারা খাবার, ক্ষত, জল ইত্যাদি দূষিত করতে পারে। কোন জীবাণু যে কোন প্রকারের ক্ষতস্থানের সংস্পর্শে এসে পচন ক্রিয়া শুরু করতে পারে। লিস্‌টার ভাবলেন তাহলে আমাদের হাত, ছুরি, কাঁচি, সেলাই করার সুতো, পোশাক সব কিছুতেই এই জীবাণু থাকতে পারে এবং তাদের আক্রমণে ক্ষতস্থান বিষিয়ে উঠতে পারে। কিন্তু সব জীবাণু নির্মূল করা তো সম্ভব নয় ; কারণ তারা বাতাসে উড়ছে। তবে আমাদের হাতে, শরীরে,

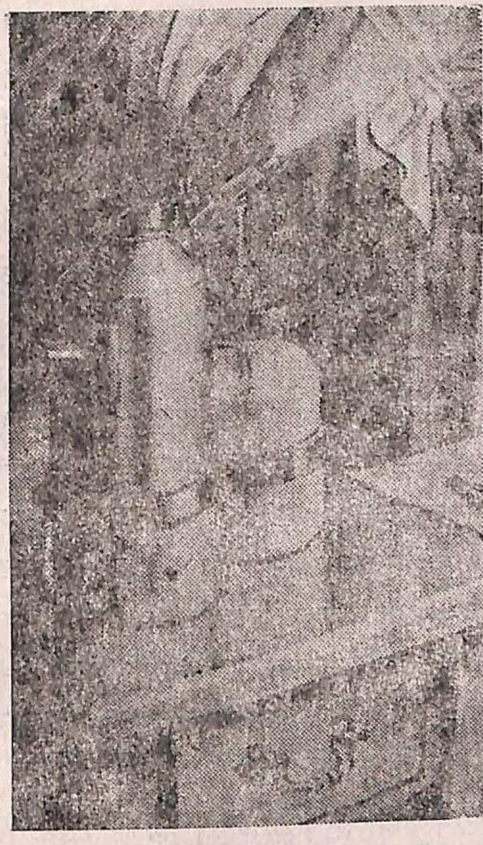
পোষাকে, যন্ত্রে যে সব জীবাণু থাকে তাদের তো মেরে ফেলা সম্ভব। পাস্তুর লিখেছেন জল ফুটিয়ে, কোন অ্যান্টিসেপটিক লোশন দিয়ে অথবা যন্ত্রপাতি জলে সিদ্ধ করে এই সব জীবাণু মেরে ফেলা সম্ভব। কিছু জিনিস না হয় জলে ফুটিয়ে জীবাণু মুক্ত করা গেল, কিন্তু রোগীর শরীর, সারজেনের হাত কিভাবে শোধন করা যাবে। এরকম অ্যান্টিসেপটিক কোথায় পাওয়া যায় যা মানুষের চামড়ায় কোন ক্ষতি করে না, অথচ জীবাণু মেরে ফেলতে পারে। খবর পেলেন কালভার্ট নামে এক রসায়ন বিজ্ঞানী কার্বলিক অ্যাসিড তৈরী করেছেন। ড্রেনের জল শোধন করা ও দূর্গন্ধ দূর করার জন্য ইংল্যাণ্ডে ব্যবহার করা আরম্ভ হয়েছে। তিনি ঠিক করলেন, অপারেশনের পরে ক্ষতস্থানে কার্বলিক অ্যাসিড লাগিয়ে দেখতে হবে। পরের রোগীর অপারেশনের পরে কার্বলিক অ্যাসিডে গজ ভিজিয়ে চামড়ার ওপরে ঘসে দিলেন; ফল কিন্তু খারাপ হোল। সেপটিক হোল না বটে; কিন্তু যেখানে অ্যাসিড লাগান হয়েছিল, সেই জায়গাটা পুড়ে গেল। তবে এটা তিনি বুঝলেন যে এই অ্যাসিডে চামড়ার ওপরের জীবাণু ধ্বংস করা সম্ভব। পরে কার্বলিক অ্যাসিড আরও শুদ্ধভাবে তৈরী হোল, লিস্‌টার সেই অ্যাসিডে তিসির তেল মিশিয়ে কার্বলিকের ক্ষার প্রভৃতি কম করে নিয়ে অপারেশনের পরে ড্রেসিং হিসেবে ব্যবহার করা শুরু করলেন। কাজ তো খারাপ হোল না; পাশের রোগীর ক্ষত বিষিয়ে যাচ্ছে কিন্তু অ্যাসিডে যার ক্ষত ড্রেস করা হচ্ছে তার ক্ষত বিষাক্ত হচ্ছে না। তবে আশে পাশের চামড়া একটু পুড়ে গিয়ে কালো হচ্ছে; কিন্তু রোগী তা সেরে উঠছে। লিস্‌টার বুঝলেন জল বা তেল মেশান খুব অল্প পরিমান কার্বলিক অ্যাসিড ক্ষতস্থানের জীবাণু ধ্বংস করতে পারে। সুতরাং যা কিছু অপারেশন করতে লাগে, ছুরি, কাঁচি, এমন কি সারজেনের হাত, সবই অপারেশনের আগে শোধন করা উচিত।

১৮৬৫ খৃঃ তার কাছে এক রোগী এল; রোগীটির পায়ের হাড় ভেঙ্গে চামড়া ফুটো করে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। এ ধরনের রোগীর অপারেশন মানে পা কেটে বাদ দেওয়া। এই অপারেশনের পরে প্রায় সব রোগী মারা যেত; যারা বাঁচত তারা চিরদিনের মত বিকলাঙ্গ হয়ে থাকত।

লিস্‌টার এই রোগীর পা বাদ দিলেন না ; অপারেশন করে ভাঙ্গা হাড় ঠিকভাবে বসিয়ে দিলেন। ক্ষতস্থান কার্বালিক লোশন দিয়ে ড্রেস করা হোল ; সব যন্ত্রপাতি জলে ফুটিয়ে কার্বলিক লোশনে ভিজিয়ে নিয়ে অপারেশন করা হোল। রোগী সুস্থ হয়ে হেঁটে বাড়ী গেল। এর পরে আরও দশটি রোগীর ওপর একই ধরনের অপারেশন করলেন লিস্‌টার। ফল, চমক দেবার মত। মাত্র একজন মারা গেল, একজনের অঙ্গ বাদ দিতে হোল ; বাকী নয়টি রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাড়ী গেল। যাদের ভাগ্যে ছিল নিশ্চিত মৃত্যু, তারা সেরে উঠল ; এ যেন এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। ১৮৬৭ খৃঃ এই চিকিৎসা পদ্ধতি 'ল্যানসেট' পত্রিকায় প্রকাশ করলেন। কেউ বিশ্বাস করল, আবার কেউ করল অবিশ্বাস।

১৮৬৯ খৃঃ লিস্‌টার গ্লাসগো ছেড়ে এডিনবরা এলেন, মেডিকেল কলেজে শল্যচিকিৎসাবিদ্যা অধ্যাপকের পদে যোগ দিলেন। এখানেও তিনি কার্বলিক অ্যাসিড লোশন প্রতিটি রোগীর অপারেশন করার সময় ব্যবহার করতেন। এর ফলে এখানেও তাঁর অপারেশন করা রোগীদের মধ্যে মৃত্যুহার দারুণভাবে কমে গেল।

এর পরে আমরা দেখেছি যে লিস্‌টার অপারেশন করবার সময়ে এক বিশেষ ধরনের যন্ত্র দিয়ে কার্বলিক অ্যাসিড স্প্রে করছেন। একে তো কার্বলিক অ্যাসিডের গন্ধ খারাপ, স্প্রে করে সারা ঘরে গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। শেষে সহকারী ডাক্তার-নার্স সকলেই বিরক্ত হোল। লিস্‌টার নিজেও খুশী নন, রোগীর ভাল হওয়ার জন্য এই কষ্ট তাঁকে সহ্য করতে হচ্ছে। তিনি নিজে বলেছেন, 'যদি এই স্প্রে না করে নিরাপদে অপারেশন করা সম্ভব হয়, আমার চেয়ে কেউ খুশী হবে না। কিন্তু উপায় কি? রোগীর মুখ চেয়ে এই কষ্ট আমাদের মেনে নিতে হবে।' এক হাড়ভাঙ্গা রোগীর চিকিৎসার জন্য কার্বলিক অ্যাসিডস্প্রে করার চিন্তা তাঁর মাথায় এসেছিল। রোগীটির হাতের হাড় ভেঙ্গে যাওয়ার পরে, ভুল চিকিৎসায় সেই হাড় খারাপ অবস্থায় জুড়ে গিয়েছিল। হাতটা হয়ে গিয়েছিল একেবারে অকেজো। সেই যুবক লিস্‌টারের শরণাপন্ন হোল। সে শুনেছে তিনি অনেক কঠিন রোগী সুস্থ করেছেন। লিস্‌টার তাকে বোঝালেন, 'দেখ,



লিস্‌টারের কার্বলিক অ্যাসিড স্প্রে করার যন্ত্র

এই অপারেশন করতে হলে তোমার ঐ হাড় আবার ভাঙতে হবে। তার পরে ঠিকভাবে বসিয়ে প্লাসটার করতে হবে। কিন্তু এই অপারেশনে খুব বিপদ, প্রায় সকলেরই ঘা বিষাক্ত হয়ে মারা যায় ' সে যুবক কিন্তু নাছোড়বান্দা ; বলে 'মৃত্যু হয় হোক, আপনি আমায় অপারেশন করুন'।

শেষে লিস্‌টার রাজী হলেন। মনে মনে ঠিক করলেন অপারেশনের সময় কার্বলিক এ্যাসিড স্প্রে করতে হবে, যাতে বাতাসের জীবাণু অপারেশনের ক্ষত বিষিয়ে তুলতে না পারে। কিছুদিন তিনি ডাঃ রিচার্ডসনকে দেখেছেন অপারেশনের আগে শরীরের বিশেষ অংশ অসাড় করবার জন্য

এক যন্ত্রের সাহায্যে ইথার স্প্রে করতে। লিস্‌টার ঐ যন্ত্রের সাহায্যে জল-মেশান কমজোরী কার্বলিক এ্যাসিড অপারেশনের সময় স্প্রে করলেন। অপারেশন হয়েছিল ১৮৭০ খ্রীঃ ১২ই ডিসেম্বর; আজ থেকে প্রায় ১:০ বছর আগে। কাজ হয়েছিল সুন্দর, এক ফোঁটা পুঁজ হয়নি। এতে লিস্‌টার উৎসাহিত হয়ে আরও বড় যন্ত্র তৈরী করালেন। সেটা আবার সব জায়গায় নিয়ে যাওয়ার অসুবিধে হওয়াতে ১৮৭৫ খ্রীঃ একটি ছোট যন্ত্র তৈরী করালেন। তার মধ্যে কমজোরী কার্বলিক অ্যাসিড উচ্চচাপে ভরা থাকত, মুখ খুলে দিলে, মেঘের মধ্যে জলকণার মত অ্যাসিড বেরিয়ে আসতো।

নিরাপদ শল্যচিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কারের পরে ১৮৭৪ খ্রীঃ লিস্‌টার একটি পত্র লিখলেন লুই পাস্তুরকে। লিস্‌টার অকৃতজ্ঞ ছিলেন না; কারণ ক্ষতস্থান দূষিত হওয়ার ব্যাপারে জীবাণুর অবদান সম্বন্ধে বিজ্ঞানী-সমাজ প্রথম জেনেছিলেন পাস্তুরের গবেষণা থেকে। সুতরাং তার স্বীকৃতি দিয়ে লিস্‌টার মহৎ মনের পরিচয় দিয়েছিলেন। এই পত্রে তিনি লিখে ছিলেন, 'আমি এই পত্রের মাধ্যমে আপনাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাবার সুযোগ নিচ্ছি। আপনার অভূতপূর্ব গবেষণার ফলে আমরা জীবাণুতত্ত্ব সম্বন্ধে জানতে পেরেছি। এই জীবাণু কিভাবে ক্ষতস্থান দূষিত করে তা আপনার আবিষ্কারের ফলে আজ আমরা বুঝতে পেরেছি। সেই জ্ঞান প্রয়োগ করে আজ অপারেশনের পরে মৃত্যুহার কম করা সম্ভব হয়েছে। যদি আপনি কোনদিন এডিনবরা শহরে আসেন, আপনি দেখে আনন্দ পাবেন যে আমাদের হাসপাতালে আপনার গবেষণালব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ করে মানুষের কত উপকার হচ্ছে।'

এডিনবরার চিকিৎসকরা লিস্‌টারের জীবাণুনাশক পদ্ধতিতে অপারেশনের উপকারিতা মেনে নিয়েছিল, কিন্তু রাজধানী লণ্ডনের চিকিৎসকরা তা মানবে কেন? সত্যিই তো, এডিনবরার এক সাধারণ সারজেন কি বলল, আর সারা দেশ তা মেনে নেবে? তা কি হয়? তবে লিস্‌টার হার মেনে নেওয়ার পাত্র ছিলেন না। ১৮৭৭ খ্রীঃ লিস্‌টার নিমন্ত্রণ পেলেন লণ্ডনের কিংস কলেজ থেকে; শল্যবিদ্যার অধ্যাপকের পদ গ্রহণের জন্য। লিস্‌টার

মনস্থির করলেন এডিনবরার অধ্যাপনা, বিরাট পসার, খ্যাতি সবকিছু ছেড়ে তিনি লণ্ডন যাবেন। ছাত্ররা ছাড়তে চায় না, তাদের বুঝিয়ে বললেন, 'আমার এই চিকিৎসা পদ্ধতিপ্রচারের দরকার মানুষের উপকারের জন্য। তোমাদের, আমার বন্ধু ও সহকর্মীদের ছেড়ে যেতে আমার খুবই কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু মানুষের উপকারের জন্য কর্তব্য মনে করে এই দুঃখ আমি মেনে নিয়েছি।'

পঞ্চাশ বছর বয়সে তিনি লণ্ডনের কিংস কলেজে অধ্যাপকের পদে যোগ দিলেন। পরিবেশ নতুন ও বিরূপ। কিন্তু তিনি সহকর্মীদের উপেক্ষা ও বিদ্রূপ অগ্রাহ্য করে নিজের কাজ করে চললেন। তবে তিনি অগ্রাহ্য করলেও বিরোধী সার্জেনরা ছাড়বে কেন ? ঘর ভর্তি ছাত্রদের সামনে তাকে ধমক দিতে দ্বিধা করেননি তাঁরা। এমন কি তাঁর মুখের ওপর তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতিতে তাদের অবিশ্বাস প্রকাশ করতে দ্বিধা করেন নি। তখন লিস্ টার নিজের সব কাজ নিজেই করে নিতে লাগলেন।

লিস্ টারের চিকিৎসা পদ্ধতিতে এত ভাল ফল পাওয়া গেল, যা বিরোধী সমালোচকদের দমিয়ে দিয়েছিল। একে একে ছাত্র, নার্স নিজেদের আত্মীয়-বন্ধুর অপারেশনের জন্য লিস্ টারের শরণাপন্ন হোল। সর্বসমক্ষে তাঁকে এক ছাত্র অপমান করেছিল ; সে একদিন লিস্ টারের কাছে এসে মাথা নিচু করে দাঁড়াল। তার এক আত্মীয়ের অপারেশন লিসটারকে দিয়ে করাতে চায়। তিনি কিন্তু এমন ভাব দেখালেন, যেন সে অপমানের কথা তাঁর মনে নেই। সেই রোগী সুস্থ হয়ে বাড়ী গেল। এইভাবে বিরোধিতার প্রাচীর ভেঙ্গে পড়ল। শেষে লণ্ডনের সারজেনরা লিস্ টারের জীবাণুমুক্ত সার্জারী যে সম্ভব, তা মেনে নিতে বাধ্য হলেন।

লিস্ টারের এই আবিষ্কার আজকের দিনে একটা বিরাট কিছু বলে মনে হয় না। অনেকেই বলবেন গজ, ব্যানডেজ, যন্ত্রপাতি জলে ফুটিয়ে নিলে জীবাণু মরবে, এ আর আশ্চর্য্য কি? কিংবা কার্বলিক অ্যাসিড লোশনে হাত ধুয়ে ফেললে হাত শোধন হবে, এটা কি এমন বড় কথা ? কিন্তু সেই দিনের পরিপ্রেক্ষিতে একটা প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে একা বিদ্রোহ

করে, বিরোধীদের আপন মতে নিয়ে আসা যে কতখানি কঠিন তা ভাষায় লিখে বোঝান বোধ হয় সম্ভব নয়!

চিকিৎসা বিজ্ঞানে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে ইংলণ্ডের রানী ভিক্টোরিয়া তাঁকে 'লর্ড' উপাধিতে ভূষিত করেন। দেশ-বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে নানাভাবে সম্মানিত করে। ১৯১২ খ্রীঃ ৮৫ বছর বয়সে লিস্‌টার পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুতে লণ্ডনের 'রঁয়েল কলেজ অব সারজেনস' তাঁর কবরের ফলকে লিখেছিল, 'তাঁর নম্র ব্যবহার, অবিচলিত মানসিক প্রকৃতি, চিত্তের দৃঢ়তা, অবজ্ঞাকে উপেক্ষা এবং বিরূপ সমালোচনা সহনশীলতা তাঁকে মহান ব্যক্তিত্বের মর্যাদা দিয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে তাঁর অবদান মানুষ চিরকাল মনে রাখবে। মানুষ তাঁকে চিরকাল আশীর্বাদ করবে এবং তাঁর খ্যাতি অমরত্ব লাভ করবে।'

ডেভি : ওয়ালেস : মর্টন : সিম্প্‌সন

খুব বেশী দিনের কথা নয় ; হয়তো শ'দেড়েক বছর আগেকার কথা। সেই সময় কারো অপারেশন করা হ'লে, সেই ঘটনা আর গোপন থাকতো না। অপারেশনের সময়ে রোগী পরিত্রাহী চিৎকার ক'রে পাড়ার সকলকে জানিয়ে দিত। যারা সেদিনের এই অপারেশনের প্রত্যক্ষদর্শী, তারা দেখেছেন সেই হতভাগ্য রোগীকে তিন চারজন শক্তিশালী লোক জোরে চেপে ধরেছে, একজন হয়ত চোখ চেপে ধরেছে। রোগীর কোন কোন মহিলা আত্মীয়, হয়ত মা, মেয়ে বা স্ত্রী ঘরের এক কোণে অসহায় ভাবে কাঁদছে। এদিকে সার্জেন সাহেব শার্টের আস্তিন গুটিয়ে, বিরাট ছুরি নিয়ে অপারেশন করছেন। কিন্তু এত কাণ্ড ক'রে যে অপারেশন হোল, তার ফল কিন্তু প্রায় সব ক্ষেত্রেই একই রকম দেখা যেত এবং তা হোল ভীষণ যন্ত্রণাময় মৃত্যু, ক্ষত বিষাক্ত হওয়ার জন্য। প্রায় ১০০ বছর আগে ব্রিটিশ সার্জন লিস্‌টার অপারেশনের ক্ষত যাতে বিষাক্ত না হ'য়ে, তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়, সেই পদ্ধতি আমাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন। আরও কয়েক বছর আগে, রোগীকে অজ্ঞান করে অপারেশন করার পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছিল।

প্রাচীন ভারতে শল্যচিকিৎসার সময়ে রোগীর যন্ত্রণার অনুভূতি লাঘব করার জন্য শন গাছের রস ব্যবহার হোত, তাকে বলা হোত 'সম্মোহনী।' আরব দেশের চিকিৎসকরা আফিম জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করতেন। কেউ আবার শরীরে যেখানে অপারেশন হবে, সেই জায়গায় স্নায়ুর ওপর চাপ দিয়ে যন্ত্রণাবোধ কমানোর চেষ্টা করেছিলেন। তবে কোন প্রক্রিয়াতে ফল বিশেষ ভাল হোত না। সেইজন্য বিশ্বের সব উন্নত দেশ অপারেশনের সময় যন্ত্রণা কমানোর ওষুধ আবিষ্কারের জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল।

আজ অজ্ঞান করার জন্য যেসব ওষুধ বা গ্যাস ব্যবহার হয়, তাদের মধ্যে প্রথম আবিষ্কার হয়েছিল নাইট্রাস অক্সাইড। যিনি এই গ্যাস আবিষ্কার করেছিলেন তিনি জীবনে কোন কলেজে শিক্ষা পাননি, যদিও



অজ্ঞান করার পদ্ধতি আবিষ্কারের আগে রোগীকে
বেঁধে পা কেটে বাদ দেওয়া হচ্ছে

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব জনপ্রিয় শিক্ষক ছিলেন। তাঁর নাম ছিল হামফ্রি ডেভি। তিনি কিন্তু অজ্ঞান করার গ্যাস আবিষ্কার করার স্বপ্ন দেখেননি। তখন তিনি কাজ করতেন এক ঔষধ তৈরী করার প্রতিষ্ঠানে, শিক্ষা বলতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেটুকু হতে পারে। তবে পড়তে ভালবাসতেন। এই কারখানায় একটি ভাল পাঠাগার ছিল, সেই বই পড়ে ডেভির রসায়ন বিজ্ঞানে কাজ করার আগ্রহ হয়েছিল। রসায়ন নিয়ে কাজ করার সময় তিনি ঐ নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাস আবিষ্কার করেছিলেন।

এপ্রিল ১৭৯৯ খ্রীঃ এই অশিক্ষিত, অসুন্দর এবং অস্বীকৃত রসায়ন বিজ্ঞানী

একটা খুব বড় রকম আবিষ্কার করে রাতারাতি সারা ইংল্যাণ্ডে বিখ্যাত হয়েছিলেন। নিজের তৈরী গ্যাস ; একটু শুঁকে দেখা যাক। গ্যাস শুঁকতে গিয়ে, হাসি এসে গেল। বেশ আনন্দ হতে লাগল, মদ খেলে যেমন নেশা হয় সেই রকম মনে হতে লাগল। আরও একটা বিশেষ গুণ তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল। সেটা হোল শরীরে ব্যথায় অনুভূতি লোপ এবং অল্পক্ষণ অজ্ঞান অবস্থা। ডেভি জানালেন, ছোটখাট অপারেশনে এই গ্যাস ব্যবহার করলে রোগী ব্যথা অনুভব করবে না। তবে সেদিন চিকিৎসকরা ডেভির এই আবিষ্কারকে বিশেষ গুরুত্ব দেননি।

হামফ্রি ডেভির জন্ম ১৭৭৮ খ্রীঃ ডিসেম্বরে, এক গরীব কাঠুরিয়ার ঘরে। বাল্যকালে লেখাপড়ার সুযোগ হয়নি। পরে নিজের চেষ্টায় রসায়ন বিজ্ঞানে বহু নতুন আবিষ্কার করে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। এ ছাড়া খনির ভিতরে নিয়ে যাওয়ার জন্য 'ডেভির নিরাপদ বাতি' তার অন্যতম আবিষ্কার। একজন খ্যাতনামা ইংরেজ বিজ্ঞানী একসময়ে বলেছিলেন, ডেভির মত প্রতিভার জন্য কোন রাষ্ট্র ১ কোটি পাউণ্ড খরচ করলে, খুব সস্তায় দাঁও মারা হয়েছে মনে করলে অন্যায় হবে না। পরবর্তী জীবনে ডেভি ইংলণ্ডের বিখ্যাত 'রয়েল সোসাইটির' সভাপতি হয়েছিলেন। যখন ইংলণ্ডের সঙ্গে ফরাসী দেশের যুদ্ধ চলছিল ; সেই সময়েও ডেভিকে সম্মান জানাবার জন্যে ফরাসী রাষ্ট্রপতি তাঁকে একটি স্বর্ণপদক উপহার দেন। এ ছাড়া দেশের রাজা তাঁকে 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত করেন। এই অল্পশিক্ষিত, দরিদ্র কাঠুরিয়ার সন্তান, খনি শ্রমিকদের ত্রাণকর্তা, বিদ্যুৎ-রসায়ন শাস্ত্রের জনক স্যার হামফ্রি ডেভি, ১৮২৬ খ্রীঃ মাত্র ৫০ বছর বয়েসে পরলোকগমন করেন।

স্যার হামফ্রি ডেভি তাঁর হাসানো গ্যাস নাইট্রাসঅক্সাইডের সাহায্যে মানুষকে অজ্ঞান করার ক্ষমতার কথা জানানো সত্ত্বেও কেউ কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞান এর অপরিসীম গুরুত্বের সম্ভাবনা সেদিন বুঝতে পারেনি। প্রায় ৪৫ বছর পরে ১৮৪৪ খ্রীঃ ১০ই ডিসেম্বর আমেরিকার হার্টফোর্ড শহরে রসায়ন বিজ্ঞানের এক ভ্রাম্যমান অধ্যাপক, নাইট্রাস অক্সাইড আমাদের শরীরে কি করতে পারে, সেই বিষয়ে বক্তৃতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ উদাহরণ দেখাচ্ছিলেন

উপস্থিত দর্শকদের। সেই সময়ে হোরেস ওয়ালেস নামে এক দাঁতের ডাক্তার সেখানে হাজির ছিলেন। তিনি দেখলেন যে সামনের দোকানের এক কর্মচারী, যার পায়ে দারুন আঘাত লেগেছে; সে ঐ গ্যাস শুঁকে বলছে তার কোন রকম যন্ত্রণা হচ্ছে না। ডাঃ ওয়ালেস যেন অন্ধকারে আলোর সন্ধান পেলেন। তিনি দাঁতের ডাক্তার; যন্ত্রণার ভয়ে কত রোগী পালিয়ে যায়, একজন রোগী চিৎকার করলে অন্যরা ভয়ে আধমরা হয়ে পড়ে। এই গ্যাস ব্যবহার করে দেখা যাক, দাঁত তুলতে ব্যথা লাগে কিনা। দেরী সয় না; পরের দিন তিনি অপর এক দাঁতের ডাক্তারকে অনুরোধ করলেন তাঁর একটা দাঁত তুলে দিতে। বন্ধু ডাক্তার তো অবাক, সে কি তোমার এমন শক্ত দাঁত তুলবে কেন?

'পরে জানবে সব' ওয়ালেস উত্তর দিলেন।

একটু পরেই ডাঃ ওয়ালেস গেলেন সেই রসায়নের অধ্যাপকের কাছে। অনুরোধ করলেন তাঁর দাঁত তোলার সময় নাইট্রাস অক্‌সাইড গ্যাস শুঁকতে দেবার জন্য।

পরদিন গ্যাস শুঁকিয়ে দাঁত তোলা হোল। পরীক্ষা দারুণ ভাবে সফল। কাঁচা শক্ত দাঁত তুলতে একটুও ব্যথা বোধ হোলো না। ওয়ালেস তার পরে একে একে ১৫ জন রোগীর ওপর ঐ গ্যাস প্রয়োগ করে দাঁত তুলেছিলেন। দিকে দিকে নাম ছড়িয়ে পড়ল। ডাক পড়লো একজন রোগীর দাঁত তোলার জন্য বোস্‌টন শহর থেকে। ১৮৪৫ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে তিনি বোসটনে গেলেন। অনেকে যন্ত্রণামুক্ত দাঁত তোলা দেখতে এসেছে। দাঁত তোলাও হোল ঠিক মত। তবে সেই রোগী ভয় পেয়ে মুখে গোঁ গোঁ করে আওয়াজ করেছিল; পরেই সে কিন্তু বলেছিল, তার কোন রকম যন্ত্রণা হয়নি। কিন্তু সমালোচকরা তা মানবেন কেন? তাদের মতে ওয়ালেসের দাবী ভিত্তিহীন। তবে ডাঃ ওয়ালেস এই সব সমালোচকদের উপেক্ষা করে নিজের রোগীদের এই গ্যাসের সাহায্যে চিকিৎসা করতেন। যেদিন ডাঃ ওয়ালেস বোস্‌টনে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন, সেদিন দর্শকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ উইলিয়াম টমাস গ্রীন মর্টন। ছাত্র অবস্থায় তিনি শুনেছিলেন ইথার দাঁতের গোড়ায়

লাগিয়ে, অসাড় করে, বিনা যন্ত্রণায় দাঁত তোলা সম্ভব হতে পারে। তিনি পরে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইথারের ব্যবহার প্রচলন করেন।

তবে ডাঃ মর্টনের আগে ক্লার্ক নামে একজন রসায়ন বিজ্ঞানের ছাত্র ইথার ব্যবহার করে বিনা যন্ত্রণায় এক মহিলার দাঁত তুলেছিলেন। সেটা ছিল ১৮৪২ খ্রীঃ জানুয়ারী মাস। কিন্তু তিনি সেদিন এই আবিষ্কারের গুরুত্ব বুঝতে পারেননি। তাঃপরে ঐ বছরে ৩০শে মার্চ ডাঃ ক্রফোর্ড লং ইথার প্রয়োগে অজ্ঞান করে এক রোগীর ঘাড়ের টিউমার অপারেশন করেন। কিন্তু ডাঃ লং ছিলেন অলস প্রকৃতির। এতবড় আবিষ্কার চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের জানান প্রয়োজন মনে করেননি। পরে তিনি যখন এই ঘটনা পত্রিকায় প্রকাশ করেন, ততদিনে ডাঃ মর্টনের নাম দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে।

ছাত্র অবস্থায় মর্টন তাঁর শিক্ষক ডাঃ জ্যাকসনের কাছে শুনেছিলেন, ইথার দাঁতের মাড়িতে লাগিয়ে, দাঁত তুললে যন্ত্রণার অনুভূতি থাকে না। মর্টন কিন্তু একথা বিনা প্রমাণে মেনে নেননি। তিনি তুলোতে একটু ইথার ঢেলে কুকুরের নাকে চেপে ধরলেন, দেখা যাক কি হয়। কুকুর কিছুক্ষণ লড়াই করে আস্তে আস্তে নিস্তেজ হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়ল। এবারে দেখা দরকার কুকুরের আবার জ্ঞান ফেরে কিনা? কতক্ষণ পরে ফেরে? কিছুক্ষণ পরে কুকুর আবার জেগে উঠল। পরীক্ষা সফল হোল।

জন্তুর ওপর পরীক্ষার পরে তখন মানুষের ওপর পরীক্ষা করতে হয়। কিন্তু তিনি তো তখনও ছাত্র, কে তাকে পরীক্ষা করতে দেবে? সুযোগ হঠাৎ এসে গেল। একজনের দাঁত তুলতে হবে, কিন্তু তিনি ভয় পাচ্ছেন। মর্টন অনেক করে তাকে রাজী করালেন। ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৮৪৬ খৃঃ রোগীর দাঁতের গোড়ায় ইথার ভেজানো তুলো চেপে ধরলেন। তারপরে ডাক্তার সাঁড়াশী দিয়ে দাঁত তুলে ফেললেন। একটুও ব্যথা লাগল না। রোগী তো অবাক, আর মর্টন নিজে খুব বেশী। সুখবরটা কিন্তু চাপা থাকল না। এবারে এক বড় অপারেশনের জন্য ডাক পড়লো মর্টনের। এক রোগীর চিবুকে টিউমার হয়েছে; না কাটলে জীবন সংশয়। কিন্তু

অজ্ঞান না করে এই সূক্ষ্ম অপারেশন তো সম্ভব নয়; সেইজন্য মর্টনকে ডাকা হয়েছিল, যদিও তিনি তখনও ছাত্র। তাতে কি? ডাক যখন পড়েছে মর্টন এক কথায় রাজী। ষোল দিন পরে ছাত্র মর্টন সেই রোগীকে অজ্ঞান করলেন এবং তাঁর সার্জারীর শিক্ষক সেই টিউমার অপারেশন করে বাদ দিলেন। কোন যন্ত্রণা হোল না, দারুণ সফল অপারেশন। সব অধ্যাপকের প্রিয় পাত্র হয়ে উঠলেন মর্টন; কিন্তু বাধা এলো তাঁর এক সময়ের শিক্ষক ডাঃ জ্যাকসনের কাছ থেকে। তিনি দাবী করলেন, ইথারের অজ্ঞান করার ক্ষমতা সম্বন্ধে তিনিই প্রথম বলেছেন। সুতরাং এই আবিষ্কারের কৃতিত্ব তাঁর প্রাপ্য। এই নিয়ে গুরু-শিষ্যে বিরোধ বেধে গেল। নিজের দাবী প্রতিষ্ঠা করতে ডাঃ মর্টন তিনবার আমেরিকান



আগেকার দিনের অপারেশন ঘরের দৃশ্য। পাশে আত্মীয়রা দাঁড়িয়ে দেখছে

কংগ্রেসের শরণাপন্ন হয়েছিলেন ; এমনকি একবার আমেরিকার রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। তবে দুঃখ এই অজ্ঞান করার ব্যাপারে তিনি যে পথপ্রদর্শক, এই স্বীকৃতি তাঁর জীবনকালে তিনি পান নি। মনের দুঃখে তিনি গ্রামে গিয়ে চাষ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

১৮৬৮ খ্রীঃ মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ রোগে তিনি মারা যান। এইভাবে হতাশার মধ্যে এক প্রতিভাময় জীবনের অবসান ঘটেছিল।

মৃত্যুর পরে অবশ্য তাঁকে তাঁর প্রার্থিত সম্মান দেওয়া হয়েছিল। ক্রমে ইথারের ব্যবহার আমেরিকার সীমানা ছাড়িয়েও ফ্রান্সে প্রচলিত হয়েছিল।

গত শতাব্দীতে ইংলণ্ডে ও আমেরিকার কয়েকটি ক্লাব গড়ে উঠেছিল, যেখানে নতুন কোন গ্যাস বা সুগন্ধ তরল পদার্থ শুঁকে সদস্যরা আনন্দ করতেন। ডেভি যে নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাস তৈরী করেছিলেন, সেই গ্যাস শুঁকলে হাসি আসত, মনে আনন্দ হোত, সেই জন্য তার আর এক নাম ছিল 'লাফিং গ্যাস'। ইথারকে কেন্দ্র করেও ক্লাব তৈরী হয়েছিল। ক্লার্ক ও ডাঃ লং উভয়েরই এই ধরনের ক্লাবে যাতায়াত ছিল। ইথার ছোট শিশিতে নিয়ে গিয়ে অনেকে বাড়ীতেও ব্যবহার করতেন। সেই রকম আর একপ্রকার তরল পদার্থের যে অজ্ঞান করার ক্ষমতা আছে, সেটা হঠাৎ জানা গিয়েছিল কয়েকজন বন্ধুর আমোদ প্রমোদ ও কৌতুকপূর্ণ খেলার মধ্যে।

ঘটনাটি ঘটেছিল ডাঃ সিম্প্‌সনের বাড়ীর খাবার ঘরে ১৮৪৭ খ্রীঃ ৪ঠা নভেম্বর। কয়েকমাস আগে ডাঃ মর্টন ইথারের সাহায্যে যে অজ্ঞান করা যায়, সে কথা বিজ্ঞানীদের জানিয়েছেন। ডাঃ সিম্প্‌সন নিজেও সেকথা জেনেছেন। তিনি তখন ভাবছেন এর চেয়ে ভাল কোন ওষুধ পাওয়া সম্ভব কিনা। ডাঃ সিম্প্‌সন ছিলেন ধাত্রী বিশারদ। তিনি চেয়েছিলেন এমন এক ওষুধ যা ব্যবহার করে মায়েদের সন্তান জন্ম বা অপারেশনের সময় যন্ত্রণা থেকে রেহাই দেওয়া যায়। সেই প্রার্থীত জিনিসটি শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল ৪ঠা নভেম্বর রাত্রে। ডাঃ সিম্প্‌সন আর তাঁর দুই সহকারী ম্যাথুজ ডানকান ও জর্জ কিথ তাঁর ৪নং কুইন্‌স ষ্ট্রিটের বাড়ীতে খাবার

ঘরে বসে বোতলের তরল পদার্থের গন্ধ শুকছেন। একটি বোতলের গন্ধটা খুব মিষ্টি লাগল। ডাঃ সিম্প্‌সন বললেন, 'দেখ, গন্ধটা কেমন মিষ্টি।' অন্য জন নিয়ে শুঁকলেন। তিনজনের প্রত্যেকে একবার শুঁকে অন্যকে দিচ্ছেন। এমন সময় ডাঃ সিম্প্‌সন মেঝেতে পড়ে গিয়ে মুখে 'গোঁ' 'গোঁ' আওয়াজ করতে লাগলেন। বন্ধুরা ভাবলেন, বোধ হয় সিম্প্‌সন মজা করছেন। তারা তো খুব হাসতে লাগলেন। কিন্তু তারাও পড়ে গেলেন, অজ্ঞান হলেন। মিসেস সিম্প্‌সম ছিলেন পাশেই রান্নাঘরে। পড়ে যাওয়ার আওয়াজ শুনে ছুটে এসে খুব সোরগোল তুললেন। যাই হোক অল্পক্ষণ পরে তাঁদের জ্ঞান ফিরে এলো। সিম্প্‌সন বুঝলেন, তিনি যা চেয়েছিলেন, তা তিনি এবারে পেয়েছেন।

কিন্তু আপত্তি এলো গীর্জার পাদরিদের কাছ থেকে। তাঁদের মত হোল মা হতে গেলে কষ্ট করতে হবে, এটি ঈশ্বরের অভিপ্রেত। যারা ঈশ্বরের বিরোধিতা করবে তাদের ধর্মচ্যুত করা হবে। ডাঃ সিম্প্‌সন তাঁদের হুমকি উপেক্ষা করে নিজের কাজ করতে থাকলেন। এই সময়ে সিম্প্‌সনের কাজ অনেক সহজ হয়ে গেল। তখন ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে ছিলেন মহারাণী ভিক্টোরিয়া। তাঁর কানে গিয়েছিল ডাঃ সিম্প্‌সনের ক্লোরোফর্মের কথা। তিনি ডাঃ সিম্প্‌সনকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁর অষ্টম সন্তান হবার সময় নিজে ক্লোরোফর্ম নিয়ে দেখতে চাইলেন, সত্যি যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব কিনা। এর পরে আর কারো কিছু বলবার নেই। স্বয়ং মহারাণী যখন ক্লোরোফর্ম ব্যবহার করেছেন, তখন চার্চের বিরোধিতার তেজ কমে গেল।

ডাঃ সিম্প্‌সন নিজে কিন্তু শেষের দিকে ক্লোরোফর্ম ছেড়ে ইথার ব্যবহার আরম্ভ করেছিলেন, কারণ ইথার আরও নিরাপদ। ডাঃ সিম্প্‌সন যে ঘরে প্রথম ক্লোরোফর্মের অজ্ঞান করার ক্ষমতার কথা জানতে পেরেছিলেন, সেই ঘরে, সেই আসবাব আজও সাজিয়ে রাখা আছে। ১৮৭০ খ্রীঃ সিম্প্‌সনকে তাঁদের পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত করা হয়েছিল।

লেনেক ও রনজেন

বহু শত বছর আগে যে সব প্রতিভাবান চিকিৎসকরা জন্মেছিলেন, তাঁদের রোগ নির্ণয় করতে হোত রোগীর ইতিহাস শুনে এবং রোগের লক্ষণ দেখে। তখন রোগ কেন হয়, কিভাবে হয়, তা ঠিকমত জানা ছিল না। পরবর্ত্তী কালে একে একে বহু রোগের কারণ জানা গেল ; এর ফলে পরে যাঁরা চিকিৎসক হয়েছিলেন তাঁদের খুব সুবিধা হয়। প্রথম দিকে এইসব চিকিৎসকরা রোগ নির্ণয় করতেন তাঁদের প্রখর বুদ্ধি ও দৃষ্টিশক্তি ব্যবহার করে, রোগীর কাছ থেকে রোগের বিবরণ জেনে এবং নিজের হাতে অনুভব করে। সেদিন তাঁদের কোন হাতিয়ার ছিল না যার দ্বারা রোগ নির্ণয়ে সাহায্য হতে পারে।

রোগ নির্ণয়ে যন্ত্রের সাহায্য নেওয়ার চেষ্টা অনেক হয়েছিল। বহু বিজ্ঞানী, বহু বছর ধরে চেষ্টা করার পর আশার আলো দেখা গিয়েছিল। প্রথম সাফল্য এসেছিল একজন খুব অল্পবয়সী ফরাসী চিকিৎসকের কাছ থেকে ; যাঁর নাম থিয়োফিল রেঁনে লেনেক। তাঁর আবিষ্কৃত যন্ত্রটির নাম স্টেথোস্কোপ, যা সাধারণ মানুষের কাছেও অতি পরিচিত ; যে যন্ত্র ছাড়া একজন ডাক্তার কল্পনা করা যায় না।

ডাঃ লেনেকের জন্ম ১৭৮১ খ্রীঃ ১৬ই ফেব্রুয়ারী, আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর আগে ফরাসী দেশের ব্রিটানী জেলার ছোট্ট এক শহরে। অল্প বয়সে তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়, আর বাবা সেই মাতৃহীন ছেলের দায়িত্ব, তাঁর এক ভাই-এর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হলেন। লেনেকের সেই কাকা অপর এক ভাই-এর হাতে লেনেককে তুলে দিয়ে দেশ ছাড়লেন যুদ্ধে যাওয়ার ভয়ে। লেনেকের এই কাকা ছিলেন চিকিৎসক। বোধ হয় তাঁর সঙ্গ ও শিক্ষা লেনেকের পরবর্ত্তী জীবন প্রভাবিত করেছিল।

মানুষ হিসাবে ডাঃ লেনেক ছিলেন দারুণ সৎ ও স্পষ্টবাদী। ন্যায় ও সত্যের জন্য সংগ্রামে তিনি কখনও আপোষ করেন নি। এর জন্য তিনি কোন কোন সময়ে অন্যের অপ্রিয়ভাজন হয়েছেন। একবার এইরকম



ডাঃ লেনেক

একটি ঘটনা ঘটেছিল ; যার জন্যে লেনেকের দুই বন্ধুর সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটেছিল। লেনেক ও তাঁর দুই বন্ধু ড্যুপিঁত্রা—(পরে ইনি খ্যাতনামা শল্যচিকিৎসক হয়েছিলেন) এবং বেইল, তিনজনে ডাঃ বিশাটে্'র কাছে বিভিন্ন রোগে শরীরের কোন যন্ত্রের কি বিকৃতি ঘটে, সেই বিষয়ে শিক্ষা করছিলেন। সেই সময়ে ডাঃ বিশাট্ হঠাৎ মারা গেলেন ; তিনি তখন যে বিষয়ে গবেষণা করছিলেন, তার ফল তখনও প্রকাশ হয়নি। ড্যুপিঁত্রা ঠিক করলেন শিক্ষকের গবেষণার ফল আত্মস্মাৎ করে নিজেদের নামে প্রকাশ করবেন। বাধা এলো ডাঃ লেনেকের কাছ থেকে, তিনি বেঁকে দাঁড়ালেন। বললেন 'এ তো চুরি, আমি কিছুতেই এই হীন কাজের

অংশীদার হবো না, আর তোমাকেও তা করতে দেব না।' ঝগড়াটা মারামারি পর্যায়ে যাচ্ছিল কিন্তু ত্যুপিঁত্রা ভুল বুঝে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলে লেনেকের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। ত্বই বন্ধুর আবার মিলন হোল।

ডাঃ লেনেকের স্বাস্থ্য ছেলেবেলা থেকেই ছিল খারাপ; বেশী দিন বাঁচেননি তিনি। কিন্তু তাঁর স্বল্পজীবনে তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন রোগ লক্ষণ, বিভিন্ন রোগে যন্ত্রের কোষে কি ধরনেব পরিবর্ত্তন হয়, সে বিষয়ে যা বলেছিলেন, আজকের চিকিৎসা বিজ্ঞানীরাও তাঁর সিদ্ধান্তের সহিত একমত পোষণ করেন। ভাবলে অবাক লাগে যখন আমরা দেখি তিনি বিভিন্ন রোগের যা নামকরণ করেছিলেন আজও তার পরিবর্ত্তন হয়নি। তিনি একটি মাত্র যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন এবং তার জন্য প্রতিটি চিকিৎসকের কাছে আজও তিনি অমর। সেই যন্ত্রটির নাম আগেই বলা হয়েছে, যার নাম স্টেথোস্‌কোপ। এই যন্ত্রটি আবিষ্কার হওয়ার আগে ফুসফুস ও হৃদপিণ্ডের আওয়াজ শোনা হোত বুকে-পিঠে কান দিয়ে। অন্য কান চেপে ধরা হোত যাতে বাইরের কোন আওয়াজ কানে ঢুকতে না পারে। কিন্তু মোটা রোগী হলে বুকে কান দিয়ে ভাল শোনা যায় না। ১৮১৬ খ্রীঃ লেনেকের হাসপাতালে এক মহিলা রোগী এলেন হার্টের অসুখ নিয়ে। রোগীটি ছিলেন অস্বাভাবিক মোটা ; বুকে হাত দিয়ে বা কান পেতে কিছু শোনা সম্ভব নয়। হঠাৎ তাঁর মনে এলো আগের দিন দেখা এক ঘটনার কথা। বিকেলে ল্যুভর মিউজিয়মের বাগানের মধ্য দিয়ে ধীর পায়ে বাড়ী ফিরছিলেন ডাঃ লেনেক। এদিকে ওদিকে বালক বালিকারা দৌড়োচ্ছে, খেলা করছে বাগানের একদিকে একজন কাঠ ঠুকছে, আর অপরদিকে একজন কান পেতে শুনছে। অন্যমনস্ক ডাঃ লেনেক এই সব দেখতে দেখতে চললেন বাড়ীর দিকে।

মোটা রোগীটিকে হাসপাতালে দেখে চিন্তায় পড়লেন ডাঃ লেনেক। এ রোগীটিকে কিভাবে পরীক্ষা করবেন, আর কিভাবে রোগ নির্ণয় করবেন? কালকের ছেলেরা যেভাবে কাঠের একদিকের আওয়াজ অন্যদিকে কান পেতে শুনছিল, তিনিও সেইভাবে শুনবেন ঠিক করলেন। হাতের কাছে সুবিধা মতো কাঠ নেই। ঠিক আছে। রোগীর নাম, ঠিকানা

রোগ বিবরণ লেখার জন্য হাসপাতালে মোটা কাগজের ফর্ম আছে। কয়েকটি ফর্ম একসঙ্গে নিয়ে গোল করে পাকিয়ে রোগীর বুকে চেপে ধরলেন। হ্যাঁ, হৃদপিণ্ডের ধুক্ ধুক্ আওয়াজ খুব সুন্দর শোনা যাচ্ছে, বুকে কান দিয়ে যা শোনা যায়, তার চেয়ে অনেক ভালো শোনা যাচ্ছে। কিন্তু একবারের সফলতায় কখনও স্থির সিদ্ধান্তে আসতে নেই; কারণ তিনি বিজ্ঞানী। আরও রোগী পরীক্ষা করলেন, অনেক কাগজ পাকিয়ে, আঁঠা দিয়ে, শক্ত করে সুতো দিয়ে বেঁধে ক'দিন চলল। তখনও তিনি কারও কাছে এসব কথা প্রকাশ করেন নি, পাছে কেউ উপহাস করে। অবশ্য সে ভয় ছিল অমূলক; কারণ যদিও তাঁর বয়স ছিল অল্প, প্যারীর চিকিৎসকরা তাঁকে শ্রদ্ধা করত।

শেষে যখন তিনি নিশ্চিত হলেন ফাঁপা নল বুকে চেপে ধরলে শ্বাস প্রশ্বাস ও হৃদপিণ্ডের আওয়াজ খুব ভাল শোনা যায়, তখন তিনি ছুতোর মিস্ত্রির সাহায্যে একটি কাঠের নল তৈরী করালেন। সেটি লম্বায় ছিল নয় ইঞ্চি আর ব্যাস ছিল দেড় ইঞ্চি। যন্ত্রটির তিনটি অংশ; মধ্যের অংশটি বড়, অপর দুই অংশ ছোট। প্যাঁচ দিয়ে এগুলি জোড়া হোত। এক অংশ লাগান হোত রোগীর বুকে, অপর অংশ ডাক্তারের কানে লাগান হোত।

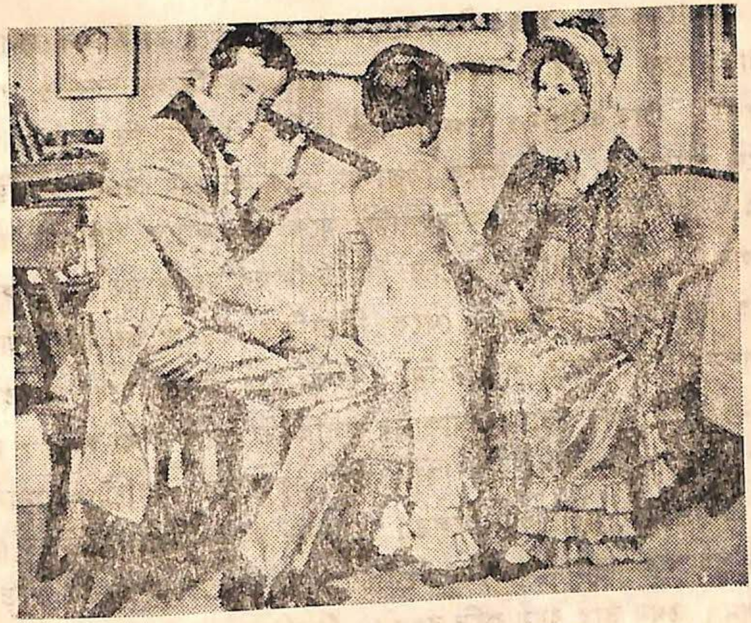
ডাঃ লেনেকের পরে বহু বিজ্ঞানীরা বহুভাবে এই যন্ত্রটির উন্নতি



ডাঃ লেনেকের তৈরী করা প্রথম স্টেথোস্কোপ

করেছেন। পলিথিন বা রবারের টিউব দেওয়া যন্ত্র তৈরী হয়েছে, দু'কানে টিউব দেওয়া যন্ত্রও তৈরী হয়েছে। হৃদপিণ্ড ও ফুসফুসের আওয়াজ শোনার পৃথক যন্ত্র পাওয়া যাচ্ছে। কত সামান্য সূত্রে কত বড় আবিষ্কার করেছিলেন ডাঃ লেনেক। তাঁর জীবনের ছোট বড় এই সব ঘটনার কথা তাঁর বন্ধু ল্যেজুমে'র লিখিত বিবরণী থেকে পৃথিবীর লোকে জানতে পেরেছিল।

ডাঃ লেনেক মারা গিয়েছিলেন মাত্র ৪৫ বছর বয়সে। তিনি বরাবরই রুগ্ন ছিলেন। শহরের কোলাহল অসহ্য মনে হলে এবং ক্লান্ত ও অসুস্থ শরীরকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য তিনি মাঝে মাঝে সমুদ্রের ধারে বা নির্জন গ্রামে পালিয়ে যেতেন। নিকট আত্মীয় বলতে তাঁর কেউ ছিল না, সংসারে তিনি একেবারে একা। অসুখ করলে কে সেবা করবে, কে খাবার তৈরী করে দেবে সেটা ছিল তাঁর এক বড় সমস্যা। মাদাম আর্গন নামে এক বয়স্কা মহিলা তাঁর সংসারের ঝামেলা সামলাতেন, রুগ্ন লেনেকের সেবা



ডাঃ লেনেক রোগী পরীক্ষা করছেন, তাঁর
তৈরী করা স্টেথোস্কোপ দিয়ে

করতেন। ১৮২৪ খ্রীঃ এই ভদ্রমহিলাকে তিনি বিবাহ করেন, তখন তাঁর শরীর অসুস্থ। বিবাহের মাত্র দু'বছর পরে যক্ষ্মা রোগে ডাঃ লেনেকের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর শতবর্ষ পরে ফরাসী সরকার তাঁর সম্মানে ডাক-টিকিট প্রকাশ করেন। পরের শতকের দেশবাসীরা যেন তাদের লেনেককে ভুলে না যায়; আর এই শতকের চিকিৎসা বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানে লেনেকের অবদান কতখানি তা যেন মনে রাখে।

গত শতাব্দীর একেবারে শেষমুখে এক যুগান্তকারী আবিষ্কার হঠাৎ হয়েছিল। 'হঠাৎ হয়েছিল'—বলার কারণ, আবিষ্কারে যা পাওয়া গেল, তা পাওয়ার জন্য কেউ চেষ্টা করেনি। আবিষ্কার হয়েছিল এক ধরনের রশ্মি, যার প্রকৃতি ছিল অজানা; অথচ একটা নাম তো দিতে হবে;—নাম দেওয়া হোল 'এক্স-রে'। 'এক্স-রে' কথাটা কিন্তু আজ অতি পরিচিত নাম, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই জানে। এই বিশেষ ধরনের রশ্মি হঠাৎ আবিষ্কার করেছিলেন উইলহেলম্ কন্‌রাড রনজেন ১৮৯৫ খ্রীঃ ৮ই নভেম্বর, যখন তিনি অন্য এক রশ্মি নিয়ে গবেষণা করেছিলেন।

কনরাডের জন্ম ১৮৪৫ খ্রীঃ ২৭শে মার্চ, জার্মানীর বার্জিশেন জেলায়। বাবার চাষের খামার ও ব্যবসা ছিল, আর মা ছিলেন হলাণ্ড দেশের মহিলা। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা হলাণ্ডে। কিন্তু সেখানে তিনি শিক্ষা শেষ করতে পারেন নি, কারণ তাকে বিদ্যালয় থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর অপরাধ, তিনি তাঁর এক সহপাঠীর মুখে থুথু ফেলতে অস্বীকার করে-ছিলেন। সেই সহপাঠীর ক্লাসের বোর্ডে শিক্ষক মহাশয়ের এক ব্যঙ্গচিত্র এঁকে রেখেছিল। বিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হওয়ার জন্য তিনি ম্যাট্রি-কুলেশন পরীক্ষা দিতে পারেন নি। কিন্তু যার মনের মধ্যে বড় হবার বাসনা আছে, তার হৃদয়ের আগুনের ফুলকি কি চেপে রাখা সম্ভব? না। তাঁর মনের ইচ্ছা পূরণের জন্য তিনি অন্য এক শহরে (আট্রেখ-জার্মানী) এক টেকনিক্যাল স্কুলে ভর্তি হলেন। সেখান থেকে ডিপ্লোমা নিয়ে শেষ পর্যন্ত ঘুর পথে অনিয়মিত ছাত্র হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশের ছাড়পত্র পেলেন। তখন তাঁর বয়স কুড়ি বছর। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাড়পত্র পাওয়ার পরে তিনি জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে (সুইজারল্যাণ্ড) ভর্তি হন এবং ১৮৬৮



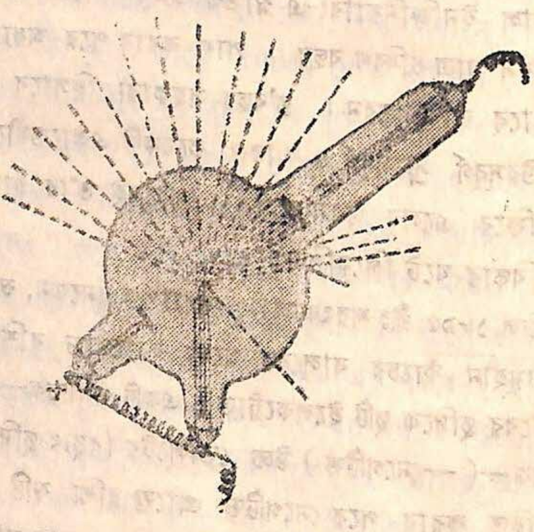
ডাঃ উইলহেলম্ কন্‌রাড রন্‌জেন

খ্রীঃ মেকানিকাল ইনজিনিয়ারিং-এ স্নাতক হন। পরের বছর ডক্টরেট, তখন তাঁর বয়স মাত্র চব্বিশ বছর। পাশ করার পরে অধ্যাপক কুঁনো'র সহকারী হিসাবে কাজ করেন। দু'বছর সহকারী হিসাবে কাজ করার পরে তিনি উরস্‌বুর্গ, স্ট্রাসবুর্গ ও আরও কয়েকটি একাডেমীতে অধ্যাপনা করে আবার ফিরে এলেন উরস্‌বুর্গে। এখানেই তাঁর হাত দিয়ে এক প্রচণ্ড বড় আবিষ্কার ঘটে গিয়েছিল।

সময়টা ছিল ১৮৯৫ খ্রীঃ শরৎকাল। অধ্যাপক রনজেন, স্যার উইলিয়ম ক্রুক্‌স-এর বায়ুহীন কাঁচের বাল্‌বের মধ্যে ক্যাথোড রশ্মি নিয়ে কাজ করছেন। টিউবের দুদিকে দুটি ইলেকট্রোড ; একটি ধনাত্মক—(+ পজিটিভ) অপরটি ঋণাত্মক—(—নেগেটিভ) উচ্চ ভোল্‌টের বিদ্যুৎ দুদিকের ইলেকট্রোডে প্রবাহিত করার পরে নেগেটিভ প্রান্তে রশ্মি সৃষ্টি হয়, যার নাম 'ক্যাথোড রশ্মি'। সেই রশ্মি চুম্বক দ্বারা অন্যদিকে ঘোরান যায়। এই রশ্মি

কাঁচের গায়ে একপ্রকার সবুজ আভা সৃষ্টি করে। আজ আমরা জেনেছি 'ক্রুক্‌স'-এর এই টিউব আজকের টেলিভিসন টিউবের প্রাথমিক অবস্থা।

অধ্যাপক রনজেন তখন ঐ টিউব নিয়ে গবেষণা করেছেন। ঘর অন্ধকার করা রয়েছে, টিউবটাকে একটা কালো বাক্‌সো দিয়ে ঢাকা হয়েছে। তারপরে টিউবকে বায়ুশূন্য করে তার মধ্যে বিদ্যুৎ চালনা করা হোল। কিছু দূরে বেরিয়াম-প্লাটো সায়ানাইড মাখান একটি কাগজ ঝোলান ছিল ; সেটি হঠাৎ উজ্জ্বল হতে দেখা গেল। চমকে গেলেন অধ্যাপক। একি ? এ তো ক্যাথোড রশ্মি নয়। টিউবের চারদিক ঢাকা, ক্যাথোড রশ্মি টিউবের বাইরে আসবে না, চুম্বক তার দিক পরিবর্তন করে। অথচ এই অজানা রশ্মি টিউবের বাইরে সায়ানাইড মাখান কাগজ উজ্জ্বল করছে, চুম্বক-এর দিক পরিবর্তন করছে না। এই টিউবের সামনে হাত রাখলে যে ছায়া পড়ছে তাতে মাংস নেই, চামড়া নেই ; কেবলমাত্র হাতের হাড়ের ছায়া দেখা যাচ্ছে, আঙ্গুলের আংটি দেখা যাচ্ছে। এটা তা হলে অন্য ধরনের রশ্মি ; নাম যখন জানা নেই, এই অজানা রশ্মির নাম দেওয়া হোল 'এক্‌স-রে'। যেমন আমরা অনেক অজানা বা কাল্পনিক



এক্‌স-রে টিউব

জিনিষের নাম দিই এ, বি, সি বা এক্স, ওয়াই, জেড, তেমনি রনজেন তাঁর আবিষ্কার করা অজানা রশ্মির নাম দিলেন 'এক্স'-রে'।

পরে অনেকে এই রশ্মিকে অধ্যাপকের নাম অনুসারে নাম দেন 'রনজেন রশ্মি'। যেদিন এই আবিষ্কার ঘটেছিল, তারপরে অধ্যাপক রনজেন বারবার পরীক্ষা করলেন ; আরও কিছু গবেষণা করে, স্থির নিশ্চয় হয়ে ২৮শে ডিসেম্বর উরসবুর্গ'-এর পদার্থবিদ ও চিকিৎসাবিদদের সমিতির কাছে লিখিত ভাবে তাঁর এই আবিষ্কারের কথা জানালেন। তিনি দাবী করেছিলেন এই রশ্মি কাগজ, পাতলা কাঠ, কাপড়, মাংসপেশী পাতলা টিন ও এলুমিনিয়াম ভেদ করে এগিয়ে যেতে পারে। প্রমাণ স্বরূপ তাঁর স্ত্রীর হাতের একটা ছবি তিনি জমা দিয়েছিলেন, যাতে শুধু হাতের হাড় ও আংটির কালো ছায়া দেখা যাচ্ছিল।

এই ঘটনা কিন্তু গোপন থাকল না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এই খবর চলে গেল ভিয়েনায় ; সেখান থেকে লনডন। ৬ই জানুয়ারী লনডনের স্টানডার্ড পত্রিকা সারা বিশ্বে প্রচার করে দিল এই আবিষ্কারের কথা। চিকিৎসা বিজ্ঞানে এই আবিষ্কারের গুরুত্ব কত বেশী, কিছু পদার্থ বিজ্ঞানী, চিকিৎসক তা বুঝতে পেরেছিলেন। তবে কিছু অসৎ প্রকৃতির সুবিধাবাদী শ্রেণীর লোক এই সুযোগে লোক ঠকানোর চেষ্টা করেছিল। তারা একধরনের পোযাক বিক্রির জন্যে বাজারে ছাড়ল। কেন ? না এই কাপড় ভেদ করে 'এক্স-রে' যেতে পারবে না। অন্য একদল নিয়ে এল একধরনের চশমা ; নাম 'এক্স-রে' চশমা। এই চশমা চোখে দিলে কাপড় ভেদ করে শরীর দেখা যাবে। উভয়ের দাবী ছিল মিথ্যা ; লোককে ঠকিয়ে টাকা রোজগারের ফন্দী। আমেরিকার মত উন্নত দেশের নিউজার্সী রাজ্যের বিধানসভা এক আইন করে ফেলল, খবরদার ঐ 'এক্স-রে' চশমা পরে কেউ থিয়েটার হলে ঢুকতে পারবে না। আর লনডনের সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় লেখা হোল 'এক্স-রে' বন্ধ করা হোক কারণ এটা অশ্লীল রশ্মি। আজ আমাদের আশ্চর্য লাগে যখন দেখি যে মাত্র চুরাশি বছর আগে সংবাদপত্রের সম্পাদক, দেশের আইন প্রণেতারা একবারও 'এক্স-রে'র সুদূর প্রসারী উপকার করার ক্ষমতার কথা ভাবেন নি। এই আলোর

সাহায্যে হাড়ের অসুখ, বুকের রোগ, পেটের অসুখ, আরও নানা রকম রোগ নির্ণয়ে সাহায্য হতে পারে, সেটা তাঁরা মোটেই ভাবলেন না। এই আলো নিয়ে গবেষণা বন্ধ করার জন্য কোমর বেঁধে আন্দোলনে নামলেন।

তবে আনন্দের খবর এই যে বিশ্বের বিজ্ঞানী সমাজ ঐ হাস্যকর অভিযোগগুলি উপেক্ষা করে, ১৯০১ খ্রীঃ অধ্যাপক রনজেনকে তার গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের জন্য তাঁকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করেন। ঐ বছরেই নোবেল পুরস্কার দেওয়া আরম্ভ হয়েছিল। এর আগে ১৮৯৬ খ্রীঃ ইংলণ্ডের রয়েল সোসাইটি তাঁকে রামফোর্ড পদক দিয়ে সম্মানিত করে। তিনি পরে সেই মেডেল দান করেছিলেন দেশের স্বর্ণভাণ্ডারে,—তাঁর দেশ যখন বৃটিশদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। অধ্যাপক রনজেন ১৯২৩ খ্রীঃ ১০ই ফেব্রুয়ারী পরলোক গমন করেন।

শেষের কথা

সব কাহিনীর যেমন শুরু আছে, তেমনই আছে তার শেষ। কিন্তু যে কাহিনীর শুরু রোগীর বিছানার পাশে, তার রোগ, লক্ষণ, উপসর্গ দেখে রোগ নির্ণয়ের প্রচেষ্টায়; আজকের পরিবেশে তার শেষ কোথায় তা আমাদের অনুমানের বাইরে। কালের বিবর্তনে মাত্র আড়াই হাজার বছরে রোগ নির্ণয় পদ্ধতিও চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা যে অবস্থায় এসেছে, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলা খুব কঠিন।

অষ্টাদশ শতকের শেষে বসন্ত প্রতিরোধক টীকা আবিষ্কার দিয়ে আরম্ভ। বছর পঁচাশি আগে এল এক্স-রে। তারপরে যেন একে অপরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আবিষ্কার করতে থাকল নিত্য নতুন ওষুধ আর নতুন ধরনের যন্ত্র। প্রতিদিন সূর্য্য উঠছে নতুন কোন যন্ত্র বা ওষুধ আবিষ্কারের সম্ভাবনা নিয়ে। এই শতকের শুরুতে আবিষ্কৃত ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফ আজ পুরনো, হয়তো কোনদিন দেখা যাবে তার স্থান দখল করেছে ইকোকার্ডিওগ্রাফ। এক্স-রে এখন অনেকের অপছন্দ; যাদের সঙ্গতি আছে তারা সুযোগ নিচ্ছেন অতিশব্দ পদ্ধতির বা আলট্রাসনোগ্রাফির। লিউয়েনহুকের সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্র—যা দিয়ে রবার্ট কক ও তারপরে আরও অনেক বিজ্ঞানী গবেষণা করে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, সেই অণুবাক্ষণ যন্ত্র গবেষণা ক্ষেত্র থেকে সরে গিয়ে স্থান করে দিচ্ছে আরও শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র ও ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রকে।

এইভাবে পুরাতনকে সরিয়ে নতুন তার জায়গা করে নিচ্ছে। তবে আজ যা নতুন, কাল সে পুরোনো হয়ে হবে ইতিহাস। তাকে সরিয়ে আবার আসবে নতুন কোন আবিষ্কার।

এই তো বিজ্ঞান, এরা থেমে থাকে না। গবেষণা চলছে অবিরাম; আরো ভালো, আরো উন্নত পদ্ধতির খোঁজে, আরো ভাল যন্ত্র আবিষ্কার করতে। ফুসফুস, লিভার স্ক্যান করে বিজ্ঞানীরা আজ বলে দিতে পারেন তাদের কোথায় কতটা অংশ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সেই অংশ কেটে

বাদ দিতে পারলে, রোগ নিরাময় হতে পারে। আমাদের শরীরে লিভার ও অগ্নাশয় নতুন কোষ সৃষ্টি করতে পারে ; কিছু অংশ কেটে বাদ দিলে তাদের বাকী অংশের কোষ থেকে নতুন কোষ সৃষ্টি করে শূন্যস্থান পূরণ হয়। কে জানে হয়ত কোনদিন স্ক্যান করে বলা যাবে অগ্নাশয়ে কোন বিশেষ অংশের বিটা কোষ (বি-সেল্স) খারাপ, অপর অংশ ভালো। খারাপ অংশ কেটে বাদ দিলে ভাল অংশ থেকে নতুন কোষ সৃষ্টি হয়ে হয়ত ডায়েবিটিস রোগ নিরাময় করা যাবে। এটা খুব দুরাশা বলে মনে করি না। আজ যখন শল্যচিকিৎসা দ্বারা হৃদ্‌পিণ্ড বদল করা সম্ভব হয়েছে, সেই তুলনায় এটা খুবই সাধারণ ও সহজ কাজ।

চিকিৎসক শরীরের ভিতরে বিভিন্ন যন্ত্র কি অবস্থায় আছে, কেমন কাজ করছে তা জানতে চান। আর ঠিকমত চিকিৎসা করতে সেটি জানা প্রয়োজন। তবে তাঁদের ইচ্ছা শরীরের ভেতরের অবস্থা জানবার জন্য অপারেশন করবেন না ; এমন কি এক্‌স-রে করতেও তাঁদের পক্ষ থেকে আপত্তি আছে। তাঁদের সেই বাসনা অনেকটা পূরণ হয়েছে অতিশব্দ বা আলট্রাসাউণ্ড পদ্ধতির প্রয়োগে। তবে এই যন্ত্রের দাম খুব বেশী। সেইজন্য আমাদের দেশে এই পদ্ধতিতে শরীর পরীক্ষা ও রোগ নির্ণয় খুব কম কেন্দ্রেই সম্ভব হয়েছে।

যদিও অতিশব্দ পদ্ধতি এখনও আমাদের দেশে ভালভাবে চালু হয়নি ; তবু এই রোগ নির্ণয় পদ্ধতিও পুরোন হতে চলেছে, আর তা মাত্র তিরিশ বছরের মধ্যে। ১৯৭২ খ্রীঃ ইংরেজ পদার্থ বিজ্ঞানী গডফ্রে ইনফিল্ড শরীরের ভিতরের প্রতিবিম্ব দেখার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন—যাকে বলা হয়েছে সি-টি-স্ক্যান (কম্পোটারিজড্ টোমোগ্রাফি স্ক্যান)। এই পদ্ধতিতে পরীক্ষা করতেও কিন্তু শরীরে এক্‌স-রে রশ্মি ব্যবহার হয় ; তবে তার পরিমাণ অতি সামান্য, প্রায় ১ এর ১০ ভাগ। ফলে এক্‌স-রে জনিত ক্ষতির সম্ভাবনা খুবই কম।

সি-টি-স্ক্যান করা হয় নানা পদ্ধতিতে ; যেমন কম্পুটারাইজড্ ট্রানস্‌ভার্স একসিয়াল টমোগ্রাফি (সি, টি, টি,), কম্পুটারাইজড্ একসিয়াল টমোগ্রাফি (সি. এ. টি.), কম্পুটার এসিসটেড ট্রানস্-একসিয়াল টমোগ্রাফি

ও ই-এম-আই স্ক্যান। এই পদ্ধতিগুলি খুবই উন্নত ও খুবই জটিল এবং এর দাম এত বেশী যে আমাদের মত দরিদ্র দেশের সমস্ত মেডিকেল কলেজে এই যন্ত্র রাখা বোধ হয় আমাদের সাধ্যের বাইরে। এখন সারা ভারতে অল্প কয়েকটি কেন্দ্রে এই পরীক্ষার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে।

এ ছাড়া আরও একটি পদ্ধতি আজ রোগ নির্ণয়ে আমাদের সাহায্যে এসেছে, সেটি হোল নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেসোন্যান্স (এন, এম, আর,)। এতে কিন্তু এক্স-রে'র সাহায্য লাগে না। রোগীকে এন-এম-আর যন্ত্রে দুটি চুম্বকের মধ্যে রেখে রোগীর শরীরের মধ্য দিয়ে বেতার তরঙ্গ পাঠান হয় এবং চুম্বকের ক্ষেত্র অনুসারে শরীরের বিশেষ পরমাণুগুলি সেই বেতার তরঙ্গ গ্রহণ করে। তারপরে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (ওয়েভ লেংথ) পরিমাপ করে যে তথ্য পাওয়া যায় কমপিউটারের সাহায্যে তা বিশ্লেষণ করে টেলিভি-শনের পর্দায় ফুটে ওঠে।

এছাড়া আছে লিভার পরীক্ষার বিশেষ পদ্ধতি—রেডিও নিউক্লাইড হেপাটিক সিনটিগ্রাফি। লিভার আকারে বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা জানতে হলে রোগীকে শুইয়ে পেটে হাত রেখে অনুভব করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তবে কেন বড় হল, কতটা বড় হয়েছে অথবা আকারে স্বাভাবিক মনে হলেও হয়ত লিভারের মাঝে ঘা হয়ে পুঁজ জমেছে বা ক্যানসার শুরু হয়েছে যা প্রথম অবস্থায় ধরা খুবই কঠিন, হয়ত বা অসম্ভব। তখন এই পদ্ধতির সাহায্যে পরীক্ষা করলে ঐ দোষ আমাদের চোখে ধরা পড়বে।

গত তিরিশ বছরে রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দিকে এত উন্নতি হয়েছে—যা ছিল আমাদের কল্পনার বাইরে। এর ভাল দিক নিশ্চয় আছে; কিন্তু অন্যদিকে একটা খারাপ সম্ভাবনা মনকে ভারাক্রান্ত করেছে। কেন? কি খারাপ সম্ভাবনা? সেটি হোল চিকিৎসকদের মানসিক পরিবর্তন। আগে তাঁরা রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ের জন্য যে পরিশ্রম করতেন, সেই চেষ্টা এখন কমতে আরম্ভ হয়েছে। এই অবস্থা বোধ হয় সারা বিশ্বে; এমনকি আমাদের দেশেও। এখানে এইসব আধুনিক অনুসন্ধান পদ্ধতির সুযোগ এখনও খুবই সীমাবদ্ধ। রোগী পরীক্ষার জন্য পরিশ্রম না করে অনেক ক্ষেত্রে আগেই এক্স-রে, রক্ত, ই-সি-জি, করে আসতে বলা হয়। বহু

ক্ষেত্রে কোথাও খারাপ কিছু দেখা গেল না এবং তাদের ক্ষেত্রে এই পরীক্ষাগুলি করা হোল অকারণে।

যান্ত্রিক সাহায্য নিশ্চয়ই ভাল, এ বিষয়ে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। কিন্তু চিকিৎসক নিজের ব্যবহারিক জ্ঞান প্রয়োগ না করে কেবলমাত্র বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে রোগ নির্ণয়ে রত, এই অবস্থা নিশ্চয়ই কাম্য নয়। আমরা কখনই চাইবো না যে কোন কমপিউটর যন্ত্রকে তথ্য সরবরাহ করে, তার কাছ থেকে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার ব্যবস্থা জেনে নিয়ে রোগীর চিকিৎসা চলুক। যদি এমন অবস্থা আসে, তা'হলে চিকিৎসকদের কাজ তো একটি রোবট করে দিতে পারবে, আর মানুষ হয়ে উঠবে যন্ত্রের দাস।

এইসব অতি আধুনিক যন্ত্রের সাহায্য দরকার মত আমরা নিশ্চয়ই নেব, কিন্তু দৃষ্টি রাখতে হবে এইসব যন্ত্র আমাদের বুদ্ধি ও অনুসন্ধানের প্রবৃত্তিকে যেন নষ্ট না করে। তবে যখন সাধারণ অনুসন্ধান পদ্ধতি ও আমাদের ইন্দ্রিয় অনুভূতি ব্যর্থ হবে, সেই সব ক্ষেত্রে যান্ত্রিক সাহায্য অবশ্যই নেওয়া উচিত।

আরও যন্ত্র আসছে ও আসবে। যাঁরা গবেষক, যাঁরা বিজ্ঞানী, তাঁরা অবিরত কাজ করে চলেছেন নতুন আবিষ্কারের লক্ষ্য নিয়ে। তবে সেই সব মূল্যবান যন্ত্র বিশ্বের দরিদ্র দেশের কতটা উপকারে আসবে, এই প্রশ্ন মনে আসে। সাধারণ রোগ নিরাময়, প্রতিরোধ ও প্রতিকারের পথ আবিষ্কার করা আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। আমাদের গবেষণা সেই পথে চালিত হলে দেশের ও দশের উপকার হবে।

———

ডাঃ মনীশ প্রধানের আবিষ্কারের পিছনে
সম্পর্কে কয়েকটি বিশিষ্ট পত্র-পত্রিকার অভিমত

মূলত চিকিৎসাবিজ্ঞানের কিছু আবিষ্কারের জন্য যাঁরা স্মরণীয় তাঁদের বাধা-বিপত্তি ও সাফল্যের ইতিহাস বড় সাবলীলভাবে লিখেছেন ডাঃ মনীশ প্রধান।···এটি সকলেরই ভাল লাগবে। — আনন্দবাজার পত্রিকা

বাংলাভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ রচনার পদ্ধতির গুণেই কত সরস হয়ে উঠতে পারে তার প্রমাণ ডাঃ মনীশ প্রধানের আবিষ্কারের পিছনে গ্রন্থটি।
— যুগান্তর

চিকিৎসাবিজ্ঞানে যুগান্তকারী আবিষ্কারের কাহিনী ডাঃ প্রধান দারুণ চিত্তাকর্ষক ভাবে উপস্থিত করেছেন পাঠকদের কাছে। — দৈনিক বসুমতী

আবিষ্কারের নেপথ্য কাহিনী পড়তে পড়তে মহান বিজ্ঞানদের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নুইয়ে আসে।
— সত্যযুগ

ডাঃ মনীশ প্রধান চিকিৎসা জগতে খ্যাতি ও দক্ষতা অর্জন করেছেন বহু আগেই, বর্তমান বইটি তাঁকে এনে দিয়েছে বিজ্ঞান সাহিত্যের দুনিয়ায় সসম্মানে প্রবেশের ছাড়পত্র।
— শিলাদিত্য

চিকিৎসা বিজ্ঞানে এইসব আবিষ্কার যাঁদের দ্বারা সম্ভব হয়েছে, তাদের জীবন কাহিনীও বিচিত্র, সে কাহিনী যে কোন ডিটেকটিভ কাহিনীর চেয়েও বেশী লোমহর্ষক।
— বিজ্ঞান জগৎ

The lives of great men presented in the book in the manner of a thriller at its best.
— **Journal of the Indian Medical Association.**

The author has spared no pain to make the book all comprehensive and informative.
— **Calcutta Medical Journal.**



ডাঃ মনীশ প্রধান জন্ম ১৯২৫ সালে কলকাতায়। পড়াশুনা কলকাতার হেয়ার স্কুলে। ১৯৪৭ সালে আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ থেকে এম. বি পাশ করেন। পরে মেডিকেল কলেজ থেকে টি. ডি. ডি. ও সর্বশেষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালের এম.ডি. হন। 'আমেরিকান কলেজ অব চেষ্ট ফিজিশিয়ান'-এর সাম্মানিক এমেটিরাস ফেলো। আর. জি. কর মেডিকেল কলেজের বক্ষবিভাগের অবসর প্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান। চিকিৎসকদের জাতীয় সংস্থা ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের বঙ্গীয় রাজ্য-শাখা ও কলকাতা শাখায় তাঁর অবদান প্রশংসার দাবী রাখে।

'আবিষ্কারের পিছনে' গ্রন্থটি সর্বত্র প্রশংসিত ও অভিনন্দিত। এই গ্রন্থে ডাঃ প্রধান প্রাচীনকাল থেকে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তনের ঐতিহ্যবাহী ধারাটি সরল ও সাবলীল ভাষায় বিবৃত করেছেন। আমরা তাঁর এই গ্রন্থটি তৃতীয় মুদ্রণ থেকে প্রকাশ করতে পেয়ে গর্বিত। আশা করি আমরা গ্রন্থটি আরো ব্যাপক অংশের মানুষের হাতে পেঁাছে দিতে পারবো। তাঁর এই গ্রন্থের পরিপূরক গ্রন্থ 'স্মরণীয় আবিষ্কার।' ডাঃ প্রধানের অন্য আর একটি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ ঃ 'হাঁপানি রোগ'

আমাদের পূর্ব প্রকাশিত তাঁর একমাত্র মর্মস্পর্শী উপন্যাস ঃ খেলার পুতুল নই